অমৃতপথযাত্রী

সুবোধ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

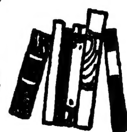
দ্বিতীয় মুদ্রণ,
১১০০ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৮৭৯
শকাব্দ

তিন টাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা:
অর্ধেন্দু দত্ত

প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর: শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

উন্মত্ত হিংসার সম্মুখে অহিংসার, শান্তির ও প্রীতির বাণী শোনাতে গিয়ে স্বাধীন ভারতে প্রথম যিনি প্রাণ উৎসর্গ করলেন, গান্ধীবাণীর অনুরাগী সেই শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে স্মরণ ক'রে তাঁরই নামে 'অমৃতপথযাত্রী'কে উৎসর্গ করলাম।

লেখক



ভূমিকা

মহাত্মা গান্ধীর বিরাট জীবন ও নীতির তাৎপর্য একজন অতিসাধারণ ক্ষুদ্র মানুষ তার সামান্য শক্তিতে যতটুকু বুঝতে পেরেছে, তারই পরিচয় যতদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গান্ধী-নীতি বুঝবার পক্ষে একটা সুবিধা এই যে, স্বয়ং গান্ধীই সে নীতির বিস্তৃত ভাষ্য এবং সুপ্রচুর ব্যাখ্যা লিখে রেখে গেছেন। সুতরাং কোথাও গান্ধী-নীতির ব্যাখ্যায় কেউ অজ্ঞানে ভুল করলে, অথবা ব্যাখ্যাতার ব্যক্তিগত মতপ্রবণতার দোষে অর্থান্তর হ'লে, গান্ধীরই স্বলিখিত প্রামাণ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে সে ভুল ধ'রে ফেলবার উপায়ও আছে। এই পুস্তকে বেশির ভাগ গান্ধীকথিত ব্যাখ্যার সাহায্যেই গান্ধীর জীবন ও নীতির তাৎপর্য বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ভারতীয় গান্ধীর জীবনে কর্মে ও বাণীতে সদ্ধর্মের যে নবতম রূপ প্রকাশ লাভ করেছে, তারই এক মহাকাহিনী গান্ধীর স্বলিখিত রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। লেখকের এই পুস্তক সন্ধিৎসু পাঠককে সেই মহাকাহিনী অধ্যয়নে উৎসাহিত করবার জন্য রচিত একটি আবেদন মাত্র। 'অমৃতপথযাত্রী'র প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর প্রতি লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

লেখক

অমৃতপথযাত্রী

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট। এই গুজরাটের একটা সমুদ্রপুর, পোরবন্দর তার নাম। প্রকৃতি এখানে ললিত-কঠোর। একদিকে যেমন আতঙ্ক-পাণ্ডুর মরুস্থল, আর একদিকে তেমনি শস্যভারনম্র হরিৎ ক্ষেত্র। এখানে বৈরাগী বাতাসের তপ্ত রুক্ষতার সঙ্গে সমুদ্রশীকরের স্নিগ্ধস্পর্শ সকল ঋতুতে মিলে মিশে থাকে। এই সমুদ্রপুর পোরবন্দরে প্রায় আশি বছর আগে এক ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে নতুন নক্ষত্রোদয় হয়েছিল।

সে নক্ষত্র নভঃপটে জ্যোতির্বিন্দুরূপে দেখা দেয়নি। দেখা দিয়েছিল একটা অতি সাধারণ মাটীর দীপের মৃদু রশ্মির মত এক বণিক-দম্পতির গৃহকোণে নবজাতকরূপে, মানবশিশুর মূর্তিতে।

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর, পোরবন্দরের জলে স্থলে সেদিন কোন অলৌকিক পরিদৃশ্যের আবির্ভাব হয়েছিল, এমন বিবরণ আমরা পাই না। অন্তরীক্ষে কোন দৈববাণী শোনা যায়নি, কোন রহস্যময় দিব্যবাদ্য বা সঙ্গীত সহসা ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি। কোন অপার্থিব সৌরভে দশদিক আমোদিত হয়নি। মাতা যশোদার বেদনার মত, ঘোরা রজনীর ঝঞ্ঝা ও তিমিরঘটার মধ্যে এই ২রা অক্টোবরে ধরিত্রীর বেদনা স্ফুরিত বিদ্যুতের রূপে কোন অবতারোচিত জন্মলগ্নের ইঙ্গিত দিয়েছিল, এমন ঘটনার প্রমাণও পাওয়া যায় না। জেরুসালেমের সান্ধ্য পথিকের মত পোরবন্দরের মানুষ সেদিন আকাশে কোন নতুন তারা দেখে বিস্মিত হবার সুযোগ পায়নি। লুম্বিনী উদ্যানের সন্তানসম্ভবা রাজমহিষীর মত পোরবন্দরের দেওয়ান কাবা গান্ধীর পত্নী পুত্‌লি বাঈ তাঁর মাতৃত্বের স্বপ্নে কোন জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন, এমন কোন অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই না।

তবু সেদিন পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ শিশুর মত এক সাধারণ ভারতীয় নারীর কোলে যিনি আবির্ভূত হলেন, কালক্রমে দেখা গেল যে, তাঁর প্রাণের স্বরূপ

নতুন নক্ষত্রের মতই; তিনিই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, তিনিই পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষিত আলোক।

তাঁর আবির্ভাব, দীন ভারতসংসারে একটী ক্ষুদ্র গৃহ-প্রদীপের মত। তাঁর তিরোধান, এক মহাজ্যোতিষ্কের অস্তের মত। মাঝখানে সহস্র অঙ্কে গ্রথিত এক যুগব্যাপী কর্মময় জীবনের মহানাটক।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বাল্যজীবন ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ছোট-ছেলের মতই, প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও ঘরের আঙিনায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর বাল্যজীবনের ওপর কোন বিচিত্র অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রভাব বা প্রকোপের কথা শুনতে পাই না। শিশু গান্ধীর জীবনের কোন বিবরণবহুল কাহিনীও কোথাও লেখা নেই। সেরকম কোন বিবরণ লেখা থাকলে, আজ আমরা হয়তো এক পরিণত মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁর শৈশব রূপকথাটীকে পড়বার সুযোগ পেতাম। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁর আত্মকথায় নিজ শৈশবের যেটুকু পরিচয় দিয়ে গেছেন, তারই সূত্র ধরে আমরা প্রায় অতীতের এক যুগোপান্তে পৌছে শুধু দেখতে পাই, পোরবন্দরের সেই শিশু মোহনদাস সাত বছর বয়সে বাপ-মায়ের সঙ্গে রাজকোটে চলে আসছে, পিতা কাবা গান্ধী তখন রাজস্থানিক কোর্টের সদস্য হয়ে রাজকোটে এসেছেন।

মোহনদাসের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় রাজকোটের স্কুলে। প্রথমে প্রাইমারী স্কুল, তারপর মধ্য স্কুল এবং তারপর হাই স্কুল। স্কুলের লেখাপড়াকে মোহনদাস আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি এবং সে সম্বন্ধে মনের ভেতর থেকে কোন আগ্রহ বা প্রেরণার তাগিদও ছিল না। ছিল মাষ্টারের প্রতি ভয়। মাষ্টারের নিন্দা ও ধমক থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই বাধ্য হয়ে পাঠ্য চর্চা করতে হতো।

রূপকথার জগৎ

এই ভীতু ও লাজুক স্বভাবের কিশোরের চক্ষের সম্মুখে একদিন এক নতুন রূপকথার জগৎ দেখা দিল। একটী পুস্তক, 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামে একখানি নাটক। স্কুলপাঠ্য পুস্তক নয়; মোহনদাসের পিতা এই বইখানি কিনেছিলেন নিজের পড়ার জন্য। কিশোর মোহনদাস জীবনে এই প্রথম অন্তরের আগ্রহ ঢেলে দিয়ে বই পড়লেন। অন্য ভাবে বলা যায়, এই বই মোহনদাসের

কিশোরচিত্তের আগ্রহকে প্রথম জাগ্রত করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন :

> "এই সময় আমাদের বাড়ীতে একটা লোক এসে লণ্ঠনছবি দেখায়। এই ছবিতে দেখলাম, শ্রবণ তার কাঁধের ঝোলনার ভেতর তার পিতামাতাকে নিয়ে তীর্থাভিমুখে চলেছে। এই দৃশ্য আমার মনের ওপর মুদ্রিত হয়ে রইল। শ্রবণের মৃত্যুকালে তার পিতামাতার বিলাপ আমার আজও স্মরণ আছে।"

এর পর, আর একটী ঘটনা। এক পেশাদার নাটক অভিনেতার দল রাজকোটে এসেছিল। নাটকের বিষয় ছিল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব দান ক'রে শ্মশানের চণ্ডাল হয়ে যাচ্ছেন, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মোহনদাসের চিত্ত আত্মহারা হয়ে যেত। গান্ধীজী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :

> "মনে মনে এই নাটক আমি শতবার অভিনয় করেছি। হরিশ্চন্দ্রের মতই সত্য পালন করবো··· বিপদে পড়লে হরিশ্চন্দ্রের মতই সত্য পালন করবো, আমার মনে এই সংকল্প সত্য হয়ে উঠতে থাকে। নাটকে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের সব বিপদকে আমি সত্য বলেই মনে করেছিলাম। হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ স্মরণ ক'রে আমি কাঁদতাম। আজ আমার বুদ্ধি বলছে, ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র নামে সত্যিই তো কোন মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তবু আজও আমার মনে শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র জীবন্ত হয়েই আছেন। আজও যদি ঐ নাটক পড়ি, তবে আমার চোখে জল আসবে ব'লে মনে হয়।"

মাত্র দুটী নাটক, ছাপার অক্ষরে লেখা, আর পেশাদার অভিনেতার আবৃত্তি ও কৃত্রিম চোখের জলে কাহিনীর পরিবেষণ, তারই স্পর্শ পরশ-পাথরের মত মোহনদাসের মনকে সোনা ক'রে দিয়ে গেল। যদি কাহিনীর মধ্যে ধ্রুবসত্যের প্রসাদ থাকে তবে তার প্রভাব মানুষের চিত্তবৃত্তির কত বড় সমুন্নতি সাধন করতে পারে, গান্ধীজীর জীবন তার একটা বড় প্রমাণ। রাজকোটের সেই পেশাদার অভিনেতার দল কবেই ইহলোক থেকে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁরা কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য মনে করতে পারেননি যে, পৃথিবীর একটী কিশোরের মনকে তাঁরা অজ্ঞাতসারে কী বিরাট দীক্ষা দিয়ে গেলেন। কিশোর মোহনদাস নিশ্চয় সেদিন উপলব্ধি করতে পারেননি, এই দুটী নাটক তাঁর সত্তাকে তাঁরই অগোচরে কোন দিব্য আকাঙ্ক্ষার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে গেল।

অকাল বসন্ত

মাত্র কৈশোর, তের বৎসর বয়স, মোহনদাসের কাছে পারিবারিক ও বৈষয়িক সংসারের রূপ যেমন তখনো সকল তাৎপর্য ও বাস্তবতা নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি, তেমনি কোন আত্মিক উপলব্ধির তত্ত্বও তাঁর কাছে তখনো পূর্ণ ও প্রবল আবেদনের রূপে দেখা দেয়নি। দার্শনিক বা নৈতিক সমগ্রতাকে তের বছর বয়সের কিশোরের বিদ্যাবুদ্ধি ও অনুভব স্পষ্ট ক'রে ধরতে পারবে, এমন আশা করা যায় না। বরং, অনুমান করা যায়, মোহনদাসের অন্তর্লোকে হরিশ্চন্দ্রের সত্যসন্ধিৎসা ও আত্মত্যাগ এবং শ্রবণের পিতৃভক্তির আখ্যান যে ছন্দোময় গুঞ্জরণ ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, তার ফলে তিনি তাঁর চেতনার নেপথ্যে একটা নতুন জগতের আভাস মাত্র অনুভব করতেন। মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত একটি অর্ধকল্পলোক। তেমনি বাস্তব সংসারও তাঁর কাছে তখন কুহেলিকার মত একটা গভীর রহস্য মাত্র। কল্পনাও সে বয়সে এত কাঁচা যে, তার দ্বারা কল্পলোকও তখন রঙীন বা রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে না। এ বয়সের সংসার দূর বেলাবলয়ের চিত্রলেখার মত নিতান্তই অস্পষ্ট। কিন্তু এই সময়েই মোহনদাসের বিবাহ হয়। বিবাহ কি, সে সম্বন্ধে সে বয়সে কোন সত্য ধারণা থাকা সম্ভব নয়, তবু সেই বয়সেই তাঁকে এক সমবয়সী বালিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথায় প্রথম প্রণয়ভীত কিশোর দম্পতির পরিচয় পাই :

"বিবাহমঞ্চে বসলাম। সপ্তপদী হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মিষ্টি ভাগ করে খেলাম। তারপর বরবধূ একসঙ্গে রইলাম, সেই প্রথম রাত্রি। একটি নিরীহ বালক আর একটি নিরীহা বালিকা না জেনে সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিল। বৌদি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাসর রাত্রিতে কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ করতে হবে। ....আমরা পরস্পরকে যেন ভয় করছিলাম, মনের মধ্যে এই ধরণের একটা ভাব ছিল। তাছাড়া, দুজনের লজ্জাও হচ্ছিল। কথা কেমন করে বলবো, কি বলবো তা কি জানি? সেকথা শিখিয়ে দিলেও কি কাজে আসে? ....ধীরে ধীরে দুজনে দুজনের পরিচয় নিতে আরম্ভ করলাম, কথাবলাও আরম্ভ হলো। আমরা দুজনেই সমবয়সী ছিলাম, তবু স্বামীসুলভ প্রভুত্ব আরম্ভ করতে আমার একটুও দেরী হয়নি।"

মোহনদাসের জীবনে এই কৈশোর-বিবাহ একটি বিশেষ ঘটনা, অকাল বসন্তের মত। দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কোন আদর্শ তাঁর মনে তখনো রূপ গ্রহণ করেনি। নারীত্ব সম্বন্ধে, নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণাও সে বয়সে হতে পারে না। আর, কস্তুরবাঈ নামে গোকুলদাস মকানজীর যে তের বছর বয়সের দুহিতা মোহনদাসের সহধর্মিণীরূপে এসেছিল, সে কিশোরীই বা দাম্পত্য জীবনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত ছিল? পতির প্রতি কর্তব্যবোধ সম্বন্ধেই বা এহেন বালিকা বধূর মনে কি ধারণা থাকতে পারে?

প্রভুত্বপরায়ণ স্বামী

কিন্তু কিশোর মোহনদাসের মনে তার স্বামিত্বের অহমিকা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে উদ্ধত হয়েই উঠেছিল। তাঁর জীবনের অকাল বসন্ত অনুরাগে রঞ্জিত ছিল ঠিকই, কিন্তু সে অনুরাগে গভীরতার চেয়ে তীব্রতা ছিল বেশী। তের বছর বয়সের বালকের মনের ধর্মের পক্ষে এ তীব্রতা অবশ্যই ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী তাঁর কৈশোর-বিবাহের ঘটনাকে দুঃখ ও অনুশোচনার সঙ্গে স্মরণ করছেন। যে বয়সে কোন ছেলের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন মনের উল্লাসে মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবার কথা, সে বয়সেই মোহনদাসের মনে যেন এক অরাজকতার উৎপাত আরম্ভ হয়। গান্ধীজী তাঁর দাম্পত্য জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ক্রীড়াবিধুর বাল্য-বিবাহিতের জীবন কিভাবে কত শীঘ্র প্রগল্‌ভ সংশয় উৎকণ্ঠা ও আসক্তির দ্বারা বিড়ম্বিত হয়ে উঠতে পারে।

> "পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সংশয় তো কারণ খোঁজে না। স্ত্রীর চলাফেরার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, তাই আমার অনুমতি ছাড়া তার কোথাও যাওয়া চলতে পারে না। এই ব্যাপার আমাদের মধ্যে এক দুঃখদায়ক কলহের কারণ হয়ে উঠলো। অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে মানা—এর অর্থ কয়েদী হয়ে থাকা। কিন্তু কস্তুরবাঈ এ রকম কয়েদ সহ্য করার পাত্রী ছিল না। যখনই ইচ্ছা হতো আমাকে জিজ্ঞেস না করে সে যেখানে খুসী চলে যেত। এ বিষয়ে আমি যত জোর করতে লাগলাম, কস্তুরবাঈ ততই সে বাধা তুচ্ছ করতে থাকে। আমার রাগও তত বেশী প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।

এর ফলে আমাদের মধ্যে কথাবন্ধ একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠলো।"

দেখা যায়, মোহনদাসের স্বামিত্বে যেন একটু বেশী মাত্রায় প্রভুত্বপরায়ণতা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। এর কারণ কি ?

এর কারণ মূলতঃ পত্নীপ্রেম। সে প্রেম ছিল অতি তীব্র ও একনিষ্ঠ। স্ত্রীকে নিজের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নেবার আকাঙ্ক্ষা—'আমি যা শেখাবো তাকে তাই শিখতে হবে, আমি যা পড়াবো, তাকে তাই পড়তে হবে'—কস্তুরবাঈকে আদর্শ পত্নী ক'রে গড়ে তোলবার জন্য মোহনদাস এই পন্থায় তাঁর প্রয়াস নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু এটা যে প্রকারান্তরে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার পথ, সে তত্ত্ব বিচার করার বয়স বা সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না। যাঁর জীবন একদিন নির্দম্ভ প্রেমের পরিপূর্ণ নিদর্শনরূপে পরিণতি লাভ করেছিল, তাঁরই কৈশোর প্রেম যেন একটু বেশী প্রতিদানলিপ্সু ছিল—"আমার অনুরাগ এক স্ত্রীর ওপরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। আমিও ইচ্ছা করতাম, তাঁর দিক থেকেও আমার প্রতি যেন এইরকম আবেগ থাকে।"

যে মধুর আপোষের নীতি গান্ধীজীর জীবনের পরবর্তী ও পরিণত অধ্যায়ে এক অতি শক্তিময় প্রক্রিয়ারূপে কাজ করেছে, কিশোর মোহনদাসের এই দাম্পত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করবার কামনা মোহনদাসের মনে প্রখর হয়ে উঠেছে দেখা যায়। এবং বশীভূত না হলেই অভিমান। প্রতিদান না পেলেই ক্ষোভ। এ ছাড়া এই সময়ের আর একটি অভিজ্ঞতাকে গান্ধীজী পরবর্তী কালে 'তিক্তস্মৃতি'-রূপে গণ্য করেছেন।

> "আমি স্ত্রীর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। স্কুলে গিয়েও তার কথাই মনে হতো। কখন্ রাত্রি হবে, কখন্ তার সঙ্গে দেখা হবে, এই ছিল আমার ভাবনা। বিচ্ছেদ অসহ্য মনে হতো।......আমার মনে হয়, যদি এই তীব্র আসক্তি সত্ত্বেও আমার ভেতর কর্তব্যপরায়ণতা না থাকতো তবে আমি রুগ্ন হয়ে মারা যেতাম।"

বিবাহিত জীবনে যে সংযমের প্রয়োজন আছে, সংযম না থাকলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য যে ক্ষুণ্ণ হয়, পরবর্তী কালে গান্ধীজী এই দুটি তত্ত্বকে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সত্যরূপে প্রচার করেছিলেন এবং জীবনের এই সত্যকে সার্থক

করেছিলেন। কিন্তু কিশোর মোহনদাসকে দেখতে পাই, দাম্পত্যের প্রথম অধ্যায়ে সে এই দুটি সত্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। অল্প বয়সে স্বামিত্ব করার যে অবকাশ তাঁর হয়েছিল এবং যেভাবে তার প্রথম পরিণাম দেখা দিয়েছিল, সেটা ঠিক সমগ্র গান্ধীস্বরূপের সঙ্গে খাপ খায় না। একটা ব্যতিক্রম, একটা অবান্তর পরিচ্ছেদ।

হাই স্কুলের ছাত্র ও বিবাহিত মোহনদাস, দাম্পত্য জীবনের রাগ-অনুরাগ ও অভিমানের দ্বন্দ্বে উতলা হয়ে আছে। সন্দেহ হতে পারে, সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্ন বুঝি এই মোহনদাসের অন্তর্লোক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সময়ে আর একটি ঘটনা দেখা দেয়, মোহনদাসের এক নতুন বন্ধুসঙ্গ লাভ হয়। হ্যাঁ, বন্ধুরূপেই তার আগমন এবং এই বান্ধবতা কয়েক বৎসর স্থায়ী হয়।

অন্ধকারের আক্রমণ

এই কয়টি বৎসর মোহনদাসের জীবন মোহগ্রস্ত পথভ্রান্তির জীবন। নতুন বন্ধু ছিলেন দৃঢ় পেশীবহুল মজবুত শরীরের মানুষ। খুবই গায়ের জোর। যেমন দম, তেমনই তাঁর দৌড়বার আর লাফঝাঁপ করার শক্তি, আর তেমনই সাহস। রোগাশরীর মোহনদাস এই পরাক্রমের প্রতীক বন্ধুটির দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতেন, সে দৃষ্টিতে যেন এই আবেদন ছিল—যদি তোমার মত হতে পারতাম!

এই বন্ধুর কাছেই মোহনদাস একটি নতুন তত্ত্বের কথা প্রথম শুনতে পেলেন। —আমরা নিরামিষ খাই বলেই এত দুর্বল জাতি হয়ে আছি। ইংরাজেরা মাংস খায় বলেই পুরা পাঁচ হাত লম্বা তাদের চেহারা এবং ঐ গায়ের জোরেই তারা আমাদের দাবিয়ে রাখে। মাংস খেতে হবে, নইলে সাহসী হওয়া যায় না, গায়ের জোরও হয় না।

মাংসপেশীর গৌরব ও মাংসাহারের মহিমা—নতুন বন্ধুর কাছে, এই নতুন থিওরীর কাছে মোহনদাস অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। বন্ধুও মোহনদাসকে নতুন থিওরীর এক একটি পথে হাত ধরে নিয়ে যেতে থাকে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে মোহনদাস গোপনে মাংসাহার আরম্ভ করেন। কিন্তু মাত্র এখানেই সেই নতুন থিওরী ক্ষান্ত হয় না, নতুন বন্ধু একদিন মোহনদাসকে এক পতিতালয়ে নিয়ে উপস্থিত করলো।—"আমি একেবারে পাপের মুখের ভিতর গিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভগবানের অপার করুণা আমাকে রক্ষা করলো। ঘরের ভেতর গিয়ে আমি যেন অন্ধের মত হয়ে গিয়েছিলাম, কথা বলারও শক্তি ছিল

না। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমে আমাকে কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিল, তারপর আমাকে দরজা দিয়ে বের করে দিল।"

একের পর এক মোহনদাসের জীবনে যেন অন্ধকারের আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। আর এক বন্ধুর সঙ্গে ধূমপানের চর্চা চলতে থাকে, তার জন্যে পয়সা চুরি করতে হয়। গুরুজনের অধীনতা অসহ্য বলে মনে হয়। কিশোর মোহনদাসের চিত্তদৈন্য এক চরম পর্যায়ে পৌছয়। আত্মহত্যার জন্য ধুতুরার বীজ সঙ্গে নিয়ে কেদারজীর মন্দিরের নিভৃতে গিয়ে উপস্থিত হন মোহনদাস।

আত্মহত্যা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পর পর এই ঘটনাগুলি এক পথভ্রান্ত কিশোর-জীবনের করুণ ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

মাংসপেশীর গৌরব বা গায়ের জোরের আদর্শ, আমিষাহার, ধূমপান ও গোপনতা—ঠিক যেসব অপনীতি ও অসদাদর্শের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর জীবন এক অক্লান্ত বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর কিশোর জীবনের এই অধ্যায়টি সেই সব অপনীতি ও বিভ্রান্তির প্রকোপে কণ্টকিত।

কিন্তু শুধু এই কি কিশোর মোহনদাসের জীবনের পরিচয়? হরিশ্চন্দ্র যার ধ্যানের আসনে ঠাঁই পেয়েছিল—শ্রবণের পিতৃভক্তি যার কিশোর হৃদয়ে আবেশ সৃষ্টি করেছিল—সেই মোহনদাস কোথায়?

অল্পকাল পরেই গোপনে আমিষাহারের ইচ্ছা মোহনদাস একেবারেই বর্জন করেন। তার কারণ এই নয় যে, আমিষাহারকে অন্যায় বলে মোহনদাস উপলব্ধি করেছিলেন। বাপ মার কাছে গোপনতা বা মিথ্যাকথা বলার দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই মোহনদাস এ অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। বাপ-মার কাছে এই ভয়ঙ্কর অবৈষ্ণবোচিত অনাচারের কথা বলা যায় না; কারণ তাতে তাঁদের মনে যে দুঃখ দেওয়া হবে, তা মোহনদাস কল্পনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু গোপনতা করাও যায় না; সেটা বাপ-মার প্রতি আর এক রকমের অমর্যাদা।

আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব

দেখা যাচ্ছে যে, মোহনদাসের অন্তশ্চেতনায় পিতৃমাতৃভক্ত কিশোর শ্রবণের মূর্তিটি এক আলোকময় প্রেরণার দীপরূপে তখনো রয়েছে। বাইরের জীবনের ওপর যদিও অন্ধকারের আক্রমণ চলেছে, চিত্তের গভীর থেকে উৎসারিত তেমনই এক আলোকের প্রবাহ অলক্ষ্যে মোহনদাসের সকল কর্ম নর্ম ও চিন্তার ওপর প্রসন্ন

সত্যশীলতা বিস্তার ক'রে চলেছে। কিশোর মোহনদাসের জীবন এই দুই পরস্পর-বিপরীত আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বও বুঝি একদিন চরমে পৌঁছেছিল। মোহনদাস ও তাঁর ভাই একটা কর্জ শোধ করার কোন উপায় না দেখে অবশেষে ভাইয়ের সোনার তাগা থেকে একতোলা অংশ কেটে নিয়ে বিক্রী করে, ধারও শোধ হয়। কিন্তু মোহনদাসের অপরাধবোধ দুঃসহ হয়ে উঠলো। আর চুরি করবো না—এই সঙ্কল্প ক'রেও মনে শান্তি আসে না। শেষ পর্য্যন্ত একটি কাগজে ঘটনার বিবরণ লিখে এবং অপরাধের জন্য শাস্তি প্রার্থনা ক'রে মোহনদাস চিঠিটি পিতার হাতে দিলেন।

> "বাবা চিঠি পড়লেন। তাঁর চোখ থেকে মুক্তা-বিন্দু ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি ক্ষণিকের মত চোখ বন্ধ করে রইলেন, তারপর চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিঃশব্দে শুয়ে রইলেন।......তাঁর চোখের জলের মুক্তা-বিন্দু আমার মন বিদ্ধ করেছিল।"

পিতা ক্ষমাময় শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। মোহনদাস আশা করেছিল, পিতা ক্রোধ ও কটু কথার দ্বারা তিরস্কার করবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। পিতৃহৃদয়ের বেদনা শুধু মুক্তা-বিন্দুর মত চোখ থেকে ঝরে পড়লো। তবু এই অশ্রুবিন্দু কটু তিরস্কারের চেয়ে কত তীক্ষ্ণ! মোহনদাসের হৃদয় বিদ্ধ হয়।

মোহনদাসের জীবনে এই ঘটনা অহিংসাতত্ত্বের প্রথম পাঠ, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে নয়। রোষহীন শান্ত ও বিনীত প্রতিবাদের শক্তি কত বড়, মোহনদাসের মনের অগোচরে হয়তো এই ঘটনা এক বিরাট শিক্ষার বীজ বপন ক'রে দিয়েছিল।

কিশোর মোহনদাসের জীবন আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব। এক এক সময় মনে হয় আঁধার যেন আলোককে পরাস্ত ক'রে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আলোকের প্রেরণা চেতনার নেপথ্য ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মোহনদাসের কর্ম ও চিন্তায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

ভিন্ন জগতের বার্তা

পিতার অসুখের সময় পিতার সঙ্গে কিছুদিন পোরবন্দরে প্রতি রাত্রিতে রামজীর মন্দিরে গিয়ে রামায়ণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মোহনদাস; রাজকোটে একাদশীর দিন ভাগবত পাঠ শুনতেন। বাপ-মার সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে, শিবালয়ে ও রামমন্দিরে যাওয়ার সুযোগও মোহনদাসের হয়েছিল। পিতার নিকট জৈন

আচার্য, মুসলমান এবং পার্শী বন্ধুরাও এসে যেসব ধর্মালোচনা করতেন, কিশোর মোহনদাস সবই শুনতে পেতেন। এ যেন এক ভিন্ন জগতের বার্তা, স্কুলের পৃথিবী ও নতুন বন্ধুর প্রগতিবাদের পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র।

এইভাবে বহু বিভিন্ন ধর্মের যে পরিচয় যতটুকু মোহনদাসের মনে অঙ্কিত হয়েছিল, তার ফলে অলক্ষ্যে আর একটি মহৎ পরিণামের ভিত্তি এখানেই যেন রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সর্বধর্মে সমভাবের প্রথম শিক্ষা এইখানে।

কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা এখনও কোন সুস্থির রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। ঈশ্বরের প্রতি আস্থার উন্মেষ এখনও ঠিক দেখা দেয়নি, বিশ্বাস দ্বারা মোহনদাসের এই ধর্মবোধ তখন উদ্দীপিত ছিল না।

কিন্তু আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বময় এই কিশোর-জীবনের পরীক্ষার ভেতর দিয়েই মোহনদাসের মন একটা বড় তত্ত্বের ঐশ্বর্য আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

> "একটা বিষয়ে আমার ধারণা দৃঢ় হয়ে গেল—এই জগৎ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আবার এই নীতিসমুদয় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যেরই অনুসন্ধান করতে লাগলাম। দিন দিন সত্যের মহিমা আমার কাছে বড় হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। সত্যের সংজ্ঞাও বড় হয়ে দেখা দিতে লাগলো।...... কবি শ্যামল ভট্টের একটি গুজরাটী নীতিকথার কবিতাও আমার চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়। এই কবিতার উপদেশ হলো—অপকারের বদলে অপকার নয়, উপকারই দিতে পারা যায়। এই নীতি আমার জীবনের আদর্শ হয়ে গেল।......আমি এই আদর্শের অজস্র পরীক্ষা সুরু ক'রে দিলাম।"

শেষ পর্যন্ত সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্নই জয়ী হলো। বিপথের ছলনা ও অন্ধকার পরাস্ত হয়। মোহনদাসের কিশোর-চিত্ত তীর্থপথিকের রূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। বিশ্বাসের ঈশ্বর এখনো তাঁর কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু নীতিময় এক সত্যের অস্তিত্বকে যেন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে। সত্যের সন্ধানে ও সত্যের পরীক্ষায় মোহনদাসের মনে সন্ধানী ও গবেষকের প্রতিভা এই সময় প্রথম বিকশিত হয়ে ওঠে।

তিনটি প্রতিজ্ঞা

কিন্তু মাত্র আর কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় একটি তরুণ ভারতীয় ধীরে ধীরে বিলাতগামী জাহাজে উঠছে দেখা যায়। তার মমতাময়ী মাতা,

তরুণী স্ত্রী ও শিশুপুত্র দূর রাজকোটের এক গৃহাভ্যন্তরে পড়ে আছে। পিতা কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। সমাজপতিরা বিলাতযাত্রী তরুণকে জাতিচ্যুত ক'রে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে—'এই ছোকরাকে যে সাহায্য করবে অথবা বিদায়ের সময় তার সঙ্গে যাবে, তাকে পাঁচ সিকা জরিমানা করা হবে।' তবু এই তরুণের উৎসাহ কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি। স্ত্রীর গহনা বিক্রি ক'রে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে এই তরুণ ভারতীয় চলেছেন বিলাতে। তাঁর মন ব্যারিস্টার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।

ইনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বিশ্বের মহাত্মা যাঁর সত্তায় মহা আবির্ভাবের জন্য তখন ভবিষ্যতের ধ্যানলোকে প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু দেখে সন্দেহ হয়, সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের স্বপ্ন কি আবার তুচ্ছ হয়ে গেছে? দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীর রূপ এ তো নয়। নেহাৎই বৈষয়িক মানুষ, যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি-পিপাসী একটি নিতান্ত সাধারণ যুবক বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারী পাশ ক'রে জীবন ধন্য করার জন্য কালো রঙের জ্যাকেট, ট্রাউজার ও টুপিতে বিচিত্র হয়ে জাহাজে উঠলেন। আরব সমুদ্রের জল আলোড়িত ক'রে জাহাজ চললো, যুবক মোহনদাসের আকাঙ্ক্ষিত শ্বেতদ্বীপের অভিমুখে। পেছনে ভারতভূমির এক গৃহকোণের প্রতি মমতার বন্ধনে অবশ্যই এই বিলাতযাত্রী তরুণের মন বাঁধা ছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় এক বন্ধন স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি চলেছিলেন। বিলাত যাবার আগে মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মোহনদাস—"মদ্য, মাংস ও স্ত্রীসংসর্গ থেকে দূরে থাকবো।"

১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর, উনিশ-বছর বয়সের মোহনদাস ইংলণ্ড পৌছলেন। সাউদাম্পটন বন্দরে জাহাজ থেকে সাদা ফ্ল্যানেলের পোষাক পরে যেন এক নূতন রঙ্গমঞ্চে নামছিলেন, এক অনিপুণ লাজুক ও ভীতুস্বভাবের অভিনেতা। তারপর ভিক্টোরিয়া হোটেল। ইংরাজী কায়দাদুরস্ত জীবনে তাঁকে এইখানে দীক্ষা নিতে হবে। এইখানে এসে ভারতীয় বন্ধুর কাছে ইংরাজী লৌকিকতার প্রথম পাঠ শুনলেন—'জোরে কথা বলো না। ভারতবর্ষে যেমন সকলের সঙ্গে যেচে কথা বলা যায়, এখানে তা চলে না। কারও জিনিস হাত দিয়ে ছোঁবে না।' হোটেলের খাদ্য ভাল লাগে না, একরকম না খেয়েই দিন কাটে, তার ওপর অতিরিক্ত খরচ। তারপর একদিন হোটেল ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের একটি ভাড়া-করা কামরায় গিয়ে মোহনদাস তাঁর প্রবাস-জীবনের ঠাঁই বেছে নিলেন। আর সেই সঙ্গে ভারতীয়

মমতায় লালিত গৃহপ্রিয় একটি যুবকের মন এই বৈদেশিক রুচি ও উপচারের মধ্যে নীরবে কেঁদে ওঠে।

"সেই কামরাতে এসেও মন-মরা হয়ে রইলাম। দেশের কথা কেবলই মনে হতো। মায়ের ভালবাসা যেন মূর্ত্তি ধরে বার বার দেখা দেয়। রাত হ'লে চোখে জল আসে। ঘরের কথা মনে ক'রে ঘুম আসে না।............... আমি বুঝতে পারি না, কি ক'রে মন শান্ত করবো। এখানকার লোক বিচিত্র, জীবন-যাত্রা বিচিত্র, ঘরও বিচিত্র। এসব বাড়িতে থাকার রীতি-নীতিও অজানা। কি করলে বা কি বললে রীতি ভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। তার ওপর নিরামিষ আহারের ব্যাপার ছিল, এবং নিরামিষ খাবার যা দিত, তা বিস্বাদ লাগ্‌তো। আমার দশা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে।"

বণ্ড ষ্ট্রীটের পোষাক

কিন্তু গৃহমুখী মনের কান্না শুদ্ধ ক'রে দিতেই হবে। মোহনদাস ব্যারিস্টার হবার জন্য এসেছেন। আর ব্যারিস্টার হতে হলে সাহেবও হতে হবে। সুতরাং মোহনদাস এর পর থেকে সত্যি ক'রে সাহেব হবার সাধনায় উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভাড়া করা কাম্‌রা ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম কেনসিংটনে এক অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের গৃহে খরচা-দেওয়া অতিথিরূপে মোহনদাস আশ্রয় নিলেন। আরম্ভ হলো সাহেব হবার সাধনা।

"বোম্বাইয়ের দর্জির তৈরী পোষাকের কাট-ছাঁট উন্নত ইংরাজ সমাজে শোভা পায় না, সেইজন্য 'আর্মি ও নেভি স্টোর' থেকে পোষাক তৈরী করিয়ে নিলাম। উনিশ শিলিং মূল্যের চিম্‌নি টুপি মাথায় দিলাম। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, পোষাক-সৌখিনদের প্রিয় বিপণিমালা যেখানে সেই বণ্ড ষ্ট্রীট থেকে দশ পাউণ্ড দাম দিয়ে এক সান্ধ্য-পোষাক তৈরী করালাম। বাঁধা-টাই ব্যবহার শিষ্ট সমাজে শোভা পায় না, তাই টাই বাঁধা শিখলাম, চুল সুবিন্যস্ত রাখার জন্য রোজ বুরুশ নিয়ে যুদ্ধ চলতো।"

কিন্তু শুধু পোষাকটাকেই সাহেবী করলে কি সভ্য সাহেব হওয়া যায়? মোহনদাস আরও ভাল ক'রে সভ্য হবার প্রয়াস আরম্ভ করলেন।

"সভ্য পুরুষের পক্ষে নাচ জানা চাই, ফ্রেঞ্চ বলতে পারা চাই।......আমি

নাচের ক্লাসে যোগ দিলাম। একবারের কোর্স শিক্ষার ফী তিন পাউণ্ড দিতে হলো। সুর ও তাল বুঝবার জন্য বেহালা বাজানো শিখতে হবে। তিন পাউণ্ড দিয়ে বেহালা কিনলাম এবং শিখবার জন্য আরও কিছু খরচ করলাম। বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষার জন্য এক গিনি দিয়ে এক শিক্ষক ঠিক করলাম।"

সত্যসন্ধানীর জীবনের পথে মাঝে মাঝে ছলনা দেখা দেয়, এটা বোধহয় একটা ঐতিহাসিক নিয়ম। মহানিষ্ক্রমণের পথে কপিলাবস্তুর এক সত্যসন্ধানীর সম্মুখে মার একদিন ছলনা বিস্তার করেছিল। ছলনার রূপও বোধহয় স্বর্ণ-মৃগের মতই, মায়া বিস্তার করাই তার পদ্ধতি। কিশোর মোহনদাসের জীবনের পথে ছলনা দেখা দিয়েছে, একবার নয়, অনেকবার। ইংরাজীয়ানার এই মোহ বোধহয় তার প্রথম উদাহরণ। কিন্তু এই ইংরাজীয়ানার স্বর্ণমৃগ মোহনদাসকে পথভ্রান্ত করতে পারেনি। মাত্র ক্ষণিকের বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল। মোহনদাস অল্পদিনের মধ্যেই এই পরিপাটি কৃত্রিমতার স্বরূপ চিনতে পারেন। সহসা তাঁর চিত্তের গভীরে আত্ম-জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়:

"আমি বিদ্যার্থী, আমার যে বিদ্যাসম্পদ সঞ্চয় করা দরকার। আমাকে আমার ব্যবসার জন্য কাজে লাগ্‌তে হবে। এই নাচ নেচেই কি সভ্য হওয়া যায়? না, আমার আচরণের শুদ্ধতাই আমাকে সভ্য করবে।"

এই আত্মজিজ্ঞাসাই জয়ী হলো। মোহনদাস তাঁর বেহালা বিক্রী ক'রে দিলেন। নাচ-শিক্ষয়িত্রী ও বক্তৃতা-শিক্ষককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন—আমার নাচে ও বক্তৃতাবিদ্যায় প্রয়োজন নেই। মোহনদাসের এই 'সভ্য' হবার আগ্রহ ছিল মাস তিনেক, পোষাকের প্রতি অনুরাগ ছিল বৎসর খানেক। কিন্তু তার পরেই এই সৌখীনতার চিরসমাধি হয়। মোহনদাস এর পর তাঁর অধ্যয়নে তৎপর হয়ে ওঠেন।

সৌখীনতার সমাধি

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ইংলণ্ড প্রবাসকালে মোহনদাসের সত্যনিষ্ঠা আর চেতনার গভীরে সুষুপ্ত হয়ে ছিল না। জাগৃতির সূচনা দেখা দিয়েছে। মোহনদাস আর আকস্মিকের ক্রীড়নক নয়, নিজের ক্ষুদ্রতাকে জয় করার প্রয়াস স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মোহনদাসের সত্তা আর সহজে আত্মসমর্পণ করতে রাজী

হয় না। অবস্থা ও পরিবেশ আর মোহনদাসকে বাধ্য ক'রে রাখতে পারে না। পরিবেশের বন্ধন অতিক্রম করার মত শক্তি মোহনদাস নিজের মধ্যে অন্বেষণ করেন, অন্বেষণ করলেই সেই শক্তি লাভ করেন এবং শক্তি লাভ ক'রে আনন্দ অনুভব করেন। বুঝতে পারা যায়, মোহনদাসের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপরীক্ষার অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে।

আর বিলাস ও ব্যয়বাহুল্য নয়, নিরাড়ম্বর সরলজীবনের আহ্বান মোহনদাস শুনতে পেয়েছেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে মোহনদাস আবার কাম্‌রা ভাড়া ক'রে থাকতে লাগলেন। খরচ অর্ধেক হয়ে গেল। স্টোভ কিনে নিজেই রান্না আরম্ভ করলেন, পরিজ আর কোকো, তার সঙ্গে রুটি। এই হলো আহার্য। সময়ের বেশীভাগ পড়াশুনার চর্চা ক'রে কেটে যেতে লাগলো। মোহনদাস লণ্ডনে ম্যাট্রিক পাশ করলেন।

সরল শ্রমশীল বিদ্যার্থীর জীবন, এই সময়ের স্মৃতি গান্ধীজী তাঁর আত্মকথায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

> "এই সব পরিবর্তনের ফলে আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক স্থিতির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হলো। জীবনের তাৎপর্য বড় হয়ে দেখা দিল। অজস্র প্রসন্নতায় আমার মন ভরে গেল।......আমি যত অন্তরের ভিতরে গভীরভাবে ডুবে যাচ্ছিলাম, বাইরের ও অন্তরের আচরণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন ততই বেশী ক'রে অনুভব করছিলাম।"

এই বিদ্যার্থী কি নিতান্তই ডিপ্লোমাপ্রয়াসী একটি ছাত্র? যদি তাই হয়, তবে নিজের অন্তরের ভেতর গভীরভাবে ডুবে কোন্ রত্ন তিনি অন্বেষণ করছেন? এ অন্বেষণের প্রয়োজনই বা কি?

মোহনদাস নামে ইংলণ্ডপ্রবাসী এই ভারতীয় ছাত্রটির বহির্বাস অবশ্যই কাষায়রঞ্জিত ছিল না। কিন্তু তার আড়ালে যেন অদৃশ্য এক চীরধারী ভিক্ষুর মূর্তি রয়েছে। মোহনদাস সত্যিই তো বৌদ্ধ ছিলেন না, কনফুসিয়াসপন্থীও না। বৌদ্ধশাস্ত্র বা কনফুসিয়াসের মতবাদের সঙ্গে তিনি তখন পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু মোহনদাসের চিত্তে তাঁর অজ্ঞাতসারেই এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক সুর যেন আপনা থেকেই ধ্বনিত হয়ে উঠছে। এই সুর হলো বুদ্ধকথিত শীলময় জীবনের সুর। এই সুর হলো কনফুসিয়াস প্রবর্তিত সদাচারপ্রবণ জীবনের সুর। মিতব্যয়, নিরামিষাহার, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ ধারণ ও বিলাস বর্জন ইত্যাদি প্রয়াসের দ্বারা

মোহনদাস যেন তাঁর অন্তরের ও বাহিরের আচরণকে শুদ্ধ ক'রে চলেছেন। এর পেছনে পরিপূর্ণ ধর্মবোধের কোন প্রেরণা ছিল না, ছিল নীতিবোধ। দেশে থাকতেই তাঁর কৈশোরের যুক্তি ও চিন্তায় এক নীতিময় সত্যের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। সেই স্বীকৃতি তাঁকে সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর করেছে। সেই অনুসন্ধান এতদিনে তাঁর আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করেছে। মোহনদাস একান্তভাবে নিজেরই শক্তির সাহায্যে তাঁর অন্তরপটে একে একে সদাচারের অনুশাসন উৎকীর্ণ ক'রে চলেছেন।

কিন্তু সদাচারী ও সত্যসন্ধানীর জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সে পথ দুরূহ সংযমের পথ। সে পথে পথিকের পায়ে কখনো কুশাঙ্কুর বিঁধে, কখনো বা দেখা দেয় আলেয়া, কখনো মরীচিকা। মোহনদাসের জীবনের পথে দুটি ছলনা দেখা দিল, একটি আলেয়া, আর একটি মরীচিকা।

আলেয়া ও মরীচিকা

ব্রাইটনের একটি হোটেলে মোহনদাসের সঙ্গে এক ধনশালিনী বিধবা ইংরাজ মহিলার পরিচয় হয়। এই মহিলার লণ্ডন ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে মোহনদাসের সঙ্গে এক তরুণীর পরিচয় হয় ও তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হতে থাকে। প্রতি রবিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য মোহনদাস এই গৃহে আসতেন। কিন্তু—"ক্রমে এমন হলো যে, আমি রবিবারের আশায় দিন গুনতাম, সেই তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত।"

বিবাহিত মোহনদাস, একটি সন্তানের পিতা তিনি। এই পরিচয় তিনি পরিচিতাদিগের কাছে গোপন ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই তরুণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিণাম কি হতে পারে, সেটা হয়তো ক্ষণিকের মত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। অথবা তাঁর চক্ষে ক্ষণিকের মত মোহাঞ্জন লেগেছিল, তাই আলেয়াকেই নিকটের আলোক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু মোহনদাসের সুনীতিপরায়ণ চিত্ত অবশ হয়ে যায়নি। এই মিথ্যার গ্রাস থেকে নিজেকে ছিন্ন করতে পারলেন মোহনদাস এবং সেই গৃহকর্ত্রী মহিলার কাছে পত্র দিয়ে জানালেন :

> "আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন ? যে ভগ্নীর সঙ্গে আপনি আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি কোন অশোভন আচরণ

করিনি, কিন্তু সে পরিচয়ের সম্পর্কে কতদূর যে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। আপনি জানেন না যে, আমি বিবাহিত।"

মোহনদাসের খোলা হৃদয়ের চিঠি পেয়ে তাঁর বান্ধবীদ্বয় আনন্দিত হয়েছিলেন। মোহনদাসের মন থেকে যেন একটা বোঝার ভার নেমে গেল। "আমার মধ্যে যে অসত্যের গরল প্রবেশ করেছিল, এইভাবে আমি তা দূর করেছিলাম।"

মোহনদাসের এই মোহমুক্তির প্রয়াস, এটাও তাঁর উদ্বোধিত আত্মশক্তির নিদর্শন। নিজেব ত্রুটি ও ভ্রান্তি থেকে তিনি নিজেরই যুক্তিবাদ ও নীতিবাদের সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করলেন।

কিন্তু এর পরের ঘটনা অন্য রকম। পোর্টস্‌মাউথের রাত্রি। নিরামিষাহারীদের একটী সম্মেলনে সদস্যরূপে যোগদানের জন্য এসেছিলেন মোহনদাস, সঙ্গে এক ভারতীয় বন্ধু। সভা শেষ হয়ে গেছে। দুই বন্ধু তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু এ গৃহের চারিদিকে নারকীয় পরিবেশ, পণ্যনারীর বসতি। এই বীভৎসতা ঘরের ভেতরেও এসে প্রবেশ করলো। বন্ধু আমোদে মত্ত হয়ে উঠলেন। আর মোহনদাস? মায়ের ছলনা মোহনদাসের সত্তাকে প্রায় গ্রাস ক'রে এনেছে, মোহনদাস মুগ্ধ হয়ে উঠছেন। কিন্তু নারকীয় রঙ্গে সুদক্ষ সেই বন্ধুটিই মোহনদাসকে বাধা দিয়ে ধিক্কারবাণী শুনিয়ে দিলেন—পালাও, তোমার পক্ষে এসব শোভা পায় না।

মোহনদাস পালিয়ে যায়, ব্যাধের জাল ছিন্ন ক'রে এক পলাতক শিকারের মত। এই আত্মোদ্ধার ও আত্মরক্ষা নিশ্চয় আত্মশক্তির দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে কোন্ দৈবী শক্তি মোহনদাসকে রক্ষা করেছিল?

"ধর্ম কি, ঈশ্বর কি? তিনি কিভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করেন, তখন তার কিছুই জানতাম না। সাধারণ লৌকিক যুক্তি দিয়ে এইটুকু বুঝলাম—ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

সঙ্কটে ঈশ্বরই রক্ষা করে থাকেন, উপায়হীন শূন্যতার মধ্যে ঈশ্বরই পথ দেখিয়ে দেন—এই বিশ্বাস যেন অর্ধোস্ফুটরূপে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মোহনদাসের চিত্তের গভীরে ক্ষণিক রশ্মির মত স্পর্শ ক'রে চলে গেল। কিন্তু এই বিশ্বাস তখনো স্থির শিখার রূপ গ্রহণ করেনি।

মোহনদাসের জীবনে গুরুরূপে কেউ নেই, কোন অলৌকিক আকাশবাণী তাঁকে তত্ত্বের সন্ধান দেয় না। কিন্তু সত্যান্বেষীর অন্তর তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। কী

সেই পরম প্রার্থিতব্য, যা না পাওয়া পর্যন্ত জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না ? আকাশের ধ্রুবতারার মত মানুষের ইতিহাসে কি কোন ধ্রুব নেই ?

মহাসাগরের কল্লোল

এইবার মোহনদাসের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ হলো, ধ্রুবলোকের মতই তাঁদের স্বরূপ। তাঁরা এ যুগের নন, এক যুগের নন, তাঁরা মানুষের ইতিহাসের। মহাত্মা গান্ধী যে গ্রন্থকে 'চিরন্তনী মাতা'-রূপে পরবর্তী কালে চিনতে পেরেছিলেন, ভগবদ্গীতা নামে সেই গ্রন্থটির সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় হয়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের মনে বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে ভ্রান্তি, ভ্রান্তি থেকে বুদ্ধিনাশ, আর বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

ভগবদ্গীতার বাণীতে মোহনদাসের হৃদয়তন্ত্রী সুরময় হয়ে ওঠে। তারপর, এডুইন আরনল্ডের বুদ্ধচরিত বা 'লাইট অব এসিয়া'—কপিলবস্তুর রাজকিশোর সংসারমায়ার সব সুন্দর বিভ্রম পেছনে রেখে দিয়ে জীবদুঃখ বিনাশের মন্ত্র সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাচ্ছেন। মারের ছলনা তাঁর পথরোধ করতে পারলো না। বোধিদ্রুমতলে তপোলব্ধ দিব্যজ্ঞানের আলোকে তিনি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলেন। জরা জন্ম ব্যাধি ও মরণ, গৃহকূটের সকল রহস্য তিনি বুঝে ফেললেন। তিনি বিসংস্কারগত চিত্ত, সকল তন্হা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গেছে। মর্ত্যবাসীর জন্য মৈত্রী ও মহাকরুণার বাণী রেখে এসিয়ার আলোক মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন।

তারপর, নিউ টেস্টামেণ্টের 'সারমন অন দি মাউণ্ট।'—বেটেলহামের এক দরিদ্রা নারীর ক্রোড়ে যে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন, কী ঐশ্বর্য পৃথিবীকে দান ক'রে গেলেন তিনি ? কাঁটার মুকুট মাথায় পরে স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ মহামরণ বরণ ক'রে মানবতাকে অবনতির সমাধি থেকে পরিত্রাণের পথ চিনিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কি বিস্ময়কর তাঁর বাণীর মর্ম !

"Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth ? But I say unto you, That ye resist not evil but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also."

"যে তোমার চোখ নষ্ট করে, তুমিও তার চোখ নষ্ট ক'রে দেবে, আর যে তোমার দাঁত ভাঙবে তুমিও তার দাঁত ভেঙে দেবে—প্রতিশোধের এই পন্থার কথাই তোমরা শুনে এসেছ। কিন্তু আমি তোমাদের বলি, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করো না। বরং যে তোমার ডান গালে চড় মারবে, তুমি তার দিকে তোমার অপর গাল এগিয়ে দিও।"

"Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul."

"যারা তোমার শরীরকেই শুধু হত্যা করতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, তাদের ভয় করো না।"

গীতার বাণী, বুদ্ধের বাণী ও যীশুর বাণী—মোহনদাস তাঁর একলা মনের নিভৃত চিন্তায় যেন এক মহাসাগরের কল্লোল শুনতে পেলেন, যে কল্লোল যুগে যুগে মানুষ-জাতির হৃদয় মন্ত্রপূত ক'রে এসেছে।

এ কল্লোল মোহনদাসের মনের মধ্যেই রইল। ধর্মের সঙ্গে মোহনদাসের মনের পরিচয় অনেকখানি নিবিড় হয়ে এসেছে, তবু তার পরিণাম জীবনের একটা বৃহৎ ঘটনারূপে সব ওলট পালট ক'রে দিয়ে অথবা জীবনের গতিসমূহ পরিবর্তিত ক'রে দিয়ে দেখা দেয়নি। কারণ এটা ছিল ধর্ম-পরিচয়, ঠিক জাগ্রত ধর্মবোধ নয়। বিলাতে থাকতে নিরামিষাহারের তত্ত্ব নিয়ে মোহনদাস অনেক চিন্তা ও অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক ধর্মবোধ থেকে নয়। আহার্যের সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার কোন সম্পর্ক আছে কি না, ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর তখন মোহনদাস খুঁজছিলেন না। নিরামিষাহারকে নীতি ও শুদ্ধ সদাচারের বিষয় হিসাবেই তিনি বুঝেছিলেন। মোহনদাসের জীবনের এই অধ্যায় যদিও নীতিবাদ ও ধর্ম-পরিচয়ের অধ্যায় মাত্র, যদিও অধ্যাত্ম প্রেরণার কল্লোল তাঁর চিন্তালোকের অভ্যন্তরে নিঃশব্দ হয়ে আছে, তবু একটা পরিবর্তন যে আভাস দিয়ে আসছে তার লক্ষণ দেখা যায়। প্যারিসে প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এক হাজার ফুট উচ্চ লৌহময় বিরাট এফিল টাওয়ার দেখলেন মোহনদাস। কিন্তু এই বিরাটত্ব তাঁর মনের ওপর কোন আবেদন সৃষ্টি করেনি। বরং প্যারিসের নোতরদাম গির্জার অভ্যন্তরে গিয়ে তিনি শান্তি ও মহিমা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

সংসার ও সমাজ

কিন্তু অনুভবের দিকে এখন আর বেশী দূর নয়, মোহনদাসকে ব্যারিস্টার হতে হবে। রোমান ল' আর ইংলণ্ডীয় আইনের গ্রন্থ পাঠ করে পরীক্ষা দিয়ে ও পাস ক'রে ব্যারিস্টার হলেন মোহনদাস। তারপর আড়াই শিলিং দক্ষিণা দিয়ে ইংলণ্ডের হাইকোর্টের তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেন, তখন ১৮৯১ সালের জুন মাস।

দেশে ফিরেছেন মোহনদাস। কিন্তু এসেই জানলেন—মা নেই। তিনি বিলেতে থাকতেই মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু সে সংবাদটি তাঁকে জানানো হয়নি। পিতার মৃত্যুতে যতখানি আঘাত পেয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুতে তার চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন মোহনদাস।

মোহনদাস জাতিচ্যুত। এক দল জ্ঞাতি মোহনদাসকে সমাজে নিতে আপত্তি করেনি, কিন্তু আর-এক দল তাঁকে জাতিচ্যুত করলো। মোহনদাস এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ প্রকাশ করেননি। শান্তভাবেই এই জাতিচ্যুতি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। এমন কি তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে ও ভগ্নীর বাড়ীতে গেলেও জল পর্যন্ত খেতেন না, যদিও তাঁরা গোপনে গোপনে মোহনদাসের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গোপনতাকে মর্যাদা দিতে মোহন-দাসের মন রাজী হয়নি।

বিলাত থেকে ফিরে এসে এই সংসার ও সমাজকে পেয়েছিলেন মোহনদাস। সংসারের দিক থেকে একটি শোক, আর সমাজের দিক থেকে একটি তাপ। নিজের স্ত্রী ও পুত্র, তাছাড়া দাদা ও তাঁর পরিবার, সব শোক-তাপ সত্ত্বেও এই দায়িত্বের সংসারকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে পালন করতে হবে এবং তার জন্যে বিষয় অর্জনও করা চাই। মোহনদাস বোম্বাই এসে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করলেন।

যে শহরে ফিরোজ শা মেটা ও বদরুদ্দীন তায়েবজীর মত আইন-মহারথীরা সিংহ-পরাক্রমে ব্যারিস্টারী করছেন, সেইখানে আইন ব্যবসায় করতে এলেন শশক ব্যারিস্টার মোহনদাস। তিনি স্মল কজ কোর্ট বা ছোট আদালতেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন। একটি ছোট মামলাও পেয়েছিলেন এবং ফী নিয়েছিলেন।

পরবর্তী দৃশ্য হলো: আদালতে জজের সম্মুখে প্রতিপক্ষকে জেরা করার জন্যে ব্যারিস্টার মোহনদাস উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর কাঁপতে আরম্ভ করলো, মাথা ঘুরতে লাগলো, মনে হলো যেন সমস্ত আদালতকক্ষ ঘূর্ণিত হচ্ছে। আর প্রশ্ন

করার মত শক্তি ছিল না মোহনদাসের। জজ হাসলেন, উকিলেরা হেসে লুটিয়ে পড়লেন। মোহনদাসের চক্ষে অন্ধকার। বসে পড়লেন মোহনদাস। তাঁর পার্টিকে জানিয়ে দিলেন, এ মামলা তিনি চালাতে পারবেন না। ফী ফেরত দিয়ে দিলেন।

এর পর আরম্ভ হলো আর্জি লিখে কিছু পয়সা উপার্জনের চেষ্টা। কিন্তু তাতে পয়সার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। সংবাদপত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে এক হাই স্কুলে শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করলেন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বেতন পঁচাত্তর টাকা। কিন্তু যোগ্য গুণবত্তার অভাবহেতু আবেদন না-মঞ্জুর হলো, আবেদনকারী মোহনদাস গ্রাজুয়েট ছিলেন না।

বোম্বাইয়ের বাসা ভাঙতে হলো, মোহনদাস ফিরে গেলেন রাজকোটে এবং সেখানেই আদালতে আর্জি-লেখার কাজ ক'রে মাসে গড়ে তিনশত টাকা উপায় হতে থাকে।

অপমানের আঘাত

এই আর্জি-লেখা জীবনের অধ্যায় কতদিন চলতো কে জানে, কিন্তু একটি ঘটনার আঘাতে মোহনদাসের জীবন ও জীবিকার গতি আবর্তিত হয়ে অন্য দিকে চলে গেল। একটু বেশী দূরের দিকে, ভারতভূমি ছেড়ে একেবারে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

রাজকোটের পলিটিক্যাল এজেন্টের পদে যে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তখন ছিলেন, বিলাতে থাকতে মোহনদাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মোহনদাসের বড় ভাই, যিনি পোরবন্দরের রাণা সাহেবের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাণা সাহেবকে খারাপ পরামর্শ দিয়েছেন—এই অভিযোগ পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে পৌছেছিল। এজেন্ট সাহেবও সেজন্য মোহনদাসের বড় ভাইয়ের ওপর বিরূপ ছিলেন। এজেন্ট সাহেবের এইরূপ মনোভাব দূর ক'রে দেবার জন্য মোহনদাস যদি তাঁর কাছে গিয়ে দু'চার কথা বলে, বড় ভাই মোহনদাসকে এই অনুরোধ করলেন। একটা পরিচয় আছে বলেই এজেন্ট সাহেবের কাছে গিয়ে ভাইয়ের পক্ষে সুপারিশ করার প্রস্তাব মোহনদাসের পছন্দ হয়নি, তবু তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই করলেন। কিন্তু ফল হলো অন্যরকম।

বিলাতে থাকতে যাঁকে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল, এখানে মোহন-

দাস তাঁকেই দেখলেন এক গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ অফিসাররূপে। মোহনদাসের কথা শুনে সৌজন্যের সঙ্গে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, তিনি চাপরাশী ডাকলেন। চাপরাশী মোহনদাসকে হাত ধরে টেনে দরজা দিয়ে বের ক'রে দিল।

ক্রোধে এবং ক্ষোভে মোহনদাস উত্তেজিত হয়েছিলেন। এজেণ্ট সাহেবকে একটা চিঠিও দিলেন—মার্জনা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবেন মোহনদাস। এজেণ্ট সাহেব মার্জনা চাননি কিন্তু মোহনদাস নালিশ করলেন না। এজেণ্ট সাহেবকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, তা নয়। অপমান ভুলে গিয়েছিলেন, তাও নয়। নালিশ করলে কোন ফল হবে না, এই অপ্রিয় ও তিক্ততর বাস্তবতাটুকু স্মরণ ক'রেই তিনি নীরব রইলেন।

তবে আর আর্জি-লেখার জীবন চলতে পারে না। কারণ তাহলে এই পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের কোর্টেই যেতে হয়। উদ্ধতের প্রগল্ভ খোস-মেজাজের দ্বারে দাঁড়িয়ে জীবিকা অর্জন ক'রে জীবনের মর্যাদাকে আর অবনত করা যেতে পারে না।

আকস্মিকভাবে এক নতুন চাকরি পেলেন মোহনদাস। দাদা আবদুল্লা কোম্পানী নামে এক বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছয়-সাত লক্ষ টাকার একটা মামলা চলছিল তখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। মামলার কাজে সাহায্য করার জন্য ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধীকে ঐ কোম্পানী নিযুক্ত করলেন, এক বৎসরের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবার সমস্ত খরচ, যাতায়াতের ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া আর এক বৎসরের দক্ষিণা বাবদ একশত পাঁচ পাউণ্ড মোহনদাস পাবেন—কোম্পানীর সঙ্গে মোহনদাসের এই চুক্তি হলো।

আবার যাত্রা। এ যাত্রাও সত্যসন্ধানীর অভিযান নয়। ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শুধু জীবিকার সন্ধানে দেশান্তরে চলেছেন। কোথায় তাঁর কৈশোরের হরিশ্চন্দ্র, আর শ্যামল ভট্টের কবিতা। এসিয়ার আলোকের ছটা কোন্ কঠিন আবরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে? সারমন অন দি মাউণ্ট কি প্রতিধ্বনির মত দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে?

পদে পদে আঘাত

কৃষ্ণমহাদেশ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত, বনস্পতি ও স্বর্ণখনির উপনিবেশ। ইংরাজ বুয়র জুলু, আর ভারতীয় বণিক এবং গিরমিটিয়া মজুরের কর্মভূমি। এ রাজ্যের

বেশীর ভাগ মানুষ দেখতে কালো, কিন্তু রাজপ্রতাপটি শ্বেতকায়। দেশটি প্রবল বর্ণকৌলীন্যের আঘাতে জর্জরিত। কালা আর ধলা—মানুষের প্রাণ যেন এখানে দুটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে রয়েছে। ধলা বড় উদ্ধত, কালা বড় বিনীত ও নত। শ্বেতসমাজের মনোভাব ও শ্বেতরাজের আইন বর্ণের দম্ভে বড় বেশী কালো হয়ে আছে। কালোর অধিকার পদে পদে কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, খর্বিত।

গৌতম বুদ্ধের দেশের মানুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যারিস্টার। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেই কুলি-ব্যারিস্টার হয়ে গেলেন। তিনি কুলির দেশের মানুষ, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়ের দৃষ্টিতে এই তো তাঁর পরিচয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছেন জীবিকা অর্জন করতে, কিন্তু এখানেই পথ চলতে দেখা গেল, ইতিহাসের বিধাতা যেন নিজে থেকেই তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

ডারবানের আদালত। আবদুল্লা কোম্পানীর উকীলদের সঙ্গে মোহনদাস বসেছিলেন। শ্বেতকায় ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়লো মোহনদাসের মাথার পাগড়ীর ওপর। ব্যারিস্টার মোহনদাসকে ভারতীয়ের জাতীয় উষ্ণীষ ঐ পাগড়ী খুলে রাখবার নির্দেশ দিলেন। মোহনদাস এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন, আদালত ছেড়ে চলে গেলেন।

নাতালের রাজধানী মরিৎজবার্গ। শীতের রাত্রি। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার যাত্রী মোহনদাস প্রিটোরিয়া চলেছেন। এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রী এসে কৃষ্ণকায় ভারতীয় মোহনদাসকে দেখতে পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে শেষের কামরায় চলে যেতে বলেন। মোহনদাস অস্বীকার করলেন। শ্বেতকায় যাত্রীর অনুরোধে পুলিশ এসে মোহনদাসকে ধাক্কা মেরে ট্রেন থেকে নীচে নামিয়ে দিল।

চার্লস্ টাউন থেকে জোহানেসবার্গ যাবার পথ। যাত্রিবাহী ঘোড়ার সিগরাম চড়ে মোহনদাস চলেছেন। গাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ যাত্রী ছিল, সেই কারণে গোরা কণ্ডাক্টর কৃষ্ণকায় মোহনদাসকে কোচের ভেতরে বসতে না দিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সেই গোরা কণ্ডাক্টর খোলা হাওয়া উপভোগ করার জন্যে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে চাইলেন ও মোহনদাসকে পা-দানীর ওপর বসবার নির্দেশ দিলেন। এইবার আপত্তি করলেন মোহনদাস। গোরা কণ্ডাক্টর মোহনদাসকে গালি দিয়ে আর অবিশ্রান্ত চড় ঘুষি মেরে জর্জরিত করলো। আহত

লাঞ্ছিত মূক মোহনদাস, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। সিটি বাজিয়ে ঘোড়ার সিগরাম তখন উল্লাসে প্রিটোরিয়ার দিকে চলেছে।

ক্ষমার উন্মেষ

প্রিটোরিয়ার একটি প্রভাত। ফুটপাত ধরে হেঁটে হেঁটে মোহনদাস চলেছেন। হঠাৎ এক বুয়র পাহারাওয়ালা এসে লাথি মেরে মোহনদাসকে ফুটপাত থেকে পথে নামিয়ে দিল। প্রিটোরিয়ার আইন—কৃষ্ণকায় ভারতীয়কে ফুটপাত দিয়ে চলতে দেওয়া মানা।

সিগরামের গোরা কণ্ডাক্টরের বিরুদ্ধে মোহনদাস কোথাও নালিশ করেননি। প্রিটোরিয়ার পাহারাওয়ালার বিরুদ্ধেও কারও কাছে নালিশ করলেন না। বরং আন্তরিকভাবে পাহারাওয়ালাকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন।

মোহনদাসের চিত্তে ও আচরণে দুটি বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব ক্রমে ক্রমে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিত্তে প্রার্থনা ও আচরণে ক্ষমা। আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করার সংস্কার চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, আঘাতকারীর বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে শাস্তির দাবী করাও ঠিক প্রতিকারের পন্থা বলে তাঁর আর মনে হয় না।

মোহনদাসের বুঝতে দেরী হয়নি, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শুধু পথ চলতে গিয়ে পদে পদে তাঁকে যে লাঞ্ছনার আঘাত পেতে হলো, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অপমান নয়। সেটা তো তাঁরই স্বদেশ ভারতবর্ষের অপমান। বৈদেশিকের হাতে তাঁর স্বদেশ-আত্মার এই অবমাননা তখন তাঁর চিত্তের গভীরে হয়তো দেশমুক্তির সাধক এক বিদ্রোহীর সত্তাকে জাগ্রত ক'রে তুলেছে। স্বজাতি-প্রেম উদ্বোধিত হয়েছে। তবু তাঁর বিদ্রোহ ও জাতিপ্রেম, কোনটিই রূঢ় বিদ্বেষবাদের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে না। খৃস্টান শ্বেতাঙ্গ সমাজের ঔদ্ধত্যে তাঁর দেশবাসী শতভাবে লাঞ্ছিত, কিন্তু মোহনদাসের জাতিপ্রেম তাঁকে খৃস্ট বিদ্বেষে বা শ্বেতবর্ণ-বিদ্বেষে প্ররোচিত করতে পারেনি। বরং দেখা যায়, এই সময় তিনি খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে সন্ধিৎসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। গির্জায় যাচ্ছেন, খৃস্টীয় প্রার্থনার প্রথাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছেন এবং বহু শ্বেতাঙ্গ খৃস্টানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করছেন। বর্ণবিদ্বেষকে বর্ণবিদ্বেষ দিয়ে পরাভূত করা যায় না, ধর্মীয় গোঁড়ামীকে পাল্টা ধর্মীয় গোঁড়ামি দিয়ে জয় করা যায় না, উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের হিংস্রতাকে কৃষ্ণাঙ্গের পাল্টা হিংস্রতা দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে না। দক্ষিণ

আফ্রিকায় প্রথম নির্যাতিত গান্ধীর ক্ষমাপ্রবণ শান্তমূর্তির দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হবে যে, শ্যামল ভট্টের কবিতা এতদিনে যেন কায়া ধারণ করেছে।

হ্যাঁ, এক কর্মযোগীর চিত্ত ও কায়া তৈরী হয়ে উঠেছে, কিন্তু কর্মের আহ্বান কই? এখনো কোন আহ্বান আসেনি। তিনি শুধু জানেন, আবদুল্লা কোম্পানীর মামলায় সাহায্য করতে তিনি এসেছেন, জীবিকার কাজ হিসাবে। এ কাজ ফুরিয়ে গেলেই, দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনও ফুরিয়ে যাবে, আবার স্বদেশভূমি ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে দারাসুতপরিবার দিয়ে রচিত এক ক্ষুদ্র সংসারনীড়ের দায়িত্ব নিয়ে জীবন চলতে থাকবে।

আবদুল্লা কোম্পানীর চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এই নিষ্পত্তির মধ্যেও একটা অভিনবত্ব ছিল। বর্তমান আদালতের ধর্ম যে কি, তার প্রকৃত স্বরূপ মোহনদাসের নীতিপ্রধান চিন্তার বিচারে ধরা পড়তে দেরী হয়নি। আইনগুলিরও প্রকৃতি যে কি, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আইন আর আদালত, উভয়ই নিষ্পত্তির ধর্মে দীক্ষিত নয়। কিন্তু আইন ও আদালতের প্রকৃতি উল্টে দেবার ক্ষমতা তো মোহনদাসের ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর উকীলের ধর্মকে নিশ্চয় নতুন নীতিতে দীক্ষিত করতে পারেন। মোহন-দাসের উপলব্ধি হয়েছিল, প্রতিপক্ষকে পরাভূত করাই একমাত্র উকীলের কর্তব্যের পথ নয়। অন্য পথ আছে।

> "আমার মনে হলো, বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের ভেতর মিত্রতা ফিরিয়ে আনা, অর্থাৎ দুই আত্মীয়ের মিলন করিয়ে দেওয়াই আমার ধর্ম।"

আবদুল্লা কোম্পানীর মামলা সম্পর্কে অদ্ভুত ব্যারিস্টার মোহনদাস এই নীতি প্রয়োগ করলেন। সফল হলেন। বাদী বিবাদী উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষে মীমাংসা হয়ে গেল।

জনসেবার প্রথম আহ্বান

এইবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে ফিরে আসছেন। প্রিটোরিয়া থেকে ডারবান পৌঁছলেন জাহাজ ধরার জন্য। মোহনদাসকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য আবদুল্লা শেঠ এক সভা আহ্বান করেছিলেন। সেই সভায় হঠাৎ একটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির দিকে মোহনদাসের দৃষ্টি পড়লো। বিজ্ঞপ্তির শিরোনামা—'ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজ'। বিজ্ঞপ্তির মর্ম—নাতাল কাউন্সিলে সভ্য

মনোনয়ন করার যে অধিকার ভারতীয়দের ছিল, সেটা রদ করার দাবী। এই সম্পর্কে নাতাল কাউন্সিলে যে একটি বিলের আলোচনাও চলছে, সেকথা মোহনদাস পূর্বে জানতেন না, এখন জানতে পারলেন।

এ আইন পাস হলে নাতালবাসী ভারতীয় সমাজের সম্মান স্বার্থ আর অধিকার কি দশা লাভ করবে, মোহনদাস সেটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন। আবদুল্লা শেঠ এবং সভাস্থ আর সকলেও ঐ বিলের মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এরকম বৈষম্যের অন্যায় তো তাঁদের ওপর এখানে বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে, তাঁরা এতদিন শুধু বিনা প্রতিবাদে এই অবমানিত অদৃষ্টকে সহ্য ক'রেই এসেছেন।

আর দেশে যাওয়া হলো না। কারণ নাতাল-প্রবাসী ভারতীয় সমাজ মোহনদাসকে দেশে যেতে দিলেন না। ঐ বিলের প্রতিবাদ করার জন্য আন্দোলন করতে হবে, মোহনদাস সকলের অনুরোধে নাতালে রয়ে গেলেন। দুঃখী পতিত, সবার অধম, দীনের হতে দীন ও সবহারাদের মাঝে গান্ধী নামে যে মহাসেবকের জীবন ভবিষ্যতে প্রণামরূপে লীন হয়েছিল, তাঁর কাছে জনসেবার আহ্বান এই প্রথম। তাঁর জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলন এই প্রথম।

আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য মোহনদাস একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ বিলের প্রতিবাদে প্রত্যহ জনসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বহু ভারতীয়দের স্বাক্ষর-সম্বলিত আর্‌জি প্রচারিত হলো। নাতাল থেকে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ ক'রে ঔপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড রিপণের কাছে প্রেরিত হলো, সব হলো, কিন্তু নাতাল কাউন্সিলে বিলটি পাসও হয়ে গেল। তবে পরোক্ষে একটি পরম লাভও হলো।

> "এই প্রথম দুঃখের সম্মুখে উচ্চ-নীচ ছোট-বড় মনিব-চাকর, হিন্দু-মুসলমান, পারসী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সিন্ধী সকলে প্রভেদ ভুলে গিয়েছিলেন। সকলেই ভারতসন্তান ও সেবক, এই ভাব তাঁদের সবার মনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।"

ভারতীয় বিরোধী ঐ বিল পাস হলেও আন্দোলন বন্ধ হলো না। সংগ্রাম অঙ্কুরিত হয়েছে, তার শেষ কবে হবে কে জানে? ভারতীয় সমাজের ঐক্যবোধও জাগ্রত হয়েছে। মোহনদাস জনসেবার এই ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরতে পারলেন না। তা ছাড়া তাঁকে ধরে রাখবার জন্য ভারতীয় সমাজের সর্বসাধারণের আগ্রহও ছিল খুব বেশী। কিন্তু মোহনদাসের জীবিকার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে

ভারতীয় সমাজের কয়েকজন ব্যবসায়ীর আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে মোহনদাস নাতালে থেকে গেলেন। নাতাল সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায় করার জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। কিন্তু কালো ব্যারিস্টারকে এই সুযোগ দেবার বিরুদ্ধে গোরা ব্যারিস্টার সমাজ থেকে আপত্তি ওঠে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট কালো ব্যারিস্টারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন।

মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন জীবিকার জন্য ব্যারিস্টারী করতে, ঘটনাক্রমে জনসেবার ভার তাঁর ওপর এসে পড়েছিল। এখন দেখা যায়, পট পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে জনসেবা করার জন্যই মোহনদাস ব্যারিস্টারী আরম্ভ করলেন। এর পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনে ব্যারিস্টারী ব্যাপারটা গৌণ হয়েই রইল। জনসেবাই হলো সে জীবনের প্রধান বেদিকা। মোহনদাসের মধ্যে যে কর্মযোগী সেবক পুরুষ এতদিন ধরে আত্মজিজ্ঞাসা আত্মপরীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ভেতর দিয়ে তৈরী হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর কাছে এল কর্মের প্রত্যক্ষ আহ্বান। এখন আর জীবিকার প্রেরণা নয়, জীবনের প্রেরণা। এখন শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, পরকে নিয়ে কাজ করার পালা। ঘটনার আড়ালে তাঁর জন্যে এক সুবৃহৎ জননায়কতার আসন তৈরী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ অভ্যুদিত হিরোর মত মোহনদাস জনতার পুরোভাগে অধিপতিরূপে দেখা দেননি। কর্মভূমিতে সেবকরূপেই তাঁর আত্মপ্রকাশ।

জনসেবার কাজে তন্ময় হতে হবে, তার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করা গেল। ১৮৯৪ সালের মে মাস তখন, মোহনদাস নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপন করলেন। আন্দোলন পরিচালনার অস্থায়ী ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হলো।

দুঃখের শোণিতাক্ত মূর্তি

নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস, এর অধিকাংশ সভ্য ছিল কেরানী ও ব্যবসায়ী। কিন্তু নাতালপ্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে কেরানী ও ব্যবসায়ী ছাড়া আর-একটি ভারতীয় সমাজ ছিল—গিরমিটিয়া মজুর বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। গিরমিটিয়া মজুরের পক্ষে নাতাল কংগ্রেসে চাঁদা দিয়ে সভ্য হওয়ার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু এরাই তো ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী সমাজ। ক্রীতদাসের মত জীবন এই গিরমিটিয়া মজুরেরা ছিল মালিকের নিজস্ব সম্পত্তির মত। গিরমিটিয়ার পক্ষে

মালিকের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া একটা ফৌজদারী অপরাধ ছিল এবং এমন অপরাধ করলে তাকে জেল খাটতে হতো। ভারতের ক্ষুধার্ত ভূমিহীন কৃষক পাঁচ বৎসরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মালিকের খামারে খাটবার জন্য আসতো। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাদের কোন জীবিকার স্বাধীনতা ছিল না। চুক্তির মেয়াদ অর্থাৎ পাঁচ বৎসর শেষ হলে তবে সে মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অন্যত্র বসবাস করবার অধিকার পেত।

জনসেবক মোহনদাস। প্রবাসী ভারতীয়ের ভোটাধিকার নিয়ে শুধু আন্দোলন করবেন, এই কি তাঁর জনসেবার আদর্শ? এই ধরনের জনসেবায় তন্ময় হওয়ার প্রতীক্ষাতেই কি তিনি রয়েছেন?

একদিন সহসা এক দরিদ্রমূর্তি মাদ্রাজী মোহনদাসের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, শরীর কাঁপছে, মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, সামনের দুটি দাঁত কে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে। তার নাম বালাসুন্দরম্, সে একজন গিরমিটিয়া। শ্বেতাঙ্গ মনিব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হওয়ায় গিরমিটিয়া বালাসুন্দরম্‌কে মেরেছে, যার ফলে দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে।

এই কি গিরমিটিয়া! মানুষের দুঃখ ও অপমানের শোণিতাক্ত মূর্তি মোহনদাসের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ তো নিছক ভোগাধিকারে বঞ্চিত মানুষের মূর্তি নয়, এ যে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত নিগৃহীত মানবতার অশ্রু-অভিষিক্ত মূর্তি। বালাসুন্দরম্ যে জনতার প্রতিনিধি, সে জনতা কোথায়? সেই জনতার জগৎই যে জনসেবকের কর্মভূমি।

মোহনদাস প্রথমে গিরমিটিয়া বালাসুন্দরম্‌কে তার নিষ্ঠুর মনিবের দখল থেকে উদ্ধার ক'রে তার গিরমিট বা চুক্তি অন্য এক মনিবের কাছে বদলি করিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর কাছে গিরমিটিয়া সমাজের দুঃখের ভার লাঘব করার কাজই প্রধান হয়ে ওঠে। নাতাল কংগ্রেসের প্রয়াসও এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। ১৮৯৪ সালেই নাতাল গভর্নমেণ্টে গিরমিটিয়া ভারতীয়দের মাথা প্রতি একটা বাৎসরিক কর ধার্য করেন। মাথা প্রতি পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ তিনশো পঁচাত্তর টাকা। মোহনদাসের পরিচালনায় নাতাল কংগ্রেস এই করপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন। অবশেষে করের পরিমাণ হ্রাস হয়ে পঁচিশ পাউণ্ড থেকে তিন পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

এই সাফল্যকে ঠিক জয়লাভ বলা যায় না। অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ হলো না।

'তিন পাউণ্ড করের প্রথা গলিত ক্ষতের মত রয়ে গেল।' মোহনদাস উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর সংগ্রাম শীঘ্র ক্ষান্ত হবার সম্ভাবনা নেই, ক্ষান্ত করার প্রয়োজনও নেই। ভারতবাসীর মর্যাদাকে সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর দীর্ঘদিন থাকবার প্রয়োজন আছে।

ভগবানের রাজ্য তোমার হৃদয়ে

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন বৎসরের একটি অধ্যায় শেষ হলো। গান্ধী নামটির সঙ্গেও যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ, তেমনি ভারতের রাজনৈতিক সমাজও পরিচিত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজের অভিমতে যিনি অবাঞ্ছিত 'আগন্তুক' ও 'কুলি-ব্যারিস্টার'—প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তিনি 'বাঞ্ছিত জনসেবক' এবং গিরমিটিয়া সমাজে তিনি 'বন্ধু'।

এই কয়টি বৎসর বাইরের কর্মভূমিতে যে গান্ধীর সাধনা ও উদ্যোগ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, সে গান্ধীর মর্মভূমি কি নিতান্তই কলরবহীন হয়েছিল? না, তা নয়। সত্যসন্ধানীর মন তপস্বীর একাগ্রতা নিয়ে গ্রন্থ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিল। বাইবেল, পয়গম্বরের জীবনী, জরথুস্ত্র-বচন, উপনিষদ, ষড়দর্শন ও যোগবাশিষ্ঠ। অতীতের যত মনস্বীর সঙ্গে মনোলোকের গান্ধী যেন সঙ্গোপনে আত্মীয়তার সাধনা করেছেন। শুধু অতীতের নয়, আধুনিক এক মনস্বীর লেখা পড়ে গান্ধীর হৃদয় এক পরম আশ্বাসের পুলক অনুভব করেছিল। রুশীয় ঋষি টলস্টয়ের লেখা—'ভগবানের রাজ্য তোমারই হৃদয়ে' (Kingdom of God is within you)।

কিসের আশ্বাস? সত্য তোমারই অন্তরতম হয়ে রয়েছেন, প্রেমরূপে। সত্যসন্ধানী গান্ধীর পক্ষে আশ্বস্ত হবারই কথা। গান্ধীর উপলব্ধির উষালোক দেখা দিয়েছে, সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নেই।

কিন্তু এই উপলব্ধি সংসারপলাতক বিবাগীর উপলব্ধি নয়। সংসারের সহস্র বাস্তবতার মধ্যে তীর্থপথিকের মত নিষ্ঠা ও শুদ্ধতা নিয়ে চলবার শক্তি গান্ধী পেয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহেরও অভাব নেই। সেবক সংগ্রামী ও সংসারী গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে একবার ফিরে এলেন, দুটি উদ্দেশ্যে। সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন, তাই পরিবার নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর স্বার্থ, মর্যাদা ও অধিকারের সমস্যা সম্পর্কে ভারতবর্ষের জনমত জাগ্রত করার জন্য প্রচার।

ভারতবর্ষে এসে দুটি মাস তীর্থপথিকের মতই ঘুরে বেড়ালেন গান্ধী। তবে ধর্মতীর্থের পথিকরূপে নয়, রাজনৈতিক তীর্থের পথিক। স্যার ফিরোজ শা মেটা, বদরুদ্দীন তায়েবজী, রাণাডে, তিলক, গোখ্‌লে, সুরেন্দ্রনাথ, রাজা স্যার প্যারী-মোহন, মহারাজা টেগোর, পরমেশ্বরন্‌ পিল্লে ও ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্—বোম্বাই, পুনা, কলিকাতা ও মাদ্রাজ। ভারতবিখ্যাত পলিটিক্যাল নেতা ও পলিটিক্সের ভারত-বিখ্যাত পীঠস্থানগুলি—সবই দেখলেন গান্ধী। অনেক স্থানেই জনসভা হলো, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সমস্যা সম্পর্কে অনেক স্থানেই সাড়া পাওয়া গেল। নেতাদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ দিলেন, অনেকে আমলই দিলেন না। "স্যার ফিরোজ শা মেটাকে হিমালয়ের মত মনে হলো, লোকমান্য তিলককে সমুদ্রের মত, আর গোখ্‌লেকে গঙ্গার মত। হিমালয়ে চড়া যায় না, সমুদ্রে ডুববার ভয় আছে, কিন্তু গঙ্গার কোলে খেলা করা যায়।" ভারতবর্ষে প্রচারের কাজে ব্যস্ত আছেন, হঠাৎ ডারবান থেকে টেলিগ্রাম এল—'জানুয়ারীতে পার্লামেণ্টের বৈঠক বসবে। অবিলম্বে আসুন।'

দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্বান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তির আহ্বান নয়। ব্যারিস্টারী বা জীবিকার আহ্বান নয়। দূর সমুদ্রপারের এক ভূখণ্ডের তটোপকূল থেকে নিপীড়িত মানুষের প্রাণ আকুলভাবে এক সেবকের সান্নিধ্য আহ্বান করছে। গান্ধী সপরিবারে জাহাজযোগে রওনা হয়ে গেলেন। পথে ভয়ঙ্কর তুফান উঠেছিল, কিন্তু সে তুফান চব্বিশ-ঘণ্টার পর শান্ত হয়ে যায়। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে জাহাজ এসে ডারবান বন্দরে পৌছে নঙ্গর করে। এই জাহাজটির নাম 'কুরল্যাণ্ড'। বোম্বাই থেকে আর-একখানি জাহাজ এসে পৌছলো—নাম 'নাদেরী'। দুটি জাহাজে প্রায় আটশত ভারতীয় যাত্রী ছিল। বোম্বাইয়ে সে সময় প্লেগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। সেইজন্য সংক্রামক প্রতিষেধের ব্যবস্থা হিসাবে জাহাজ দুটিকে বন্দরেই কোয়ারাণ্টাইনে রাখা হলো। জাহাজের যাত্রীদের তখুনি নামতে দেওয়া হলো না।

কুরল্যাণ্ড ও নাদেরী যখন আটশত ভারতীয় যাত্রীকে কোলে নিয়ে ডারবান বন্দরে হলুদ নিশান উড়িয়ে ভাসছে, সে সময় আর-একটা তুফান চলছিল ডারবান শহরে। এ তুফান সমুদ্রঝড়ের চেয়ে বেশী হিংস্র ও প্রমত্ত। একটা পার্থক্য, সমুদ্রঝড়ে বীভৎসতা ছিল না, কিন্তু ডারবান শহরের এ তুফানে সেটা বেশীরকম ছিল।

সভ্যতার স্বরূপ

ডারবান শহরের শ্বেতাঙ্গ জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পথেঘাটে সভা ক'রে তারা প্রতিশোধের হুংকার ছাড়ছে। এসিয়াটিক গান্ধী ভারতবর্ষে গিয়ে নাতালের শ্বেতাঙ্গ সমাজের নামে অপবাদ প্রচার করেছে, সেই অপবাদ ইংলণ্ডের কাগজে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে—এই ছিল তাদের অভিযোগ আর আক্রোশের বিষয়। সুতরাং শুধু গান্ধী কেন, কোন এসিয়াটিক জীবকে তারা আর জাহাজ থেকে ডারবানে নামতে দেবে না।

জাহাজ দুটির যতদিন কোয়ারাণ্টাইনে থাকা উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী দিন পার হয়ে গেল। তবু যাত্রীদের নামবার অনুমতি দেওয়া হলো না। শ্বেতাঙ্গ সমাজের তরফ থেকে ঘন ঘন হুমকি আসছে—ফিরে যাও, নইলে জাহাজ ডুবিয়ে দেব।

জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে ফিরে গান্ধী সবাইকে শান্ত সাহসের সঙ্গে ধৈর্য ধরার আবেদন জানাতে লাগলেন। নাদেরীর যাত্রীদেরও ধৈর্য ও সাহসের বাণী জানালেন। সমস্ত ঘটনাগুলির ভেতর দিয়ে অদ্ভুত এক দ্বন্দ্বের নাটক যেন দ্রুত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। "একদিকে মুষ্টিমেয় গরীব ভারতবাসী ও তাঁদের জনকয়েক ইংরাজ বন্ধু, অপরদিকে ধনবল, বাহুবল, বিদ্যাবল ও সংখ্যাবলে বলীয়ান ইংরাজ সমাজ। এই বলীয়ান প্রতিপক্ষের সঙ্গে আবার নাতালের সরকারী কর্তৃপক্ষের বলও যুক্ত হয়েছিল। নাতাল সরকার প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ-সমাজকে সাহায্য করছিলেন।"

এরই মধ্যে দেখা দিল বড়দিন, মানবপুত্র যীশুর আবির্ভাব-দিবস। কুরল্যাণ্ডের কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ভোজ দিলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বলতে, গান্ধী ও তাঁর পরিবার। ভোজের পর বক্তৃতা দেওয়ার নিয়ম। গান্ধী সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। গান্ধীর মনে সে সময় যে চিন্তা চলছিল, অকপটভাবেই তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ করলেন।

গান্ধী বলছিলেন—পশ্চিমের সভ্যতা হিংসামূলক, আর পূর্ব দেশের সভ্যতা অহিংসামূলক......।

কাপ্তেন প্রশ্ন করলেন—শহরের শ্বেতাঙ্গ সমাজ মুখে যা করবে বলছে কাজেও যদি তাই করে, তবে আপনি কিভাবে আপনার অহিংসাকে কাজে লাগাবেন?

গান্ধী—আমার আশা আছে, তাঁদের ক্ষমা করতে এবং অন্যায়ের বদলে প্রতিশোধ না নিতে যে সাহস ও বুদ্ধির দরকার, ঈশ্বর আমাকে তা দেবেন।

কাপ্তেন হেসে চুপ ক'রে রইলেন। সে হাসিতে অবিশ্বাস মিশে ছিল। গান্ধীর কথা অবিশ্বাস্য!

যাই হোক, নির্বল আর বলীয়ানের এই দ্বন্দ্বের নাটকীয় গতি দ্রুততর হয়ে উঠছিল। জাহাজের যাত্রী ও গান্ধীর ওপরও চরম-পত্র পৌঁছে গেল—জাহাজ থেকে নামলে মেরে ফেলা হবে। উত্তরে গান্ধী জানিয়ে দিলেন—আমরা নামবো, আমাদের অধিকার অটুট রাখার জন্য আমরা কৃতসংকল্প।

নাতাল অ্যাডভারটাইজার নামক পত্রিকায় ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে একটি নোটিশ দেখা দিল :

"Wanted every man in Durban to attend a meeting on Monday Jan. 4, for purpose of arranging demonstration to proceed to Point and protest against landing of Asiatics."
—এসিয়াটিকেরা জাহাজ থেকে নামবে, এর বিরুদ্ধে পয়েণ্টে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার ব্যবস্থা করার জন্য সোমবার ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে এক সভায় ডারবানের প্রত্যেক লোক সমবেত হও।

সভায় প্রায় দু'হাজার শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত ছিল। বক্তৃতায় গান্ধীর উদ্দেশে প্রবল বিষোদ্‌গার করা হল। এসিয়াটিকেরা জাহাজ থেকে নামলে মারবার জন্য যারা প্রস্তুত, তাদের একটি নামের তালিকাও তৈরী হলো।

ডারবানের লিঞ্চ-লোলুপ শ্বেতাঙ্গ জনতার এই হিংস্র উত্তেজনার মধ্যে ১৩ই জানুয়ারী তারিখে জাহাজের যাত্রীরা নামবার অনুমতি পেল। জাহাজ থেকে নেমে গান্ধীজীর স্ত্রী ও ছেলেপিলেরা গাড়ী করে দু'মাইল দূরে রুস্তমজী শেঠের বাড়ী চলে যান। গান্ধীজী মিঃ লাটন নামে তাঁর পরিচিত ইংরাজ বন্ধুর সঙ্গে হেঁটে রওনা হলেন।

কিন্তু পথে দাঁড়ানো মাত্র শ্বেতাঙ্গ জনতা গান্ধীকে চিনে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠলো—গান্ধী! গান্ধী! গান্ধী! ঢিল ও পচা ডিম গান্ধীর ওপর বর্ষিত হতে লাগলো। একজন গান্ধীর পাগ্‌ড়ী তুলে ফেলে দিল। তারপর চললো কিল ঘুষি ও লাথি। প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে একটি বাড়ীর রেলিং আঁকড়ে ধরে গান্ধী শ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন।

পুলিশ এসে গান্ধীকে বাঁচাবার জন্য ঘিরে ধরলো এবং সেইভাবে পুলিশ-পরিবৃত হয়ে গান্ধী রুস্তমজীর বাড়ীতে পৌছলেন। মারমুখী শ্বেতাঙ্গ জনতা সেখানেও উপস্থিত হয়ে চীৎকার করলো—গান্ধীকে আমাদের কাছে দাও। পুলিশ সুপার এসে জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তাঁরই পরামর্শ অনুসারে গান্ধী ভারতীয় কনেস্টবলের রূপে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে দু'জন পুলিশের সঙ্গে এক গলি দিয়ে পালিয়ে থানায় চলে গেলেন। শ্বেতাঙ্গ জনতা রুস্তমজীর ঘরের ভেতরেও ঢুকে যখন গান্ধীকে পেল না, তখন তারা চলে গেল।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা ও আরম্ভ যেভাবে হয়েছিল, উপসংহার সেভাবে দেখা দিল না। অবশ্য গান্ধী তাঁর আক্রমণকারীদের ওপর তিলমাত্রও রোষ প্রকাশ করেননি। তাদের অনেককে চিনতে পারলেও তাদের বিরুদ্ধে কারও কাছে কোন নালিশ করেননি। কিন্তু নির্বল ও বলীয়ানের দ্বন্দ্ব, হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্ব—ঘটনার আরম্ভ ও আয়োজন যে সংকল্পের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল, ঘটনার উপসংহারে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান পাওয়া যায় না। বরং বলা যায়, উপসংহারে না পৌছে এই ঘটনার নাটক মাঝ অঙ্কের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল আকস্মিক যবনিকাপাতের মত।

জীবননাট্যের ভূমিকা

কিন্তু গান্ধীর জীবননাট্যের ভূমিকাটি এই ঘটনার পরীক্ষার ভেতর দিয়েই বোধহয় তৈরী হয়ে গেল। তারপর ঘটনার পর ঘটনা, অঙ্কের পর অঙ্ক, সে জীবননাট্যে কোথাও সাময়িক বিরাম বা ক্লান্তির যবনিকাপাত নেই। মহাসাগরের মত তার রূপ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত হয়ে গেছেন গান্ধী। সহস্র অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিঃশঙ্ক অভিযাত্রীর মত পরমের সন্ধানে তিনি নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলেছেন। কখনো সেবার প্রদীপরূপে আর্তের পর্ণকুটীরে আলোক বিস্তার ক'রে চলে যান। কখনো বা ঝঞ্ঝার আবাহন করেন সংগ্রামী রূপে। রিক্ত বিধ্বস্ত ও নিরাভরণের সংসারকে সংগঠন ক'রে চলে যান। প্রতি চিন্তায় ও নিঃশ্বাসে তাঁর আত্মপরীক্ষা ও আচরণশুদ্ধি চলতে থাকে। কখনো বা চলার পথে হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি দেখা দেয়, সে ভ্রান্তি তবু এই পথিকের গতি স্তব্ধ করতে পারে না। বহু মীমাংসা বহু প্রায়শ্চিত্ত ও বহু ব্রতের এক তত্ত্বার্থী তপস্বী ও কর্মযোগী কীর্তির পর কীর্তি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের

এক একটি সর্গের মত সে কীর্তি সুন্দর ও সুললিত। যে শক্তি ছিল না, সে শক্তি তিনি নিরন্তর প্রয়াসময় জীবনের পথে পথেই এক এক ক'রে অর্জন করছেন। যে সামর্থ্য অপূর্ণ ছিল, সে সামর্থ্য পূর্ণতর ক'রে তুলছেন। সেই পূতশক্তির স্পর্শে ভারতের দীর্ঘযুগস্তব্ধ এক একটি পাষাণের অহল্যা জাগ্রত হয়। হিংসায় উত্তপ্ত পৃথিবীতে তাঁর জীবন স্নিগ্ধ করুণার জাহ্নবীরূপে প্রবাহিত হয়ে গেছে। গান্ধীর জীবননাট্যে আকস্মিক চমৎকারিতার ঝলক্ নেই, অলৌকিক রহস্য নেই। এ জীবন শান্ত সাধনায় ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা এক মহান্ রূপান্তরের ইতিহাস। অতি সাধারণ কিভাবে অসাধারণে পরিণত হয়, গান্ধীর জীবন সেই ক্রমবিকশিত মহত্ত্বের কাহিনী। এ কাহিনী সত্য, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। তবু তার প্রতি অধ্যায় কী বিস্ময়ে সমাকীর্ণ। এবং এত বিস্ময়কর বলেই সে জীবনের ঘটনাবলীর রূপ মহানাট্যের মত।

লিঞ্চ-লোলুপ শ্বেতাঙ্গ জনতাকে গান্ধী ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন, নালিশও করলেন না, নাতালের শ্বেতাঙ্গ সমাজ সত্যিই বিস্মিত হয়। কিন্তু পরের দৃশ্য আরও বিস্ময়কর। ইংলণ্ড ও কলোনিবাসী সকল ইংরাজই বিস্মিত হয়ে সে দৃশ্যের বিবরণ শুনতে পেল।

ইংরাজে-বুয়রে যুদ্ধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধুরূপে গান্ধী স্বেচ্ছাসৈনিকের উর্দি পরিধান ক'রে রণক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর পরিচালনা করছেন। ডারবানের ইংরাজেরা যাকে লিঞ্চ করতে চেয়েছিল, সেই গান্ধী রণক্ষেত্র থেকে আহত জেনারেল উডগেট ও নিহত লেফ্‌টেনাণ্ট রবার্টসের দেহ বহন ক'রে দীর্ঘ তপ্তধূলি-সমাকীর্ণ পথ ধরে হেঁটে হেঁটে শিবির হাসপাতালের দিকে চলেছেন।

আবার ভারতপথিক

তখন ১৯০০ সাল, একটি শতাব্দী পূর্ণ হয়েছে। বুয়র যুদ্ধও শেষ হলো। নতুন শতাব্দীর আরম্ভে গান্ধীর একবার মনে হয়েছিল, যে লক্ষ্য নিয়ে তাঁর জীবন হয়েছে, সেদিক থেকে বেশী উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র হলো ভারতবর্ষ, তাঁর স্বদেশভূমি। তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলাণ্টিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। সে সময়ের কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতাদের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার দ্বিতীয় সুযোগও এই সময় হয়। এই অধিবেশনে দক্ষিণ-

আফ্রিকায় ভারতীয়ের অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর রচিত একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। নেতাদের সঙ্গে, আরও অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাতদের সঙ্গে গান্ধী সাক্ষাৎ করেন—আবার ফিরোজ শা মেটা, গোখ্‌লে, লোকমান্য তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ। তাছাড়া, অ্যানি বেসাণ্ট, দিন্‌শা ওয়াচা, মতিলাল ঘোষ, চিমনলাল সেতলবাড়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জ্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী ও ভগ্নী নিবেদিতা। বর্মার স্বর্ণ প্যাগোডা ও কালীঘাটের মন্দির দেখলেন গান্ধী। ঝকঝকে রঙীন জেব্বা পায়জামা, ঝালর-লাগানো পাগ্‌ড়ী ও অলংকারে সজ্জিত রাজা মহারাজার রূপ দেখবারও সুযোগ হলো। কিন্তু শুধু এই কি গান্ধীর ভারতবর্ষ?

গোখ্‌লের আতিথ্য থেকে বিদায় নিয়ে একদিন গান্ধী বের হয়ে পড়লেন। সঙ্গে একটি কম্বল, একটি লোটা ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তার মধ্যে কয়েকটি জামা ও ধুতি। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে গান্ধী চললেন সত্যিকারের ভারতবর্ষের রূপ দেখতে। এর আগে প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতবর্ষের রূপ তিনি কিছুটা দেখেছেন, এবার ভারতবর্ষের থার্ড ক্লাসের রূপ দেখলেন, স্বয়ং থার্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে। পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর ও পালনপুর সর্বত্র ধর্মশালাতেই উঠলেন। দেখলেন গান্ধী, ভারবর্ষের প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে বড় বেশী পার্থক্য। অভিশপ্ত তৃতীয় শ্রেণী—দুর্গন্ধ, আবর্জনা ও অস্বাস্থ্য তার নিত্য সহচর। তাছাড়া, একটা তৃতীয় শ্রেণীর মনও যেন দেশের রুচি কলুষিত ক'রে রেখেছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই পচা ফুলের দুর্গন্ধ, সুন্দর শ্বেত মর্মরের মেঝেতে গর্ত করে টাকা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানবাপীর নিকটেই আবর্জনা, দক্ষিণার পয়সা কম হলেই পূজারী গালাগালি দেয়।

স্বদেশভূমি ভারতবর্ষকে কিছুটা দেখা হলো। এই দেখার আরম্ভ, গান্ধীর বাকী জীবনের সবই তো তাঁর দেশের মাটি আর মানুষকে দেখবার ইতিহাস। এখন এই দেশেরই মাটি আর মানুষের সেবায় তাঁকে এখানে একটা ঠাঁই নিয়ে থাকতে হবে। গান্ধীর পরম শ্রদ্ধাস্পদ গোখ্‌লের ইচ্ছা ছিল, গান্ধী যেন বোম্বাইয়ে ব্যারিস্টারী করেন এবং জনসেবার জন্য কংগ্রেসের কাজ করেন। গান্ধীর ইচ্ছা ছিল তাই। আইন-ব্যবসায়ের জন্য গান্ধী বোম্বাইয়ে অফিস খুললেন। কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টেলিগ্রাম এল, চলে আসুন।

'অবাঞ্ছিত আগন্তুক'

আবার দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্বান। সেখানে এসিয়াটিক বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ গবর্নমেণ্ট খুলেছেন। ট্রান্সভালে যেন বাইরে থেকে কোন নতুন এসিয়াবাসী প্রবেশ না করে, তার জন্যে এই নতুন ব্যবস্থা। শুধু যারা আগে সেখানে বসবাস করছিল, সেইসব এসিয়াবাসী ট্রান্সভালে নতুন করে পাস বা অনুমতি-পত্র নিয়ে ঢুকতে পারবে, এই ছিল নতুন নিয়ম। কিন্তু নবাগত হোক্ বা পুরনো বাসিন্দা হোক্, এসিয়াবাসী অর্থাৎ মুখ্যত: ভারতবাসী মাত্রকেই পাস না দিয়ে প্রবেশ বন্ধ করাই ছিল এই বিভাগের আসল কাজ। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এলেন। ডারবানের পুলিশ সুপারের চেষ্টায় এসিয়াটিক বিভাগের অফিস থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করবার পাস পেয়ে গেলেন। গান্ধীর পূর্ব-পরিচিত এই পুলিশ সুপার একথা জানতেন যে গান্ধী পূর্বে একবার ট্রান্সভালে ছিলেন।

কিন্তু ট্রান্সভালে ঢুকতেই এসিয়াটিক বিভাগের কর্তাসাহেবের কাছে গান্ধীর তলব হলো।

সাহেবের প্রশ্ন—আপনি এখানে কোন্ কাজে এসেছেন ?

গান্ধী—আমার ভাইয়েরা আমাকে ডেকেছেন বলে পরামর্শ দিতে এসেছি।

সাহেব—কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আপনার এখানে আসার কোন অধিকার নেই ?

গান্ধী—আমি পাস নিয়ে তবে প্রবেশ করেছি।

সাহেব—আপনি যে পাস পেয়েছেন সেটা ভুল ক'রে আপনাকে দেওয়া হয়েছে।...আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, যান।

কর্তাসাহেবের সান্নিধ্য ছেড়ে চলে এলেও গান্ধী ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যাননি। বরং তাঁর পক্ষে ট্রান্সভালেই থাকার বেশী প্রয়োজন আছে, এ ঘটনা থেকেই তিনি সেটা বেশী ক'রে অনুভব করলেন। ১৯০৩ সাল, সুপ্রীম কোর্টে এটর্নিরূপে নাম তালিকাভুক্ত ক'রে ট্রান্সভালেই রইলেন। ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপন করলেন।

এসিয়ার মহাকরুণার স্পর্শ

ট্রান্সভাল, ভারতীয়ের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগ ও প্রচার তো চলছেই, কিন্তু আর-এক দিকেও অন্বেষণ চলেছে গান্ধীর, নিজের অন্তরের দিকে।

পাতঞ্জলের যোগসূত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, গীতা—গভীর তত্ত্বের সমুদ্রে তাঁর চেতনা ডুব দিয়ে সত্যের মুক্তা সন্ধান ক'রে ফিরছে। তাত্ত্বিকতা নয়, তিনি উপলব্ধ তত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করছিলেন। উপলব্ধি করলেন 'অপরিগ্রহ'—নিজের জন্য বিত্ত সঞ্চয় ক'রে রাখা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর জীবন-বীমা খারিজ ক'রে দিলেন। সমগ্র সঞ্চয় জনসেবার কাজে উৎসর্গ ক'রে দিলেন। এরই মধ্যে একদিন ডারবানের পথে ট্রেনে যেতে পড়লেন *একটি লেখা*—রাস্কিনের 'আনটু দি লাস্ট' (Unto the Last)। রাস্কিন কথিত সর্বহিতের আদর্শ ও নীতিময় জীবনের ব্যাখ্যা গান্ধীর চিন্তায় অবশ্য বেশী নতুন বলে মনে হয়নি। কিন্তু রাস্কিনের যে কথাটি গান্ধীর চিন্তায় প্রবল একটা সাড়া সৃষ্টি করলো, সেটা হলো কায়িক শ্রমের মর্যাদার কথা। কায়িক শ্রম যে জীবনের একটি নীতি, দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়, রাস্কিনের লেখা পুস্তকের 'যাদুমন্ত্র' গান্ধীকে এত বেশী অনুপ্রাণিত করে যে তারপর দিনই তিনি এই তত্ত্বকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করলেন। ডার্বান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিনিক্স নামে এক জায়গায় তাঁর অনুগামী ভারতীয় এবং কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্মীকে নিয়ে এক 'শ্রমের আশ্রম' স্থাপন করলেন। ফিনিক্স উপনিবেশে সকল কর্মী কৃষিকাজ ক'রেই জীবিকা অর্জন আরম্ভ করলেন। এই বৎসরেই কিছুদিন আগে গান্ধী 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন এবার থেকে ফিনিক্স আশ্রম থেকে বের হতে থাকে।

১৯০৪ সালের গান্ধী, ব্যারিস্টার এটর্নী ও সাংবাদিক হয়েও তিনি কৃষক হয়ে গেছেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে এক কর্মিমণ্ডলও তৈরী হয়ে উঠেছে। অন্তরে ঈশ্বরানুভূতির ঐশ্বর্য যত প্রকট হয়ে উঠছে, তাঁর বাইরের রূপ তত বেশী দীন থেকে দীনতর হয়ে চলেছে।

এই মানুষটিকেই দু'বৎসর পরে দেখা গেল আর-এক রূপে, দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুভূমির সুগম্ভীর শৈলপ্রান্তরে জীবনব্রতের আর-একটি নীতিকে তাঁর চিন্তার নিভৃতে উপলব্ধি ক'রে ফেলেছেন। নীতির নাম—ব্রহ্মচর্য। কিন্তু জুলুভূমিতে কেন? তিনি কি এখানে ধ্যান করার জন্য নির্জন আশ্রয় খুঁজতে এসেছিলেন? না, তাঁর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত গিরিমালার প্রতি উপত্যকায় ও আরণ্য অভ্যন্তরে তখন এক নরহত্যার শোণিতোৎসব চলছিল। জুলুবিদ্রোহ। আফ্রিকার ভূমিজ সন্তান কৃষ্ণকায় জুলুরা খাজনা বন্ধ করেছিল এবং সেই অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার

শ্বেত-গবর্নমেণ্ট জুলুসমাজকে অস্ত্রাঘাতে রক্তাপ্লুত ক'রে তুলছিলেন। এখানে গান্ধী এসেছেন আবার অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী নিয়ে শুশ্রূষার দূতরূপে। আহত জুলুকে সেবা করতে কোন শ্বেতকায় চিকিৎসক বা নার্স ইচ্ছুক ছিল না, গান্ধীই তাদের সেবা করলেন। আফ্রিকার আর্ত আদি সন্তানের কালো দেহে এসিয়ার মহাকরুণার স্পর্শ লাগলো সেদিন—বোধহয় এই প্রথম।

দশ আঙ্গুলের ছাপ

যে শ্বেতবর্ণের দম্ভে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক ও ইংরাজ-বুয়র সমাজের মন কালো হয়েছিল, তার কালিমা আরও গভীর হয়ে অবশেষে দেখা দিল কালা-আইনের রূপে। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে ট্রান্সভাল গবর্নমেণ্ট এই আইনের খসড়া প্রকাশ করেন। ট্রান্সভালের বাসিন্দা সকল 'এসিয়াটিক' মানুষকে একেবারে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইন। এই আইনের মর্ম হলো:

ট্রান্সভালের প্রত্যেক ভারতীয় পুরুষ, স্ত্রী ও আট বছরের ওপর বয়সের ছেলেমেয়েকে এসিয়াটিক বিভাগ অফিসে গিয়ে নাম রেজেস্ট্রী ক'রে পাস নিতে হবে। পুরনো পাস ফেরত দিতে হবে। পাসের দরখাস্ত পরীক্ষা করার সময় বিভাগের কর্মচারীরা দরখাস্তকারীর শরীরে বিশেষ চিহ্ন যা আছে, সেসব দেখে নিয়ে তারপর লিখে রাখবে। দরখাস্তকারীর সব আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইভাবে যে ভারতীয় নাম রেজেস্ট্রী করাবে না, তার এখানে থাকবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এর জন্য জেল হতে পারে, জরিমানা হতে পারে অথবা ট্রান্সভালের সীমার বাইরে তাড়িয়ে দেওয়াও হতে পারে। পুলিশ যখনই ইচ্ছা তখনই প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে পাস দেখতে চাইলে পাস দেখাতে হবে, পাস না দেখালে শাস্তি হবে। পাস দেখবার জন্য কর্মচারীরা ঘরের ভেতর ঢুকতে পারবে। আদালতে ও সরকারী অফিসে কোন ভারতীয় কোন ব্যাপারে যদি যায় তবে কর্মচারীরা তাদের পাস দেখতে চাইতে পারে।

ক্রীতদাসের জীবনেও কি এর চেয়ে কম মর্যাদা বা কম অধিকার ছিল ব'লে কেউ শুনেছে? কিন্তু শ্বেত-সভ্য গবর্নমেণ্ট সমগ্র ভারতীয় সমাজকে ক্রীতদাসের অধম পরিণত করবার উদ্যোগ করছেন। ট্রান্সভাল গবর্নমেণ্টের ধন-জন-অস্ত্রের শক্তি আছে, তবু সে কি এতই শক্তিমান? প্রশ্ন করলেন শুদ্ধ সেবক গান্ধী। এ শক্তিকে কি প্রতিরোধ করা যায় না?

ইহুদী নাট্যশালা ও নিগ্রো ওয়ার্ড

জোহানেসবার্গের এক ইহুদী নাট্যশালার অভ্যন্তরে এক নতুন দৃশ্য দেখা যায়। গান্ধীর আহ্বানে তিন হাজার ভারতীয় সমবেত হয়ে সংকল্প গ্রহণ করছে—প্রতিরোধ করতে হবে। এই সভাতেই তিন হাজার ভারতবাসীর প্রতিজ্ঞাকে গান্ধী যে শক্তির দীক্ষা দিলেন, তারই ফলে আবির্ভূত হলো সংগ্রামের এক অভিনব অস্ত্র, সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধ। প্রতিরোধ, কিন্তু প্রত্যাঘাত দিয়ে নয়। সংঘর্ষ, কিন্তু বৈরিতা নয়। এ সংগ্রাম প্রাণহরণ করার উদ্যোগ নয়, মৃত্যুবরণ করার উদ্যোগ। সত্যাগ্রহে কৌশল আছে, কিন্তু কূটতা নেই। সত্যাগ্রহে আপোষের রীতি আছে, কিন্তু আত্মসমর্পণের রীতি নেই। আবেগ আছে, উন্মাদনা নেই। প্রতিজ্ঞা আছে, আক্রোশ নেই। বিরাম আছে, কিন্তু পিছিয়ে-আসা নেই। দৈহিক বল সংখ্যাবল অস্ত্রবল ও ধনবলের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের সংগ্রাম—সত্যাগ্রহ তার নাম।

সত্যাগ্রহের সংকল্প করলেন গান্ধী, এবং প্রস্তুতও হলেন। কিন্তু তার আগে সত্যাগ্রহীর ধর্ম হিসাবেই মীমাংসার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে ট্রান্সভালের ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গিয়ে উপনিবেশ সেক্রেটারীর কাছে ভারতীয় সমাজের বক্তব্য উপস্থিত করলেন। দাদাভাই নওরোজী গান্ধীকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। কমন্স সভায় একশত জন সদস্যের সম্মুখে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর দশা সম্বন্ধে গান্ধী একটি বর্ণনা দিলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। গান্ধী ফিরে এলেন ট্রান্সভালে। এরই মধ্যে 'কালা-কানুন' সম্পর্কে ট্রান্সভাল গবর্নমেন্টের মনোভাব পরিবর্তনের কোন আভাস দূরে থাকুক, বরং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আর-এক দফা উদ্যোগ আরম্ভ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল স্মাট্‌স্ ট্রান্সভালের আইনসভায় 'বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ বিল' নামে একটি নতুন বিল পাস করিয়ে নিলেন।

আরম্ভ হলো সংগ্রাম। ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী, কেরানী ও গিরমিটিয়া, আর চীনা—প্রতিরোধের সংকল্পে সবাই ঐক্যবদ্ধ। গণ-আন্দোলনের রূপে পৃথিবীর প্রথম সত্যাগ্রহকে গান্ধী পরিচালনা করলেন। তিনিই এ সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, প্রথম নায়কতাও করলেন তিনি। সত্যাগ্রহীর দল রেজেস্ট্রী অফিসগুলির সম্মুখে পিকেটিং আরম্ভ করলো। কালা-আইনের নির্দেশ কেউ মান্য করে না। রেজেস্ট্রী অফিসে কোন ভারতীয় পাস নেবার জন্য

দরখাস্ত দিতে আসে না। পাস নেবার শেষ তারিখটিও শেষ হয়ে গেল। দেখা গেল মোট তের হাজার ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচশত জন পাস নিয়েছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ এল গান্ধীর ওপর। নির্দেশ অমান্য করলেন গান্ধী এবং তার পরিণাম ?

পৃথিবীর প্রথম সত্যাগ্রহীকে দেখা গেল, ক'দিন পরে বসে আছেন, জোহানেস-বার্গ কারাগারে 'নিগ্রো ওয়ার্ডের' এক কোণে, কয়েদীর পোশাক পরে। বিচারে তাঁর ওপর দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

একে একে আরও সত্যাগ্রহী এসে জেল ভরে ফেলতে থাকে, কিন্তু জেনারেল স্মাট্স্ গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি ক'রে ফেললেন। জেনারেলের প্রস্তাব ছিল—আগে ভারতীয়েরা সবাই রেজেস্ট্রী অফিস থেকে পাস গ্রহণ ক'রে রাষ্ট্রের নিয়ম রক্ষা করুক। তারপর ঐ কালা-কানুন রদ ক'রে দেওয়া হবে। গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন, সত্যাগ্রহ স্থগিত রইল, সত্যাগ্রহীরা সকলেই জেল থেকে ছাড়া পেল।

অলিভের মিষ্টি গলার গান

গান্ধী-স্মাট্স্ চুক্তির মাত্র দশটি দিন পরে, রেভারেণ্ড ডোক নামে জোহানেস-বার্গের এক ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজকের ঘরে গানের সুর শোনা যায়, কচি গলায় মিষ্টি সুরের ঝঙ্কার !

"Lead kindly light amid the encircling gloom
Lead thou me on ; "

রেভারেণ্ড ডোকের ছোট্ট মেয়ে অলিভ ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এই গান গাইছিল। আর ঘরের মধ্যে খাটের ওপর শায়িত এক আহত মানুষ চোখ বন্ধ ক'রে অন্তরের সকল আগ্রহ দিয়ে শুনছিল এই গান। আহতের ওষ্ঠের ওপর আঘাতের চিহ্ন, পাঁজরার ওপর ব্যাণ্ডেজ। এই আহত ব্যক্তি আর কেউ নয়, প্রথম সত্যাগ্রহী গান্ধী।

স্মাট্সের কথায় বিশ্বাস ক'রে চুক্তি করাতে জোহানেসবার্গের কয়েকজন পাঠান গান্ধীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। গান্ধী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই তাদের ধারণা। নইলে সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে গান্ধী আবার সবাইকে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ঐ ঘৃণ্য পাস আনবার জন্য বলে কেন? গান্ধীর ওপর তাদের সন্দেহ হয়, সন্দেহ থেকে আক্রোশ এবং আক্রোশ থেকে আক্রমণ।

সেদিন গান্ধী তাঁর অফিস থেকে মাত্র রওনা হয়েছেন রেজেস্ট্রী অফিসের দিকে। পথে নামতেই মীর আলম নামে তাঁরই পরিচিত পাঠান মক্কেলের লাঠির আঘাত পড়লো তাঁর মাথার ওপর। হে রাম! দুটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ ক'রে গান্ধী চেতনা হারিয়ে পথের ওপর পড়ে গেলেন।

কিন্তু এই ঘটনায় সত্যাগ্রহীর চেতনা হারিয়ে যায়নি, কারণ সে চেতনা এতদিনে রামাশ্রিত হয়েছে। তাঁর মনের খনিতে সব লোহার কণিকা বুঝি পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেছে। সে পরশমণি হলো প্রেম, রামনাম যার ধ্বনিত রূপ। উদ্ভাসিত প্রেমের জ্যোতি সকল সংশয়ের তিমির অপসৃত ক'রে বিশ্বাসময় জীবনের পথটি দেখিয়ে দিচ্ছে। মীর আলমকে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়, পুলিশ কর্তৃপক্ষকে গান্ধী এই অনুরোধ জানালেন। জোহানেসবার্গের পথের যে ধূলি সেদিন প্রথম সত্যাগ্রহীর রক্তে রঙীন হয়ে উঠলো, সে ধূলিকে তিনি তাঁর জীবনের আর-একটি সুমহৎ ভরসার বেদিকারূপেই মনে করলেন। প্রার্থনা করলেন গান্ধী—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সত্য পথে রাখুন। আর আমার এই রক্তপাতে হিন্দু-মুসলমান যেন সৌহার্দ্যে যুক্ত হয়।"

চারিদিক থেকে আঁধার ঘিরে ধরেছে, তার মধ্যে তুমি প্রেমজ্যোতিরূপে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—অলিভের এই গানের সবটাই সত্য হয়ে উঠলো। কয়েক মাস পরেই গান্ধীকে আবার আঁধার ঘিরে ধরলো এবং গান্ধীও আবার সত্যাগ্রহ করলেন। কারণ জেনারেল স্মাট্‌স্ তাঁর প্রতিশ্রুতি মত কালা-কানুন রদ করলেন না।

নতুন আগুনের শিখা

জোহানেসবার্গের হামিদিয়া মসজিদের সম্মুখ অঙ্গনে এক নতুন আগুনের শিখা দেখা গেল। দশ আঙুলের ছাপ-লাগানো দুহাজার পাসের চিতাবহ্নি, ভারতীয়ের জাতীয় অপমান যেন ভস্মীভূত হচ্ছে। কালা-কানুন অমান্য ক'রে শত শত ভারতীয় সত্যাগ্রহী গেল কারাগারে। আর গান্ধী? সম্মুখে প্রহরী পেছনে প্রহরী, সত্যাগ্রহী গান্ধী কয়েদীর বেশে একটি পুঁটুলি হাতে নিয়ে প্রিতোরিয়ার পথ ধরে হেঁটে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন জেল ফটকে, তারপর ভিতরে। খুনী-স্বভাবের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট এক নির্জন কুঠুরির মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন গান্ধী।

কিন্তু ঘটনার প্রবাহ নির্জন কুঠুরির বন্দিত্ব স্বীকার করে না, ইতিহাসের হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দেবার উপায় পৃথিবীর কোন দণ্ডধর শাসক আবিষ্কার করতে

পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকের মাথা তিন পাউণ্ড ট্যাক্স দিয়ে বাঁধা, সকল ভারতীয়ের মনুষ্যত্ব কালা-কানুনে শৃঙ্খলিত—এই শৃঙ্খল চূর্ণ করার জন্যই শৃঙ্খল বরণের আগ্রহ হাজার হাজার ভারতীয়কে সত্যাগ্রহী ক'রে তুলেছে। দু'মাস পরে গান্ধী মুক্ত হলেও এ সত্যাগ্রহ থামে না। তিনিও সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করেন না।

এর মধ্যে শোনা গেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় চারটি কলোনি এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ সমাজ ও বুয়র সমাজ, উভয়েই এই ইউনিয়ন গঠনের সমর্থক। জেনারেল স্মাট্‌স্ ও জেনারেল বোথা উভয়েই এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ডেপুটেশন নিয়ে চলে গেলেন ইংলণ্ডে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের দরবারে।

প্রবাসী ভারতীয় সমাজের চক্ষে এই ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা একটা আশঙ্কারূপে দেখা দিল। যারা ভারতীয়ের কাছে মাথা-ট্যাক্স আদায় করে, যারা কালা-কানুন দিয়ে ভারতীয় সমাজকে অতিষ্ঠ করে, যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়াবাসীর আগমন নিরোধ করে, এ তো সেই বর্ণবিদ্বেষবাদের ইউনিয়ন। ইউনিয়ন হলে ভারতীয় সমাজের অবস্থাকে আরও অবনত করে ছাড়বে। গান্ধীও চললেন ইংলণ্ডে ভারতীয়পক্ষের ডেপুটেশন নিয়ে।

প্রিটোরিয়া জেলের বদ্ধ কুঠুরি, আর তার ক'দিন পরেই মুক্ত সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের কেবিন। গান্ধী ইংলণ্ডে গেলেন আর ফিরে এলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে তখন এ গান্ধীকে ঠিক চেনবার মত শক্তি ছিল না। সাধারণ ব্রিটিশ জনতার পক্ষেও তখন সত্যাগ্রহী গান্ধীকে বুঝবার মত আগ্রহ ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন ইণ্ডিয়ান এজিটেটর কতকগুলি প্রিভিলেজ আদায়ের জন্য এসেছিল আর চলে গেল—এর বেশী কোন তাৎপর্য গান্ধীর আচরণের মধ্যে আবিষ্কার করার মত দৃষ্টি তাঁদের ছিল না।

গান্ধী গিয়েছিলেন একটা দাবী নিয়ে, ফিরে এলেন শূন্য হাতে, ব্যর্থ হয়ে। কিন্তু এই যাওয়া-আসার ব্যর্থতার মধ্যে গান্ধীত্বের কিছুই ব্যর্থ হলো না। কারণ ঐ দাবীটিই গান্ধীস্বরূপের পরিচয় নয়। স্বয়ং গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবীর চেয়ে তখন অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছেন, মহাযোগীকে যেমন তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করতে হয়, দাবীর রূপ ও পরিমাণ দিয়ে যেমন তাঁর বিরাটত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

অন্তরের স্বরাজ

বাইরের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্যে সেদিনের গান্ধীর সত্যাগ্রহ যেরূপে যতখানি অগ্রসর হয়েছে দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী গভীরে সে সত্যাগ্রহ তখন প্রসারিত হয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। স্মাট্‌সের কালা-কানুনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তার চেয়ে তাঁর আত্মজয়ের সংগ্রামের ইতিহাস অনেক তীব্র —কঠিন দুরূহ ও পরীক্ষাবহুল। তাঁর সত্যাগ্রহের ইতিহাস পাশাপাশি দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। একটি জনতার জন্য জনতাকে নিয়ে জনহিতবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে। আর-একটি তাঁর অন্তরের একান্তে নিজেকে নিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে—সকল রিপু ও সম্মোহের বিরুদ্ধে। জনতাকে নিয়ে তাঁর সত্যাগ্রহ অভিযান মাত্র দু'টি বছর আগে আরম্ভ হয়েছে এবং তখনো চলেছে। কিন্তু অন্তরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল বহুদিন আগেই, সেই নিরন্তর পরীক্ষা ও প্রয়াসের একটা অধ্যায় এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। গান্ধী এখন ব্রতী, তাঁর উপলব্ধিগত নীতিকে ব্রতরূপে তিনি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ—আহার শুদ্ধ হলে সত্তা শুদ্ধ হয়, গান্ধী তাঁর জীবনে এই সাত্ত্বিক আহারের আদর্শ সফল করলেন। শুধু নিরামিষাহার নয়, আহারে 'অস্বাদ' নীতিকেও তিনি গ্রহণ করলেন। জিহ্বাকে স্বাদুতা দিয়ে সেবা করার জন্য আহার নয়, বেঁচে থাকার জন্য আহার। উপবাসের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করলেন, শুধু স্বাস্থ্য-নীতির জন্য নয়। উপবাসে দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ হয়, ইন্দ্রিয়-বিকার মন্দীভূত হয়। গান্ধী উপবাসকে অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন। জীবনে প্রার্থনার মাধুর্য তিনি উপলব্ধি করলেন, কারণ ঈশ্বরনির্ভরতা এখন পরিপূর্ণভাবে তাঁর অন্তরে এসে গেছে। জোহানেসবার্গের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তিনি প্লেগ-পীড়িত মানুষকে সেবা করলেন। কুষ্ঠরোগী এল তাঁর বাড়ীতে, তিনি তার ঘা ধুয়ে ওষুধ দিয়ে সেবা করলেন। তিনি সম্পদসঞ্চয় ছেড়ে দিয়েছেন। সর্ব ধর্মে সমভাব তাঁর এসে গেছে। অস্পৃশ্য পারিয়া অতিথি রয়েছে তাঁর বাড়ীতে, তিনি অতিথির প্রস্রাবের পাত্র নিজ হাতে পরিষ্কার করলেন। কায়িক শ্রম তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে উঠেছে, তিনি ফিনিক্সের চাষী। স্ত্রী তাঁর কাছে এখনও প্রিয় শিষ্যা সচিব সখী ও গৃহিণী, কিন্তু এ দাম্পত্য আসক্তির সম্পর্কে বাঁধা নয়। গান্ধী এখন ব্রহ্মচারী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গান্ধী পূর্ণ স্বাবলম্বন গ্রহণ করেছেন, তিনি নিজেই নিজের ধোপা, নিজেই নিজের নাপিত। ব্যারিস্টারী ক'রে বিত্ত অর্জন

করার প্রয়াস ছেড়ে দিলেন। তাঁর চিত্তে ক্ষমা ও কর্মে অহিংসা। সংযম ও অনাসক্তি তাঁর দেহে মনে ও বচনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রবল বর্ণবিদ্বেষের দেশে তাঁর চিত্তে কোন বর্ণত্বের ছোপ লাগে না। বরং জুলুর মূর্তিতে তিনি অভিনব সৌন্দর্য দেখতে পান। শ্বেত গভর্নমেণ্ট তাঁকে আঘাত করেছে কিন্তু কত শ্বেতকায়কে তিনি একেবারে কাছে টেনে এনে আত্মীয় ক'রে ফেললেন। গান্ধী দেহধারী মানুষ, গান্ধী ভারতীয় মানুষ, গান্ধী হিন্দুধর্মের মানুষ। তবু দেখা যায় যে, দেহী হওয়া, ও হিন্দু হওয়ার কোন সংস্কার তাঁর জীবনবোধ, দেশবোধ ও ধর্মবোধকে নাম রূপ আয়তন ও সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারছে না। জীবনকে মহাব্রতরূপে এবং কর্মকে যজ্ঞরূপে তিনি উপলব্ধি করেছেন। যে সংস্কার জীবনকে খণ্ডিত করে, বৃহৎ হতে বিচ্ছিন্ন করে, সে সংস্কার দেহের ভিতর দিয়েই আসুক, আর দেশ জাতি বা ধর্মের ভিতর দিয়ে যতই স্বাভাবিকরূপে আসুক, তাকে পরাভূত করার প্রয়াসকেই বিভিন্ন ব্রতরূপে গান্ধী গ্রহণ করেছেন।

নিত্য ও নিয়মিত আচরণে এই সংস্কারমুক্তির প্রয়াস ও নীতিকে অনুশীলনের বিষয় ক'রে রাখলেন। নীতিকে এইভাবে ব্রতরূপে চর্চা ক'রে আত্মশক্তির বিকাশের পথে বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছেন গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনেই সত্যাগ্রহী গান্ধী এই সত্যের আভাস পেয়েছিলেন—আত্মশক্তির দ্বারা আত্মশাসনই হলো প্রকৃত স্বরাজ।

হিন্দ্ স্বরাজ

কিলডোনান ক্যাস্‌ল্ নামে জাহাজ এগিয়ে আসছিল উদার সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। কেপ টাউনের বেলাভূমি দেখা দেবার আগেই এই জাহাজের এক যাত্রী একটি নতুন সংহিতা রচনা সমাপ্ত করলেন—'হিন্দ্ স্বরাজ'। গান্ধী গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে ভারতীয়ের দাবীর ডেপুটেশন নিয়ে, ফিরে এলেন ব্যর্থ হয়ে। ব্রিটিশ অধিরাজের কাছ থেকে কোন আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পারেননি। যাবার সময় তাঁর দাবী ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়ের অধিকারের দাবী। ফেরবার সময় তাঁর দাবী ফুটে উঠলো ভারত ইতিহাসের দাবীরূপে। হিন্দ্ স্বরাজ, বৃহত্তর এক লক্ষ্যের রূপ তাঁর চিন্তা বিকশিত ক'রে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। ফিরে এসে তিনি কালা-কানুনপীড়িত ভারতীয় সমাজকে কোন ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির সুসংবাদ উপহার দিতে পারেননি।

উপহার দিলেন এক মহত্তর সভ্যতার লক্ষ্য—হিন্দ্ স্বরাজ। ইংরাজের অধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি নিশ্চয় চাই, কিন্তু শুধু ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্তি-লাভ করাই একমাত্র মুক্তিতত্ত্ব নয়। স্বরাজ্য নিজের মনের রাজ্য, তার চাবি সত্যাগ্রহ বা আত্মিক শক্তি। হিন্দ্ স্বরাজ এক অভিনব সমাজনীতি, অহিংসা ও নির্ভয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতি ব্যক্তির স্বরাজ ও প্রতি জাতির স্বরাজ।

এই হিন্দ্ স্বরাজের ধ্যানের মধ্য দিয়েই গান্ধী আর-একটি ব্রতের সাক্ষাৎ পেলেন—'স্বদেশী'। এই স্বদেশী হিন্দ্ স্বরাজ আদর্শের একটি প্রধান ভিত্তি। স্বদেশী অর্থ নিছক দেশীয় পণ্য ব্যবহার নয়। অর্থনীতির এক নতুন দিগ্‌দর্শন এই 'স্বদেশী'।

১৯১০ সালে ইংলণ্ড থেকে ব্যর্থডেপুটেশন যে গান্ধী আবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটীতে পদার্পণ করলেন, সে গান্ধীর মধ্যে তখন বিরাট আধ্যাত্মিক ইতিহাসের মন্ত্রময় একটি অধ্যায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ।
শরীর-শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন ॥
সর্বধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শ-ভাবনা।
হী একাদশ সেবাবী নম্রত্তে ব্রত নিশ্চয়ে ॥

একাদশ ব্রতে গঠিত গান্ধীজীবন মানুষের ইতিহাসে এক বিরাট পরিণামের লীলায় উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

আবার সত্যাগ্রহীর যাত্রা সুরু হয়। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পরম নির্ভীকের দৃঢ়তা, ঈশ্বরনির্ভরচিত্তে অপূর্ব প্রশান্তি। এক অতিনম্র দুর্জয়ের মূর্তি, ঘটনার পর ঘটনা ভেদ ক'রে পথিক নিরন্তর পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

অভিযান

ফিনিক্স থেকে নিউ ক্যাসেল, নিউ ক্যাসেল থেকে চার্লস্‌-টাউন, চার্লস্‌-টাউন থেকে ভোক্‌স্রাস্ট—পথের পর পথ অতিক্রম ক'রে সত্যাগ্রহীর দল চলেছে। পুরোভাগে গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকার ধূলিময় পথে ছয় হাজার নরনারী ও শিশুর এক মহা অভিযান। ভারতীয় দোকানী, কেরানী, কুলী, চাষী ও গিরমিটিয়া। দিনের পর দিন প্রতি সূর্যোদয়ের সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ হয়, সূর্যাস্তে

ক্ষান্ত হয়। আফ্রিকার রাত্রি ছ'হাজার অপমানিত এসিয়াবাসীর ক্লান্ত দেহকে খোলা প্রান্তরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। আবার যাত্রা আরম্ভ হয়।

এ অভিযানে পদে পদে কত ক্লেশ, কত বাধা, কত আঘাত গ্রেপ্তার ও হুমকি। তবু তারা চলতে থাকে। কত অন্তঃসত্ত্বা নারী এই যাত্রাপথেই মাতৃত্ব লাভ করে, সদ্যোজাত শিশু-এসিয়াকে কোলে ক'রে আবার পথ চলে। কেউ বা রোগের প্রকোপে যাত্রাপথেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে মৃত্যু বরণ করে।

কেন? কিসের জন্য এ অভিযান?

তিন পাউণ্ড মাথা-ট্যাক্সের আইন, দশ আঙুলের ছাপ-দেওয়া পাস নেবার আইন ও এসিয়াবাসীর আগমন নিরোধ আইন, এ তিন আইন তো ছিলই। তার ওপর আর-একটি আইন জারী করা হয়েছে। খৃস্টধর্মের অনুমোদিত পদ্ধতিতে যে বিবাহ হয়েছে, সেই বিবাহ ছাড়া আব কোন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন বিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান ও পার্শি ধর্মবিধির অনুমোদিত প্রথায় বিবাহিত যত দম্পতি দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে, তারা এই আইনের চক্ষে আর স্বামী-স্ত্রী নয়। সুতরাং তাঁদের সন্তানেরাও আইনতঃ অবৈধ। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ভারতীয় পিতার সম্পত্তিতে আইনতঃ তাঁর সন্তানের অধিকার রইল না। আইনের জোবে ভারতীয়ের মনুষ্যত্বকে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্নমেণ্ট সকল দিক দিয়ে আক্রমণ করেছেন। এই পুঞ্জীভূত কালা-কানুনের অপমান থেকে মানুষের আত্মাকে উদ্ধারের জন্য গান্ধী আবার আইন অমান্য আরম্ভ করলেন। তাঁর আহ্বানে ভারতীয় নারীসমাজও গৃহস্থালী ছেড়ে সংগ্রামে যোগদান করলেন। নিউ ক্যাসেলের কয়লাখনির ভারতীয় শ্রমিকেরা হাজারে হাজারে কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দিল।

সত্যাগ্রহী মেয়েদের জেল হলো। গান্ধীর জীবনসঙ্গিনী কস্তুরবাঈ জেলে গেলেন। সত্যাগ্রহী মেয়ে, বন্দিনী ভালিয়াম্মা জেলজীবনের দুর্ভোগের আঘাতে বাইরে এসেও কদিনের মধ্যে মরে গেল, কিন্তু হাসিমুখে। অভিযানের পথে একটি মেয়ের কোল থেকে তার শিশু-সন্তানটি স্রোতের জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবু তার পথ চলা শুদ্ধ হয়নি।

একবার ভোকস্রাস্টে আর-একবার স্ট্যাণ্ডার্টনে, গান্ধীকে দুবার গ্রেপ্তার ক'রে দু'বারই জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। জামিনে ছাড়া পেয়ে গান্ধী আবার অভিযান চালনা করতে থাকেন।

১৯১৩ সালের নভেম্বরের এক অপরাহ্ণে হেড্‌লবার্গ নামক স্থানে একটি ঘোড়ার গাড়ী এসে গান্ধীর সম্মুখে থামলো। পুলিশের গাড়ী, গান্ধীকে গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশ দ্রুত গাড়ী ছুটিয়ে উধাও হয়ে গেল।

তিনমাস জেল হলো গান্ধীর। গান্ধীকে জেলে দিয়ে কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে, সত্যাগ্রহের আসল মাথাটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু দেখা গেল যে, অভিযান পূর্বের মতই চলছে।

কিন্তু ঘটনার আবেগ ধীরে ধীরে একটা শান্ত বিরামের দিকে নেমে আসতে থাকে। তার কারণ এ নয় যে, গান্ধীর অভিযাত্রিবাহিনী ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। স্মাট্‌সের সংঘর্ষপরায়ণ ঔদ্ধত্য নত হয়ে এল আপোষের জন্য। তার পরেই নিষ্পত্তি, যে নিষ্পত্তি দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী গান্ধীর দীর্ঘ একুশ বৎসরব্যাপী সংগ্রামের জয়যুক্ত উপসংহার। তিন পাউণ্ড মাথা-ট্যাক্স উঠে যায়; ভারতীয় বিবাহ-পদ্ধতি আইনতঃ স্বীকৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়ের প্রবেশ সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রথার পরিবর্তন করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত। গান্ধীর মনে ভারতভূমির ডাক অনেকদিন আগেই এসে পৌঁছেছিল। যাই যাই ক'রেও যেতে পারেননি, বরং গিয়ে বার বার ফিরে আসতে হয়েছে। এইবার বুঝলেন, সত্যিই যেতে হবে।

মধুর স্মৃতি

দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন গান্ধী। ব্যারিস্টাররূপে বিষয় উপার্জনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যাঁর প্রবেশ, যাবার সময় সন্ন্যাসীর মত তাঁর রূপ, দেহ ও মন দুই-ই। স্বর্ণখনির দেশ থেকে তিনি এক কণিকা সোনা নিয়ে গেলেন না। যেন বনস্পতিময় আফ্রিকার ছায়ার স্নিগ্ধতা ও লবঙ্গোদ্যানের সৌগন্ধ্য নিয়ে এক শুদ্ধসত্ত্ব নরোত্তমের পুণ্যমূর্তি চললো দেশের দিকে।

—"যে আফ্রিকায় আমি একুশ বৎসরকাল কাটিয়েছি, যেখানে অজস্র মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যাত্রা অগ্রসর হয়েছে, যেখানে আমি জীবনের কাম্য কি জানতে পেরেছি, সেখান থেকে বিদায় নেওয়া বড় কঠিন ও বেদনাকর। তবু আমার মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভারতবর্ষে গিয়ে গোখ্‌লের অধীনে দেশের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করবো।"

কত মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাঁর কাছে দুই-ই জীবন দেবতার উপহার। তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে শুদ্ধ করেছে, মধুর অভিজ্ঞতা তাঁকে মধুরতর করেছে। সে মাধুর্যের ইতিহাস তাঁর স্মৃতিপটে বর্ণময় আলিম্পনের মত কত ছবি এঁকে দিয়ে গেছে।

টলস্টয় আশ্রমের মধুর স্মৃতি। সুদূর রুশিয়ার ঋষিকল্প মনস্বী টলস্টয় তাঁর যে আশ্বাসের বাণী পাঠিয়েছেন, সে আশ্বাস তাঁর জীবনে এক নতুন তপোবনের ছায়া এনে দিল। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন টলস্টয় আশ্রম। এই নতুন তপোবনে কত জাতি ও কত ধর্মের সাথী সেবক ও সহচরের অন্তরঙ্গ হয়ে তিনি ব্রতরূপে কায়িক শ্রমের চর্চা করলেন। কত অহিংসার পরীক্ষা। কত সেবা ও শিক্ষা। আশ্রমিক গান্ধীর তপস্যার পদ্ধতিই বা কী অভিনব! এখানে তিনি ছুতারের কাজ, জুতা তৈয়ারীর কাজ শিখলেন। পরিচ্ছদ গিরমিটিয়া মজুরের মত। পারিবারিক জীবনের নতুন আদর্শ, দাম্পত্য জীবনের নতুন আদর্শ, বিবাহের নতুন আদর্শ—আশ্রমবাসী নরনারী ও শিশুর জীবনে তিনি কত নতুন পরীক্ষা করলেন। চিকিৎসার নতুন পরীক্ষা, শিশুশিক্ষার নতুন পরীক্ষা—মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের বিজ্ঞানকে তিনি নতুন ক'রে বিচার করলেন।

তিনি কি ছিলেন, আর কি হয়ে গেছেন, এসব স্মৃতি সেই বিরাট পরিণামান্তরের এক একটি মধুময় আলেখ্য। গান্ধীর আহ্বানে ফিনিক্স ও ট্রান্সভালের ভারতীয় জননী-জায়া-দুহিতার দল যখন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, সেই সময়ের একটি স্মৃতি :

কস্তুরবাঈ—তুমি আর সব বোনদের সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্য ডেকেছ। কিন্তু দুঃখের কথা, তুমি আমাকে কোন খবর দিলে না। আমার মধ্যে কি এমন দুর্বলতা দেখলে যে আমি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারবো না বলে তুমি মনে করেছ?

গান্ধী—তোমাকে দুঃখ দেবার কোন ইচ্ছে আমার নেই, তোমার শক্তিতে অবিশ্বাস করার ব্যাপারও এর মধ্যে নেই। তুমি সত্যাগ্রহে যোগ দিলে আমি খুসীই হব। কিন্তু আমার কথায় তুমি সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছ, একথা ভাবতেও আমার ভাল লাগে না। নিজের মন থেকে তাগিদ এলে, নিজের সাহসেই এধরনের কাজে অগ্রসর হতে হয়। ......এগিয়ে গিয়ে যদি তুমি হার মান, কোর্টে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাক,

জেলের দুঃখে মুস্‌ড়ে পড়, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ? তখন তোমাকে কেমন ক'রে আমি আশ্রয় দেব? পৃথিবীর সম্মুখে আমি দাঁড়াবোই বা কেমন করে?

কস্তুরবাঈ—যদি হার মেনে পালিয়ে আসি, তবে আমাকে ঘরে স্থান দিও না। আমি এ লড়াইয়ে যাবই।

গান্ধী—আর-একবার ভেবে দেখ।

কস্তুরবাঈ—বার বার ভাববার কিছু নেই, আমি সত্যাগ্রহে যোগ দেব।

গান্ধী—এস।

প্রভুত্বপরায়ণ স্বামী মোহনদাস অন্তর্হিত হয়ে গেছেন কবেই, এ দৃশ্যে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দাম্পত্য সম্পর্কের এক নতুন আদর্শ তাঁর জীবনে সফল হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী, তবু তারা পরস্পরের অধীন নয়। স্ত্রীর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অধিকার স্বামীর আছে, তেমনি স্বামীর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অধিকার স্ত্রীর আছে। স্বামী-স্ত্রীর 'স্বাধীন' বন্ধন, দাম্পত্যধর্মের এই নতুন আদর্শকে গান্ধী আবিষ্কার করেছেন।

নতুন সভ্যতার সংহিতা

শত মধুর স্মৃতিসমাকীর্ণ এই আফ্রিকাভূমি থেকে চলে যেতে বেদনা হবেই, কিন্তু ভারতভূমি তখন তাঁকে ডাকছে। হিন্দ্ স্বরাজের আহ্বানে তাঁর চিত্ত ধ্বনিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি মহৎ কীর্তি করেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সে কীর্তির চেয়ে মহৎ। তাই বুঝি তাঁর জীবনের রথ নিয়ত ধাববান। তাঁর চিত্তের মত তাঁর কর্মক্ষেত্রও নিরন্তর প্রসারিত হয়ে চলেছে। হিন্দ্ স্বরাজ তাঁর এই প্রসারিত কর্মক্ষেত্রের পূর্বাভাস। হিন্দ্ স্বরাজ তাঁর নবোপলব্ধ সমাজবিজ্ঞান, তার থিওরী ও প্র্যাক্‌টিস, তাঁর লক্ষ্য ও পন্থার মূলসূত্রগুলি তিনি স্থির ক'রে ফেলেছেন। হিন্দ্ স্বরাজ নামে তাঁর এই সংহিতার মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসাধনার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোথায় সভ্যতার গলদ, অবনত ভারতের দুঃখের মূল কোথায়? কেন ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই, কি পন্থায় ও কোন্ পদ্ধতিতে? হিন্দ্ স্বরাজ সংহিতায় তারই বিশ্লেষণ, হিন্দ্ স্বরাজ এক নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ও উদ্যমের বিজ্ঞান।

"আধুনিক সভ্যতা একটা অধর্ম।......এ সভ্যতা আমরা ইংরেজের কাছ

থেকে গ্রহণ করেছি—...ইংরাজের সভ্যতাকে আমরা মেনে নিয়েছি বলেই ইংরাজ আমাদের ওপর শাসন করছে ও করতে পারছে।...... ভারতে ইংরাজশাসন ভারতের ধনীরাই বাঁচিয়ে রেখেছে।...ভারতের প্রাণ হলো কোটি কোটি কৃষক।......ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি। ধর্ম ভিন্ন হলেই জাতিত্ব ভিন্ন হয়ে যায় না।...... ....আধুনিক সভ্যতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।......বর্তমান সভ্য সমাজের উকীল ডাক্তার ও জজ সমাজকে সেবা করে না, সমাজ থেকে অর্থ শোষণ করাই এদের কাজ। উকীল ও জজ সমাজে বিবাদ বৃদ্ধি করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।......আধুনিক হাসপাতাল রেলপথ আদালত কারখানা, এসবের মধ্যে দুর্নীতি কাজ করছে, এসব সমাজকে শোষণ করার ব্যবস্থা। ......বড় বড় শহর তৈরী করাও মিথ্যা ফাঁদ পাতার ব্যাপার, এর দ্বারা ধনীরা গরীবকে লুট ক'রে খেতে সুবিধা পায়।......শুধু অক্ষর জ্ঞানকে 'শিক্ষা' বলা যায় না। নৈতিক শিক্ষাই প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।......ইংরাজী ভাষার ব্যবহার আমাদের বেশী ক'রে দাসত্বে বেঁধে রেখেছে।......হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।......ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ সরকার এখুনি চলে গেলে আমরা অনাথ হয়ে যাব না।......আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশে ইংরাজের থাকার অর্থ আমাদের দুর্বল ক'রে রাখা।......গোলাবারুদের সাহায্যে আমরা ইংরাজকে সরাতে পারবো না।......রাজা যখন প্রজার ওপর জুলুম করেন, প্রজার পক্ষে তখন সে রাজার সহযোগিতা ছেড়ে দেওয়া উচিত—এরই নাম সত্যাগ্রহ।......যে আইন আমাদের বিবেকের বিরোধী তা মান্য করা মনুষ্যত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। বিদেশী পণ্য এবং কলের তৈরী পণ্য বর্জন ক'রে হাতে-তৈরী দেশজাত পণ্য সামগ্রী এবং চরকা ব্যবহার করা উচিত।......এই 'স্বদেশী'র ভেতর দিয়ে 'স্বরাজ' লাভ হবে।......সত্যাগ্রহ বা আত্মিক শক্তি তোপের চেয়ে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র।......স্বাধীনতা ও স্বরাজ লাভে এই সত্যাগ্রহ আমাদের সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র হওয়া উচিত।...... খুনাখুনির পথে যে স্বাধীনতা আসবে তাতে প্রজাসাধারণের কোন সুখ আসবে না। আধুনিক ইংরাজী সভ্যতার রীতিনীতি হলো—

মানুষের ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা, কর্মহীন অবসর সৃষ্টি করা এবং কর্মের রূপ অশান্ত ক'রে তোলা, অর্থাৎ সব কাজকেই স্পীড বা বেগ দ্বারা চালিত ক'রে একটা অতিদ্রুততা ও অস্থিরতাকে সেবা করা।......এর ফলে সভ্যতার চরিত্র বিকৃত হয়েছে।...আধুনিক ভারতবর্ষ এই বিকৃতচরিত্র সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে।...কিন্তু ভারতের নিজ সভ্যতা যা ছিল, সে সভ্যতা ছিল নীতিমূলক, তার মধ্যে চরিত্রের ঐশ্বর্য ছিল।......ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টি ছিল নীতি দৃঢ় করার দিকে। ......আধুনিক সভ্যতা ভারতের পক্ষে এক ব্যাধি স্বরূপ।......এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে নীতিসম্পন্ন সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই হবে ভারতের লক্ষ্য।......সত্যাগ্রহ এই লক্ষ্য লাভের উপায়......এই লক্ষ্যই হলো স্বরাজ।

গান্ধীর 'স্বরাজ' এক নতুন সভ্যতার আদর্শ, এবং তাঁর স্বদেশভূমি ভারতবর্ষই সেই যজ্ঞস্থল যেখানে তাঁকে নতুন সাধনার হোমশিখা জ্বালতে হবে।

প্রথম হোমশিখার আলো

কিছুদিন পরে, দেশী মিলের তৈরী মোটা কাপড়ের কামিজ ও ধুতি, আর আট আনা দামের একটি কাশ্মীরী টুপি, এই পরিচ্ছদে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামলেন এক যাত্রী, বাংলার বোলপুর স্টেশনে। ইনি পুনা থেকে আসছেন। এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীটির সম্পর্কেই ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ দূর আমেরিকা থেকে চিঠি দিয়ে খোঁজ নিলেন—'আশা করি মহাত্মা ও শ্রীমতী গান্ধী বোলপুরে পৌঁছেছেন।'

এই মহাত্মা কিছুদিন পরে আহমেদাবাদে অস্পৃশ্যদের একটি পল্লীর পাশে এক আশ্রম স্থাপনা ক'রে তাঁর নতুন সাধনার প্রথম হোমশিখাটি জ্বাললেন। আর সে আলোক ছড়িয়ে গেল সবখানে। চম্পারনের দুঃখী কৃষকের জীবন থেকে নীলের দাগ মুছে গেল। আহমেদাবাদের কলের মজুর মালিকের বঞ্চনা থেকে রক্ষা পেল।

মহাত্মা গান্ধী! দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে বিলেত হয়ে ভারতে এসেছেন। য়ুরোপে তখন প্রথম মহাসমরের আগুন জ্বলেছে। এ যুদ্ধেও মহাত্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি সহায়তা ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি তাঁর

শ্রদ্ধাস্পদ গোখ্‌লের 'ভারত সেবক সমিতির' মধ্যে থেকে জনসেবার কাজ নিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু গোখ্‌লের মৃত্যু হয় এবং মহাত্মাও আর ভারতসেবক সমিতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ দাবী করলেন না। এর একটা কারণ ছিল। 'হিন্দ্‌ স্বরাজের' আবিষ্কারক দেখলেন যে ভারতসেবক সমিতির আদর্শ ও কর্মপন্থার সঙ্গে তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেই কারণে ভারতসেবক সমিতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার মনোভাব রেখেই তিনি ভিন্নভাবে উদ্যমের পথ খুঁজে নিলেন।

কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপনা করেছেন। দাতাদের দানের সাহায্যে এ আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হয়। কিন্তু এই আশ্রমেই একদিন এমন এক লক্ষ্মীর আবির্ভাব হলো, যার ফলে দাতারা দান বন্ধ ক'রে দিলেন।

দুই লক্ষ্মীর আবির্ভাব

অন্ত্যজ বাপ-মার কোলে চড়ে ছোট্ট এক অন্ত্যজ মেয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলো, তার নাম লক্ষ্মী। অন্ত্যজ মেয়ে লক্ষ্মীকে মহাত্মা শুধু আশ্রমেই স্থান দিলেন তা নয়, পিতৃস্নেহ দিয়েই তাকে কন্যারূপে গ্রহণ ক'রে নিলেন। এর ফলে হলো, যাঁদের দানে আশ্রমের খরচ চলতো সেই উচ্চকুলোদ্ভব দাতারা এই 'অনাচার' দেখে দান বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু এই লক্ষ্মী যে সত্যই মহাত্মার আত্মজা। মানুষ মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করে, তাও আবার ধর্মের নামে, এই বেদনা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। "হরি কে জন সব তেঁ অধিকারী"—এই বাণী বনমর্মরের মত তাঁর অন্তরে আকুল হয়ে ছুটাছুটি করেছে। লক্ষ্মী তো তাঁর সেই আকুলতারই প্রতিমূর্তি।

আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে মহাত্মা সিদ্ধান্ত করলেন : 'যদি আমাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়, আর আমাদের কাছে যদি কোন অর্থসাহায্য না আসে, তবুও আমরা আহমেদাবাদে এ জায়গা ছেড়ে যাব না। অন্ত্যজ পল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে থাকবো, আর যা কিছু পাওয়া যাবে তারই ওপর নির্ভর ক'রে থাকবো, কিম্বা মজুরি ক'রে দিন চালাবো।'

আশ্রমের সকলকে নিয়ে অন্ত্যজ পল্লীর অভ্যন্তরে অন্ত্যজরূপেই থাকবার জন্য উদ্যত হলেন মহাত্মা, এমনি সময় আকস্মিকভাবে এক শেঠের আবির্ভাব হলো আশ্রমদ্বারে। আশ্রমের সাহায্যের জন্য মহাত্মার হাতে তের হাজার টাকা দিয়ে

এই অপরিচিত শেঠ চলে গেলেন। তাই মহাত্মাকে আর চলে যেতে হলো না। বরং অস্ত্যজ-লক্ষ্মীকে নিয়েই ভাল ক'রে আশ্রম রচনা করলেন এই আহমেদাবাদেরই আর একটি স্থানে।

সবরমতী নদীর বালুকাস্তীর্ণ বক্ষে জলস্রোতের রেখা দেখা যায়, দূরে ছোট ছোট মর্মরাকুল ঝাউবন, নিকটে সেন্ট্রাল জেলের মণ্ডলায়িত প্রাচীর। আর দেখা যায় কারখানার উর্ধ্বমুখী চিম্‌নি, আহমেদাবাদের কলচালিত ধনিকতন্ত্র আকাশে কালো নিঃশ্বাস ছাড়ছে। এই কাপড়ের কলের গর্বে গর্বিত আহমেদাবাদের মুখোমুখি মহাত্মার সবরমতী আশ্রমে আর একটি লক্ষ্মীর আবির্ভাব হলো—চরকা লক্ষ্মী। মেশিনের অট্টশব্দের মুখোমুখি একটি কুটীরশিল্পের গুঞ্জন। "একজনের লাভের জন্য একটি স্থানে বহু পণ্য সৃষ্টি অথবা বহু স্থানে বহুর দ্বারা পণ্য উৎপাদন" ?—এই দুই অর্থনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি সর্বহিত আদর্শের সহায়ক, মহাত্মার মনে সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই তাঁর আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো চরকা, কোটি কুটীরের ঐশ্বর্যের প্রতীক।

মহাত্মার সত্যাগ্রহ তবু এই আশ্রমিক শান্তি ব্রতচর্যা ও স্থৈর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের নানা দিক থেকেই তাঁর ডাক আসছিল। কখনো বা না ডাকতেই নিজে উপস্থিত হচ্ছিলেন, যেখানে মানুষের অধিকার খর্বিত হয়েছে। নির্যাতিত মানুষ যেখানে প্রতিবাদ করতেও অক্ষম, সেইখানে। চম্পারণের শ্বেতাঙ্গ নীলকর চাষী-প্রজাকে নীল চাষ করতে বাধ্য করছিল, অথচ নীল চাষ ক'রে যে লাভ হয় তাতে চাষীর পেটের ভাত হয় না। চম্পারণে গিয়ে ভারতের কৃষককে সংগ্রামের প্রথম শিক্ষা দিলেন মহাত্মা। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে চম্পারণে রইলেন, চাষীকে জাগালেন। তাঁর প্রেরণায় নির্যাতিত মুক ম্লান মুখে ভাষা ফুটলো। গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার চাষীর সভায় নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। শেষ পর্যন্ত নীলের দাগ মুছে গেল, সরকার চাষীর দাবী মেনে নিয়ে নীলকরের অন্যায় অধিকার রদ ক'রে দিলেন।

খেড়াতে অজন্মা, ফসল হয়নি, তবু চাষীর কাছে ট্যাক্স আদায় করছিলেন সরকার। মহাত্মা খেড়ার চাষীকে সত্যাগ্রহে উদ্বোধিত করলেন। ট্যাক্স আদায় বন্ধ হলো।

তখনো ভারত থেকে ভারত সরকারের আনুকূল্যে শ্রমিকেরা গিরমিটিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হচ্ছিল। শ্রমিককে এইভাবে চুক্তিবদ্ধ ক'রে কোন্

ক্রীতদাসের জীবনে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার বালাসুন্দরমের সেই রক্তাক্ত মূর্তিটি মহাত্মার মনে তখনো বেদনাময় স্মৃতিরূপে রয়েছে। বোম্বাই থেকে জাহাজযোগে দুঃখী গিরমিটিয়ার দলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। মহাত্মা জাহাজঘাটায় পিকেটিং করলেন। গিরমিটিয়া প্রেরণ বন্ধ হলো। শেষ পর্যন্ত গিরমিটিয়া প্রথাকে ভারত সরকার রদ ক'রে দিতে বাধ্য হন।

মহাত্মার মজুর সংঘ

আধুনিক সভ্যতা 'কলের মজুর' নামে নতুন একটি সমাজ সৃষ্টি করেছে, তাদের দুঃখের রূপ আর এক রকমের। মহাত্মা এই 'কলের মজুর' সমাজেরও দুঃখের সন্ধান নিলেন। কলের মালিক মজুরকে অধিকার দিতে রাজী নয়, মজুর অধিকার পেতে চায়। কলের মালিক মজুরের স্বার্থকে ছোট ক'রে দেখে, মজুর তার নিজের স্বার্থকে বড় ক'রে না দেখে পারে না। মালিকেরা সংঘবদ্ধ, মজুরেরা বিচ্ছিন্ন। সুতরাং মালিকে মজুরে বিরোধ বাধে, আর বিরোধ বাধলে সংঘবদ্ধ মালিকসমাজেরই জয় হয়, মজুরেরা পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। মহাত্মা উপলব্ধি করলেন, শুধু মজুরের সংঘবদ্ধতার অভাবই মজুরের পরাজয়ের কারণ নয়, মজুরেরা যে পদ্ধতিতে মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তার মধ্যেই গলদ আছে। সত্যাগ্রহী মহাত্মা আহমেদাবাদের মজুরসমাজকে নতুন পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ করলেন, এবং সংগ্রামের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, তাও অভিনব। সত্যাগ্রহের আদর্শেই এই সংগ্রামের নীতি গঠিত। মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদের মজুরের দাবী নিয়ে এবং মজুরদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করলেন মহাত্মা। নৈতিক শক্তি ছাড়া মজুরের সংগ্রামও কিভাবে পরাজয়ের দিকে অবনত হয়, আহমেদাবাদের মজুর ধর্মঘটের ভেতর দিয়ে তারই প্রমাণ পেয়েছিলেন মহাত্মা। ধর্মঘট করার কিছুদিন পরে মজুরেরা নিজেরাই মনোবল হারিয়ে কাজে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। অগত্যা মজুরদের পরাজিত মনোভাবের বিরুদ্ধেই তিনি অনশন সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন, যার ফলে মজুরেরা তাদের প্রতিজ্ঞা পুনরায় নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে, ধর্মঘটও চলতে থাকে। কিন্তু মালিকসমাজ বড় দৃঢ়, বড় কঠিন। মহাত্মার সত্যাগ্রহ মজুরের মন যেভাবে স্পর্শ করেছে, মালিকসমাজের মনকে কি সেভাবে স্পর্শ করতে পারে?

একুশ দিন পরে। সবরমতী নদীর তীরে একটি ঝাউবনের ছায়া, যার নীচে মজুরেরা ধর্মঘটের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, সেইখানে এক বিচিত্র উৎসবের দৃশ্য দেখা দিল, সত্যি সত্যি 'মধুর আপোষের' দৃশ্য। মিল মালিকেরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই উপহার পাঠিয়েছেন, আর মজুরেরা সেই মিঠাই গ্রহণ করছেন। আপোষ হয়ে গেছে, মালিকেরা মজুরের দাবী পূরণ করেছেন।

রাজনীতির ঝঞ্ঝা

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসার পর হতে এই পর্যন্ত মহাত্মার সেবাব্রতের প্রধান কীর্তি হলো, ভারতের চাষী-মজুর ও অস্পৃশ্যের দুঃখমৌন সত্তার উদ্বোধন। য়ুরোপে তখনো মহাসমরের আগুন জ্বলছে। য়ুরোপের মুসলিম রাজ্য ও জার্মানীর পক্ষভুক্ত সুলতান ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা বিপন্ন, যার জন্য ভারতীয় মুসলমান সমাজের মনও ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ। ভারতের রাজনৈতিক সঙ্ঘগুলি ব্রিটিশের প্রতি বিরূপ। আলি ভ্রাতৃদ্বয় জেলে। হোমরুল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইংরাজের রোষভাজন হ'য়ে আছেন। যুদ্ধের জন্য ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে একদিকে যেমন ধন-জন-পণ্যের অগাধ সাহায্য আদায় ক'রে চলেছেন, তেমনই আর একদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবী ও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির ওপর সতর্ক ও সংশয়াবিল দৃষ্টি রাখছেন। বিনা বিচারে বন্দী করা ও নির্বাসনের আইন জারী ক'রে রেখেছেন। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের ও ব্রিটিশের আচরণের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেই রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্সের ধারা অনুযায়ী ভাল মত ধরপাকড় চলতে থাকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে মিলে এক শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করেছেন, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী।

মহাত্মা তখনো কংগ্রেসের কেউ নন। কিন্তু তাই বলে তিনি রাজনীতির ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে দূরে সরেছিলেন তা নয়। তিনি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহায়ক, তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন। তাঁর রাজনৈতিক দাবীও তিনি ব্যক্ত করেছেন—ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার করতে হবে।

মহাত্মা দিল্লীতে, বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড সিমলায়। কেমব্রিজ মিশনের এক ধর্মযাজক একখানা চিঠি নিয়ে পৌছলেন সিমলায় বড়লাটের কাছে, মহাত্মার প্রেরিত চিঠি।

সাম্রাজ্যের সহায়ক, যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রাহক, এক অকংগ্রেসী জনসেবকের চিঠি, বড়লাটের কাছে। কিন্তু এই চিঠিই বস্তুত: ১৯১৮ সালের মহাত্মার একটি রাজনৈতিক থীসিস বা তত্ত্বসন্দর্ভ। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট নেতৃত্ব নিয়ে আবির্ভূত হতে চলেছেন, সেই ভবিষ্যতের আভাস এই চিঠির তাৎপর্যের মধ্যেই অর্ধপ্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, মহাত্মার রাজনৈতিক আদর্শের পরিকল্পনায় এই আর একটি বড় নীতি, এই চিঠির মধ্যেই তার পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি তখনো বাইরে আছেন, কিন্তু এই চিঠিই কংগ্রেসেব বাজনৈতিক দাবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। খিলাফতের সমর্থনও এই চিঠিতে। মহাত্মা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে একটা বৃহৎ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এই চিঠি সেই প্রস্তুতির পূর্বাভাস।

"যে সাম্রাজ্যে ভবিষ্যতে পূর্ণ অংশীদাব হতে আমরা আশা রাখি, সে সাম্রাজ্যকে তার বিপদের সময়ে সাহায্য করা আমার ধর্ম বলে মনে হয়। কিন্তু আমাকে একথাও বলতে হয় যে, এইভাবে সাহায্য করার পর আমাদের দাবী খুব শীঘ্রই পূর্ণ করা হবে, সে আশাও এর মধ্যে রয়েছে। আপনি বলেছেন, শাসন-সংস্কারের কথা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে সম্মিলিতভাবে যে শাসনতন্ত্রের দাবী করেছে, আপনার ঘোষণায় তার স্বীকৃতি থাকবে, জনসাধারণের পক্ষে এই আশা করার অধিকার আছে।......আমার দ্বারা যদি সম্ভব হতো, তবে সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে 'হোমরুল' ইত্যাদি দাবীর কথা উচ্চারণ না করবাব জন্য এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রেরণা দিতাম।......কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ এ বিষয়ে অল্পমাত্র সাহায্য করবার পথ নিয়েছেন। জনসাধারণের ওপর এঁদের প্রভাব খুবই বেশী রকম রয়েছে। আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, স্বাযত্তশাসন পাওয়ার দাবী ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। স্বায়ত্তশাসন ছাড়া লোক সন্তুষ্ট হবে না। স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার জন্য যে কোন দুঃখকে বরণ করতে জনসাধারণ আর কুণ্ঠিত নয়। যদিও সাম্রাজ্যের জন্য লোক দিয়ে যতটা সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, তা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি, তবুও আর্থিক সাহায্যের সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ

এরই মধ্যে যে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, তা তার শক্তির অতীত।...... বর্তমানে আমরা সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার নই। ভবিষ্যতে আমাদের এইরকম অংশীদার করা হবে, সেই আশার উপর নির্ভর ক'রেই আমরা যুদ্ধে সাহায্য করছি। অবশ্য, আমাদের আশা পূর্ণ করা হবে, আপনাদের সঙ্গে এইরকম সর্ত ক'রে আমি সাহায্য করতে চাই না। কিন্তু যদি আশা পূর্ণ না হয়, তবে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে ধারণা ক'রে এসেছি, তা ভ্রান্ত ধারণা বলে প্রমাণিত হবে। আপনি এ সময় ঘরোয়া ঝগড়ার কথা ভুলে যাবার জন্য আমাদের বলেছেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ যদি এই হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের জুলুম ও দুষ্কার্য চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে, তবে সেটা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে জানবেন।..... চম্পারণে ও খেড়ায় আমি যে ধরণের কাজ করেছি, সে ধরণের কাজ যদি আমাকে বন্ধ করতে বলেন, তবে বলবো যে, আপনি আমাকে নিজের শ্বাস বন্ধ করবার জন্য বলছেন। আমি যদি অস্ত্রশক্তির বদলে প্রেমবল ও আত্মিক শক্তিকে ভারতবর্ষে লোকপ্রিয় আদর্শ ক'রে তুলতে পারি, তবে আমি জানি যে, আমার এই ভারতবর্ষ সারা জগতের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়তে পারবে। সেইজন্য নিজের ওপর দুঃখের আঘাত বরণ ক'রে নিয়ে সংগ্রামের নীতিকে আমার জীবনে সত্য ক'রে তুলবার জন্য আমার সত্তা সর্বদা তৎপর হয়ে থাকবে। অপরকেও এই নীতি গ্রহণ করার জন্য আমি সর্বদা আহ্বান করবো।......পরিশেষে, মুসলিম রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত একটা আশ্বাস দেওয়ার জন্য আপনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে প্রস্তাব করবেন, এই আমার অনুরোধ। আপনি জানেন, এ বিষয়ে ভারতের সকল মুসলমানের মন দুশ্চিন্তিত হয়ে আছে। নিজে হিন্দু হয়ে মুসলমানের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারি না। তাদের দুঃখ আমাদেরই দুঃখ। মুসলিম রাজ্যের স্থায়িত্বের দাবী স্বীকার করা এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বীকার—এই সমস্তের উপরেই আপনাদের সাম্রাজ্যের কুশল নির্ভর করে।"

ঠিক এক বছর পর। এপ্রিলের এক মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত ধূলিঝড়ের ভেতর দিয়ে একটি মালবাহী ট্রেন চলে যাচ্ছিল উত্তর ভারতের প্রান্তর পার হয়ে—মথুরা থেকে বোম্বাই। এই ট্রেনের একটি ওয়াগনে সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত মহাত্মা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহায়ক ও যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রাহকের এ কোন পুরস্কার?

এই একটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। য়ুরোপের রণক্ষেত্রে আর ধূমানলের প্রমত্ত সংহারলীলা নেই, ভার্সাইয়ে শান্তি ও সন্ধির আসর, ব্রিটিশ তার সাম্রাজ্য-সঙ্কট পার হয়েছে।

জাগ রে চিত্ত জাগ রে

সঙ্কট দেখা দিয়েছে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বহু নিন্দিত রাউলাট বিলকে আইনে পরিণত করলেন। রাউলাট আইন প্রবর্তনের দ্বারাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মনোভাবের স্বরূপটি প্রকাশ ক'রে দিলেন। জনমতের বিরুদ্ধে আইন ও অস্ত্রের জোরে অবাঞ্ছিত শাসনতন্ত্রকে চালিয়ে যাবার এই নতুন উদ্যোগ, ভারতের মুক্তির পথে চিবকালেব অবরোধ সৃষ্টির প্রয়াস বলা যায়। এরই বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রাম স্ফূর্ত হয়ে উঠলো। সে সংগ্রামের অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধী। তাই তাঁকে বন্দী ক'রে প্রহরীর দল নিয়ে চলেছে।

কিন্তু রাউলাট আইনকে বেশী ঐতিহাসিক মর্যাদা দেবার কোন কারণ নেই। রাউলাট আইন না হলে কি এ সংগ্রাম দেখা দিত না? এ কি শুধু রাউলাট আইন বিরোধী সংগ্রাম? ব্রিটিশের বহু আইন ভারতবর্ষকে বহু দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু তার জন্য আসমুদ্রহিমাচল আলোড়িত হয়ে উঠেনি। ভাবতের ইতিহাস এক মহা পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই উঠেছিল, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য। রাউলাট আইন সেই ঐতিহাসিক আবেগকে সুযোগ দিল স্ফূর্ত হয়ে উঠতে।

তবু একটা কথা বাকী থেকে যায়। ভারতের জনতার চেতনা তৈরী হয়েছিল, রাউলাট আইনও ছিল, কিন্তু এই তো সব নয়। এই দুই ঘটনাকে এক পরিণামে গ্রথিত করার জন্য এক গুণীর প্রয়োজন ছিল। রাউলাট আইনকে কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় জনতার ঐতিহাসিক চেতনাকে যে স্ফুরিত করতে পারা যায়, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার মত অনুভব কি কারও ছিল? ছিল একজনের, তিনি মহাত্মা গান্ধী।

> "রাউলাট বিল আইনে পরিণত হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে শুধু ভাবছিলাম। এই ভাবনা নিয়ে রাত্রে ঘুমোলাম। ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আধঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্নের ভেতর আমার কর্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণার উদয় হলো। আমি রাজাগোপালআচারীকে ডেকে বললাম—আমি গতরাত্রের স্বপ্নের মধ্যে আমার কর্তব্যের

সন্ধান পেয়েছি। ঐ আইনের প্রত্যুত্তরে দেশ জুড়ে হরতাল করতে হবে। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। সুতরাং শুদ্ধির দ্বারাই এই ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। ঐদিন সকলে উপবাস করবে ও কাজ-কর্ম বন্ধ রাখবে।"

মহাত্মা দেশের সর্বসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন—রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল পালন করতে হবে। মহাত্মার আবেদনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো। বোম্বাই, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, ভারতের শত শত জনপদে হরতাল। কাজ বন্ধ, দোকান বন্ধ, শত শত জনপদে হাজার হাজার লোকের শোভাযাত্রা, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিবাদসভা, মাঠে ময়দানে নদীমুখে সমুদ্রতীরে মন্দির-চত্বরে ও মসজিদ-প্রাঙ্গণে।

ভারতভূমির লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের চক্ষে যোদ্ধার উৎসাহ, হাত অস্ত্রহীন। কিন্তু অন্তরে যে উদ্দীপনা, তার মধ্যে রাউলাট আইনের কথা তুচ্ছ। ইংরাজ শাসনের অবসান হউক, এই কথাটাই সে উদ্দীপনার মর্মবাণী।

ব্রিটিশ শাসক এ দৃশ্যকে সহ্য করতে পারেনি, পারবার কথা নয়। লাহোর অমৃতসরে জনতার উপর গুলী বর্ষিত হয়, দিল্লী, বোম্বাই ও আরও বহু জায়গায় সভা ও শোভাযাত্রার ওপর ব্রিটিশের গায়ের জোরের দাপট ভালভাবেই জাহির করা হয়। লাহোর ও অমৃতসরের অবস্থার কথা শুনে ও পাঞ্জাব নেতাদের আমন্ত্রণে পাঞ্জাবে যাচ্ছিলেন মহাত্মা; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। ৭ই এপ্রিল তারিখে মহাত্মাকে গ্রেপ্তার ক'রে এক মালবাহী ট্রেনের ওয়াগনে বসিয়ে বোম্বাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মালবাহী ট্রেনের ওয়াগনের ভেতর বসিয়ে প্রহরী দিয়ে ঘিরে যাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তিনি যে ভারত জনচিত্তের সিংহাসনে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হয়ে গেছেন, এই বাস্তব সত্যটিকে তখনো ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রভুসমাজ বোধহয় বাস্তব বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য একটু বেশী রূঢ় হয়েই দেখা দিল। মহাত্মার গ্রেপ্তারের সংবাদে কোন কোন স্থানে জনতা উত্তেজিত হয়ে যে সব হিংসা ও আক্রমণের প্রমাণ দিল, সে সব সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত আচরণ ছিল না। বিরামগ্রামে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হয়, নড়িয়াদ নামক স্থানে ও আহমেদাবাদেও জনতা নানারকম আক্রমণমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উঠে। জনতার

এই প্রমত্ততার উত্তরে গভর্ণমেণ্টের প্রমত্ততাও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আহমেদাবাদে 'মার্শাল ল' জারি করা হয়। ব্রিটিশ সিংহের লাল নখর প্রতিশোধের স্পৃহায় বহু রক্তপাতের আয়োজন করতে থাকে।

সমস্ত ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করলে এর মধ্যে তিনটি বাস্তব তথ্যের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। প্রথম, ভারতে জনতার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাতীয় চেতনা-রূপে জাগ্রত হয়েছে। দ্বিতীয়, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব এক বিরাট শক্তিরূপে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তৃতীয়, জনসাধারণ অহিংস সত্যাগ্রহ করবার মত যোগ্যতা লাভ করেনি।

শুদ্ধ মত ও শুদ্ধ পথ

হিমালয়প্রমাণ ভুল! নড়িয়াদে জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে মহাত্মা এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করলেন। কার ভুল? মহাত্মা গান্ধীর। কিসের ভুল? সত্যাগ্রহের জন্য যারা যোগ্য হয়ে উঠেনি, সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে জনতার মনে সুস্পষ্ট বা মোটামুটি কোন ধারণা দেখা দেয়নি, সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি, তাদের কাছে সত্যাগ্রহের আবেদন যিনি জানিয়েছেন তিনিই তাঁর ভুলকে 'হিমালয়প্রমাণ' বলে জগৎসমক্ষে প্রচার ক'রে দিলেন।

যে কোন দেশের রাজনৈতিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় জনতার হিংসাত্মক আচরণকে দোষাবহ বলে মনে হবে না। এক বিদেশী রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনতা দুঃসাহসের সঙ্গে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা বা হিংসাত্মক সংঘর্ষের প্রমাণ দিয়েছিল, সেটাকে একটা সার্থক পলিটিক্যাল কীর্তি বলেই মনে করা ও তার জন্যে গর্ব করা পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত পলিটিক্সের নিয়ম। অথচ মহাত্মা গান্ধী তার মধ্যে দোষাবহতা দেখলেন এবং নিজেকে পর্বতপ্রমাণ ভুলের অপরাধী বলে মনে করলেন।

এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরই জীবনচর্যার দুটি নীতির অভিব্যক্তি রয়েছে। ভ্রান্তি স্বীকার করাকে চিত্তশুদ্ধির একটি উপায় বলে তিনি মনে করেন। ভ্রান্তি স্বীকার ক'রে হৃদয়ের কপাট খুলে দেওয়ার সার্থকতা তিনি কৈশোর ও তরুণকালের মনের আবেগ দিয়েই বুঝেছিলেন। সেই আবেগ বহু পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে এখন নীতিরূপেই তাঁর মনে ঠাঁই নিয়েছে। তারপর, 'লক্ষ্য ও উপায়ের' মত, ও পথের

আত্মীয়তার নীতি! লক্ষ্য ও উপায়, উভয়ই তাঁর কাছে সমান শ্রদ্ধার বিষয়। মহৎ লক্ষ্যের জন্য মহৎ উপায়, শুদ্ধ মতের জন্য শুদ্ধ পথ।

লক্ষ্য ও উপায় এক অখণ্ড সম্পর্কে যুক্ত। উপায় শুদ্ধ না রাখলে শুদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও জীবনের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হবে যে, পথ শুদ্ধ ক'রে রাখাই তাঁর কাছে একটা লক্ষ্য। শুদ্ধ পথে থাকাই একটা শ্রেয়ঃ, আনন্দ ও সফলতা। এবং এ সত্ত্বেও লক্ষ্যে যদি পৌঁছাতে না পারা যায়, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই।

হরতাল পালিত হলো। এইটাই তাঁর কাছে একমাত্র প্রার্থিতব্য ছিল না। কিভাবে পালিত হলো? সেই ভাবের মধ্যে হিংসা আক্রোশ এবং হঠাৎ-দুঃসাহসের ভীরুতাও ছিল। মহাত্মা লক্ষ্য করেছিলেন, আহমেদাবাদে 'মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারী হবার পর জনতা তার কঠোর প্রতাপে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। জাতি নির্ভয়ের দীক্ষা তখনো পায়নি।

মহাত্মা থামলেন। তাঁর নিজের হাতে জ্বালানো উৎসাহের শিখাটি নিজেই নিভিয়ে দিলেন। কারণ সে শিখা থেকে আলোকের চেয়ে জ্বালাই বেশী ক'রে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। মহাত্মা সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার ক'রে নিলেন, এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিন দিনের উপবাস করলেন।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন

সেদিন বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল সবরমতীর আশ্রম কুটীরে মহাত্মা উপবাসব্রতে সমাসীন। চিত্তের গভীরে তিনি শুদ্ধ পথের সন্ধান করছেন। শুধু নিজের জন্য নয়, জাতিকে সেই শুদ্ধ পথের দীক্ষা দেবেন কেমন ক'রে? কি উপায়ে?

ঠিক এই একই দিনে, সবরমতীর মর্মরাকুল ঝাউবন থেকে অনেক দূরে ভারতভূমিরই একটি শান্ত উদ্যানের বৃক্ষচূড়া থেকে পাখির দল হঠাৎ আতঙ্কে উড়ে পালিয়ে গেল, আর মাটির ওপর প্রবাহিত হয়ে গেল শত শত নরনারী ও শিশুর শোণিতস্রোত। জালিয়াঁওয়ালাবাগে এক জনসভার ওপর জেনরেল ডায়ার সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করেন। সৈনিকেরা গুলিবর্ষণ করে, যতক্ষণ না গুলি ফুরিয়ে যায়।

জালিয়াঁওয়ালাবাগ থেকে রক্তস্নাত জাতির বেদনা নিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের

আরম্ভ—দ্রুত তীব্র আকুল ও আবেগময়। জালিয়াঁওয়ালা থেকে আরম্ভ, চৌরিচৌরাতে শেষ, ভারত ইতিহাসের এক ক্রান্তিপথ।

আশ্রমের প্রশান্ত ছায়াপথ থেকে এই ক্রান্তিপথে মধ্যাহ্নসূর্যরূপে দেখা দিলেন মহাত্মা গান্ধী। পাঞ্জাবে 'সামরিক আইনের' হৃদয়হীন শাসন জনসাধারণের জীবনে নির্যাতন ও অপমান চরম ক'রে দিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহাত্মা এই নির্যাতনের বিবরণ সংগ্রহ করলেন। গবর্ণমেণ্টের তরফেও হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল পাঞ্জাবের 'হাঙ্গামা' তদন্তের জন্য। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতারা এই কমিটি বয়কট করাই সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

মহাত্মা এখনো কংগ্রেসের কেউ নন্। কংগ্রেস তাঁর হাতে মাঝে মাঝে যে কাজের ভার তুলে দিচ্ছেন, তিনি তারই দায় গ্রহণ করেছেন। জাতির এই সঙ্কট-কালে কংগ্রেস নেতাদের মন সুস্থির ছিল না। কংগ্রেসের একদল নতুন শাসন সংস্কার পছন্দ করেন, আর এক দল একেবারে বর্জন করার কথা বলেন। যাঁরা আজ বর্জন করার কথা বলেন, তাঁরা আবার কদিন পরেই গ্রহণের কথা বলেন।

এর পর কংগ্রেসের সঙ্গে মহাত্মার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে এল। কংগ্রেস মহাত্মাকে জালিয়াঁওয়ালাবাগের স্মৃতিরক্ষা কমিটির অন্যতম ট্রাষ্টিরূপে নিয়োগ করলেন। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র নতুন ক'রে রচনার জন্যও মহাত্মার ওপর ভার দেওয়া হলো। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর এই প্রথম প্রবেশ। যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে, তেমনি খিলাফৎ সম্মেলনের সঙ্গেও যুক্ত হলেন মহাত্মা। প্রথম নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মাই সভাপতিত্ব করেন।

সুন্দর ঝড়

হাণ্টার কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে, এই রিপোর্টে সরকারী কুকীর্তিকে প্রচ্ছন্ন করার অপপ্রয়াস দেখে মহাত্মার মনে খুবই আঘাত লাগে। সে আঘাতে যেন ভারতের ভাগ্যপটেই বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়।

খিলাফৎ সাব-কমিটির বৈঠক, ২৮শে নভেম্বর ১৯২০, ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। কিন্তু শুধু ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করা ছাড়া কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আর কোন পদ্ধতি নেই? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বে অবিলম্বে আঘাত করা যায় এমন কোন্ উপায় আছে? খিলাফৎ সাব-কমিটির নেতাদের মধ্যে অনেকে বার বার এই প্রশ্নই করছিলেন।

আর কোন্ পদ্ধতি? আকস্মিকভাবেই মহাত্মার মুখে একটি কথা ধ্বনিত হলো—নন্-কো-অপারেশন! অসহযোগ! গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা না করা। গবর্ণমেণ্টের চাকরী ক'রে, গবর্ণমেণ্টের দেওয়া খেতাব গ্রহণ ক'রে, গবর্ণমেণ্টের আদালতে বিচার গ্রহণ ক'রে আমরা গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করছি। বলতে গেলে আমাদেরই এই সহযোগিতা স্বীকৃতি ও পরিচর্যার ভিত্তির ওপরেই গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই ভিত্তি সরিয়ে নিলে গবর্ণমেণ্টও সরে যাবে।

অসহযোগ—সংগ্রামে এই নতুন মন্ত্র জাতির চিত্ত স্পর্শ করে। মহাত্মা কৈজর-ই-হিন্দ পদক গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দেন। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁরই 'দেশবাসীর শোণিতে সিক্ত' নাইট্ উপাধি বর্জন করেন।

এইবার কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই মহাত্মার আবির্ভাব অধিনায়করূপে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব, মহাত্মা গান্ধীর রচিত নিয়মতন্ত্রের খসড়া এবং মহাত্মা গান্ধীরই প্রস্তাবিত 'স্বরাজ' আদর্শকে কংগ্রেস লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে। আর পন্থা? "শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে"। শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-সাধনার প্রধান তিনটি বিষয়ও কংগ্রেস গ্রহণ করে—হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও খাদি প্রচার। কংগ্রেসকে তিনটি শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়ে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও পন্থার প্রকৃতি শুদ্ধ ক'রে দিয়ে এবং কংগ্রেসকে নতুনভাবে তৈরী ক'রে নিয়ে তবে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তুত হলেন। এর পর থেকে কংগ্রেসের ইতিহাস মহাত্মা গান্ধীরই বহুবিস্তৃত কর্মসাধনার একটি বৃহৎ অধ্যায়।

অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এই যুদ্ধ পৃথিবীর সংগ্রামের ইতিহাসেরই এক অভিনব ঘটনা। যুদ্ধ—কিন্তু উৎসবের মত তার রূপ। সহস্রের চেতনা দিয়ে সঞ্জীবিত, সহস্রের নিঃশ্বাসে আন্দোলিত এক সুন্দর ঝড় যেন ভারতের মালিন্যের জঞ্জাল এতদিনে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দিকে দিকে অগ্নিশিখার বিস্তার দেখা দেয়, এ আগুন সংহারোন্মত্ত কামান-বন্দুকের আগুন নয়, বিদেশী কাপড়ের চিতাবহ্নি। এ যুদ্ধে বিস্ফোরকের রূঢ় শব্দ শোনা যায় না, শোনা যায় বিশ লক্ষ চরকার গুঞ্জন। এই যুদ্ধেই মহাত্মা জাতির হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরকালাঞ্ছিত পতাকাটিও তুলে দিলেন। তিনি স্বয়ং বাহিরের মূর্তিতেও দেখা দিলেন অভিনব রূপে। শুদ্ধ খাদির কটিবাস পরিহিত ভারতের চাষীর মূর্তিতে।

কে কার বিচার করে?

সুন্দর ঝড় উৎসবের রূপে নিজের পরিণামের পথে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে এই ঝড়ের রূপ বদলে গেল। উৎসবের রূপে নয়, হিংস্র উল্লাসের রূপে। চৌরিচৌরায় বাইশজন পুলিশ কর্মচারীকে জনতা পুড়িয়ে হত্যা করলো। যে ঝড়কে মন্ত্রপূত ক'রে তিনি ভারতের বাতাসে সঞ্চার করেছিলেন, তিনিই সে ঝড় প্রত্যাহার করে নিলেন এবং পাঁচ দিন অনশন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। কিন্তু আরও কিছু বাকী ছিল।

তিনি অপরাধী। 'রাজদ্রোহ' করেছেন, ভারতের মানুষকে রাজদ্রোহে 'প্ররোচনা' দিয়েছেন। তিনি ভারতের 'শান্তি' ভঙ্গ করেছেন। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের পীনাল কোডের ১৪৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত আসামী। সুতরাং ব্রিটিশ আদালতে ব্রিটিশ বিচারকের সম্মুখে আসামীরূপেই তাঁকে একদিন দেখা গেল, শাস্তি গ্রহণের জন্য মাথা পেতে দিয়েছেন। হেমলকের পাত্র হাতে সক্রেটিস ও রোম্যান বিচারক পাইলেটের সম্মুখে শৃঙ্খলিত অপরাধী যীশুখৃষ্টের প্রতিচ্ছবিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী।

ব্রিটিশ আদালত, বিচারক ব্রুমফিল্ড, সম্মুখে অপরাধী মহাত্মা। তবু সে দৃশ্য দেখে বোঝা যায় না, কে অপরাধী—আর কে বিচারক। ব্রিটিশের আদালতে অপরাধী মহাত্মা গান্ধী? অথবা মনুষ্যত্বের আদালতে অপরাধী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট?

আসামী মহাত্মা বললেন:

"............I am here therefore to invite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is a deliberate crime."

—আইন অনুসারে যে কাজ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই অপরাধের জন্য চরম শাস্তি দেবার যে বিধান আছে, আমি খুসী মনে সেই শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি এবং সেই শাস্তি কামনা করি।

বিচারক ব্রুমফিল্ড অপরাধী মহাত্মাকে শাস্তি দিলেন ঠিকই, ছয় বৎসরের কারাবাসের আদেশ। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে যা বললেন, সেকথা সেদিনের ব্রিটিশ বিচারকের কথা নয়। পৃথিবীতে এক মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর

নাম গান্ধী, এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি সেই ব্রিটিশ বিচারকের মুখ দিয়েই সেদিন ধ্বনিত হলো। বিচারক ব্রুমফিল্ড বললেন :

"It will be impossible to ignore the fact that you are in a different category from any person I have ever tried or am likely to have to try....in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a great leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of noble and even saintly life."

—আমি একথা মন থেকে ভুলে যেতে পারছি না যে, আমি এপর্যন্ত জীবনে যত মানুষের বিচার করেছি এবং ভবিষ্যতে যত মানুষকে বিচার করতে হবে, সেই সব মানুষের মত একজন মানুষ বলে আপনাকে গণ্য করা যায় না.........আপনার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর চক্ষে আপনি এক মহৎ দেশপ্রেমিক ও মহৎ জননায়ক। রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে যাদের মতভেদ আছে, তারাও আপনাকে এক মহান্ আদর্শের মানুষ বলে মনে করে। শুধু তাই নয়, আপনাকে অতি উচ্চ মহাপুরুষোচিত জীবনের মানুষ বলে মনে করে।

দুর্গম পথে নচিকেতা

আদালতের কাঠগড়া থেকে মহাপুরুষ নেমে এলেন অপরাধীরূপে শাস্তি স্বীকার ক'রে, আর য়েরোড়া কারাগারকে গ্রহণ করলেন 'মন্দির' রূপে। এই য়েরোড়া মন্দিরের নিভৃতে সত্যাগ্রহী প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় শুধু আলোকের পথ খুঁজছিলেন। সত্যাগ্রহীর যাত্রার ক্ষান্তি নেই, তবে প্রতীক্ষা আছে। এ বন্দীর সত্যাগ্রহীর চিত্তকে বরং আরও বৃহৎ ও আরও মহৎ উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত ক'রে দিল। বন্দী মহাত্মা উপলব্ধি করলেন :

"আমার সম্মুখে এখনও সেই পথ পড়ে রয়েছে, যে পথ অতি দুর্গম এই পথ আমাকে পার হতে হবে। নিজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিতে হবে।"

য়েরোড়া কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মহাত্মা বাহিরে এসে আবার যখন পথের ওপর দাঁড়ালেন, তখন ১৯২৪ সালের মার্চ মাস। স্বরাজের জন্য দুর্গম পথেই নব নচিকেতার যাত্রা সুরু হবে, সেজন্য তৈরী হয়েই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু

দেখলেন, পথ তো দুর্গমই, তার ওপর শোণিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিমুখরিত যে ভারতবর্ষকে কিছুদিনের জন্য বাইরে রেখে তিনি য়েরোড়া কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন সে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি আর বিদ্বেষে জর্জরিত। দিল্লী, গুলবর্গা, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, সাজাহানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট—আরও কত জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। বহু সাধনায়, বহু নিষ্ঠা দিয়ে, সকল মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী যে রূপময় মূর্তি তৈরী করেন, সেই মূর্তিকে চূর্ণ হতে দেখলে শিল্পীর যা দুঃখ, স্বরাজের রূপকার মহাত্মা সেই দুঃখ পেলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহীর ধর্মে পিছিয়ে পড়ার কোন নীতি বা কূটনীতি নেই। মহাত্মা অনশন গ্রহণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেন, এবং বলতে পারা যায়—প্রস্তুত হন।

সাইমন কমিশন এসে ভারতের যোগ্যতা একবার তদন্ত ক'রে চলে গেলেন এবং তারপরেই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ইচ্ছা ঘোষণা করলেন—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল একটি শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষকে দেবার জন্য আয়োজন করা হচ্ছে।' এর মধ্যে 'স্বরাজের' কোন অঙ্গীকার নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহী স্বরাজকে উপহাররূপে কারও হাত থেকে পেতে চান না। মহাত্মা দুর্লভকে দুর্গম পথে এগিয়ে গিয়ে গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে মহাত্মার কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও ঘোষণা করলেন।

একমুষ্টি লবণাক্ত মৃত্তিকা

এবং তার কিছুদিন পরেই আরব সমুদ্রের তীরে ডাণ্ডীতে যাদুকরের মত এক মুঠো লবণাক্ত মৃত্তিকা তুলে নিয়ে দাঁড়ালেন মহাত্মা, যার ফলে সারা ভারতবর্ষে বিপ্লবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। সবরমতী থেকে ডাণ্ডী—দু'শো মাইল পথ। আইন অমান্যের সংকল্প নিয়ে এক কৌপীনবস্ত বৃদ্ধ উত্তপ্ত ধূলি ও রৌদ্রের জ্বালা ভেদ ক'রে যখন চলতে সুরু করলেন, তখন তামাম হিন্দুস্থান উথলে উঠলো ঠিকই। দেশব্যাপী এই আইন অমান্যের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্ত্রশক্তি অগ্নিমুখী হয়ে উঠতে কোন দ্বিধা অনুভব করেনি। আরব সমুদ্রের তীরে অহিংস যোদ্ধা মহাত্মা যখন তাঁর শিবিরে গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতায় নিদ্রামগ্ন, তখন অকস্মাৎ পুলিশের মশালের আলো চমকে উঠলো তাঁর মুখের ওপর। বন্দী

মহাত্মা আবার কারাগারে প্রেরিত হলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই বড়লাট আরউইন মহাত্মাকে মুক্তি দিয়ে একটা চুক্তি করলেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হবে, কিন্তু ভারতের সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকারে কোন আইনগত বাধা থাকবে না। স্বদেশী প্রচার ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পিকেটিং করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গবর্ণমেণ্ট মনে করবেন না। আইন অমান্যের পূর্বে এই বড়লাট আরউইনের কাছে মীমাংসার জন্য একটা আলোচনা করবার সুযোগ চেয়েছিলেন মহাত্মা। কিন্তু বড়লাট মহাত্মার সে আবেদন তখন অগ্রাহ্য করেছিলেন। "নতজানু হয়ে এক টুকরো রুটি" চেয়েছিলেন মহাত্মা, কিন্তু বিনিময়ে তাঁর দিকে "এক টুকরো পাথর" ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বড়লাট। আলোচনা করতে পর্যন্ত যে বড়লাট নারাজ ছিলেন, তিনিই এবার চুক্তি করলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও এই সময় একটা নতুন নরম কথা ভারতবর্ষের কাণে পৌছতে থাকে, গোল টেবিল বৈঠকের কথা। ব্রিটিশের সদিচ্ছা যাচাই করতে এবং ভারতের বক্তব্য স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে, এই গোল টেবিলের আমন্ত্রণ মহাত্মা গ্রহণ করলেন।

সেণ্ট জেম্‌স্ প্রাসাদ

—লর্ড চ্যান্সেলার ও আমার সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ!

সেণ্ট জেম্‌স্ প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি শান্ত ও নিবিড় কণ্ঠস্বরের সম্বোধন ধ্বনিত হলো। শৃঙ্খলিত ভারতের কণ্ঠস্বর। হিমাক্ত বাতাস ও কুয়াসা-পরিবৃত লণ্ডনপুরীর এক বিরাট হর্ম্যকক্ষে সাম্রাজ্যের ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণদের সম্মুখে বসেছিলেন সাদা খদ্দরের চাদরে শরীর-জড়ানো একটি মূর্তি, পায়ে চটি। ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক আধিপত্য যিনি চূর্ণ করতে চান, এই তাঁর রূপ! আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাঁরা দিক্‌পাল ও গর্বের আস্পদ, তাঁরা তাকিয়েছিলেন এই ক্ষুদ্রকায় বিপক্ষের মুখের দিকে। গোল টেবিল সম্মেলনে ফেডারাল গঠন কমিটির সম্মুখে জাতীয় ভারতের প্রতিনিধি মহাত্মা জাতীয় দাবী উপস্থিত করলেন।

—লর্ড চ্যান্সেলার ও আমার সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ!.........আমার দেশ ভারতবর্ষ একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে, ভারতবাসী একটি স্বাধীন জাতি-

রূপে স্বাধীন ব্রিটিশ-জাতির সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্কে যুক্ত হবে, এই স্বপ্নপ্রায় আশা নিয়ে আমি ব্রিটিশ দ্বীপে এসেছি……।

লর্ড চ্যান্সেলার ও সহ-প্রতিনিধিবৃন্দ! প্রতিদিনের বৈঠকে মহাত্মা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ও ব্রিটিশ জাতিকে সম্বোধন করেন। ভারতবর্ষ কোন্ শাসনতন্ত্র চায়, কি তার স্বরূপ, মহাত্মা সেই জাতীয় দাবী যুক্তি নীতি ও ভাষ্য সমেত উপস্থিত করেন। জাতীয় দাবীর এক সুললিত সংহিতা। নির্বাচন প্রথা, ভোটারের অধিকার, আইন-সভার গঠন, মৌলিক নাগরিক অধিকার, মনোনয়ন প্রথা, পৃথক্ নির্বাচন, মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা, সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ, বিচার বিভাগের রূপ, সরকারী কর্মচারীর বেতন, দেশরক্ষা ও ফৌজের রূপ, ফাইন্যান্স, রাজস্ব, ট্যাক্স, দেশীয় রাজ্য, বাণিজ্যিক অধিকার—ভারতের জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি আঙ্গিক কিভাবে নূতন ক'রে গড়ে তুলতে ভারতবর্ষ চায়, মহাত্মা তার বর্ণনা শুনিয়ে দিলেন। সে বর্ণনার কাছে শ্রেষ্ঠ মেমোরাণ্ডামবিশারদ রাজনৈতিকের ব্যাখ্যান তুচ্ছ হয়ে যায়।

—লর্ড চ্যান্সেলার! অপরকে আঘাত দিয়ে, ভারতের শাসক সমাজকে আঘাত দিয়ে শোণিতপাত ক'রে আমরা ভারতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চাই না। কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমাদের জাতির পক্ষে কোন উৎসর্গের প্রয়োজন হয়, তবে ভারতবাসী তার গঙ্গাকে নিজের শোণিত দিয়ে পূর্ণ প্রবাহে পরিণত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না।

—প্রধান মন্ত্রী! ভারতের অস্পৃশ্য নামে যে কোটি কোটি মানুষ আছে, আমি নিজেকে তাদেরই একজন বলে দাবী করি।……আমার দেশের শাসনতন্ত্রের রেজিষ্টারে বা সমাজের তালিকায় এই অস্পৃশ্য সমাজকে 'ভিন্ন শ্রেণী'রূপে স্থান দিতে আমি চাই না। আজকের অস্পৃশ্যকে কি চিরকাল অস্পৃশ্য ক'রে রাখতে হবে? আমি বরং চাইব যে, হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্, কিন্তু অস্পৃশ্যতা যেন না থাকে।……

—প্রধান মন্ত্রী! বোধ হয় আমি আপনাদের সঙ্গে শেষবারের মত আলোচনা ক'রে চলে যাচ্ছি।……এর ফলাফল কি হবে জানি না।…… আমার দুঃখী দেশের ভাগ্যে যা-ই হউক না কেন, এখানে এসে হাজার হাজার ইংরাজ নরনারীর কাছে আমি যে সৌহার্দ্যের ব্যবহার পেয়েছি, তারই সুখ-স্মৃতি উপহাররূপে নিয়ে আমি চললাম। প্রধান মন্ত্রী! ধন্যবাদ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড উঠলেন বিদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান যিনি ঘটাতে চান, গান্ধী নামে সেই লোকটি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কিভাবে তাঁকে বিদায় দিতে পারেন ?

—প্রিয় মহাত্মা! আপনাকে ধন্যবাদ। সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী উচ্চারণ করলেন তাঁর অভিনন্দনের বাণী। সভাতল নিস্তব্ধ হলো। প্রধান মন্ত্রী এসে মহাত্মার হাত ধরলেন এবং দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি মুহূর্তের মত, নিঃশব্দে, যেন অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

ক্রশের বেদনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর স্পর্শ করতে পারলেন কি না, মহাত্মা তা জানেন না। তবে ব্রিটিশ জাতির অন্তর যে তিনি স্পর্শ করেছেন, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটিশ জাতি তাঁকে অর্ধোলঙ্গ রাজদ্রোহী ফকীর বলে মনে করেনি। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দর্প আছে, আর কিছু নেই, সত্যাগ্রহী মহাত্মা একথা বিশ্বাস করতে পারেন না। লণ্ডনে থাকতেই মহাত্মাকে কেউ কেউ সতর্ক করে দিয়েছিল যে, আপনি ল্যাঙ্কাশায়ারে যাবেন না। কারণ ল্যাঙ্কাশায়ারের ইংরাজ শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছে এবং তারা জানে, ইংলণ্ডের কোন প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর পক্ষে সবচেয়ে দূরপাল্লা কামানের গোলা ছুঁড়ে ইংলণ্ডের যে মিল ও ফ্যাক্টরী চূর্ণ করা সম্ভব ছিল না, গান্ধী নামে এই শত্রুটি বিনা কামানে তাই সম্ভব করেছেন। ভারতের বয়কটের প্রকোপে পড়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং শ্রমিকেরাও সেই কারণে বেকার হয়ে পড়েছিল। সেই ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক অঞ্চলে ও ওয়েলসের খনি অঞ্চলে মহাত্মা গিয়ে দাঁড়ালেন। ভারতের কোটি কোটি চাষী ও মজুরের দীন-জীবনের বর্ণনা করলেন। তারপর দৃশ্য বদলে গেল। শত্রু মহাত্মাকে ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকেরা ছুটে এসে আলিঙ্গন দিল।

ইংলণ্ডের পথে পথে, গৃহে গৃহে বহু সমাদরের অভিষেক পেয়েছিলেন মহাত্মা। বাকিংহাম প্রাসাদের ক্রিসেন্থেমাম-সজ্জিত ও অর্কেস্ট্রাধ্বনিত কক্ষে রাজার রাজা সম্রাট পঞ্চম জর্জও বিদ্রোহী ভারতের এই প্রতিনিধির করমর্দন করেছিলেন।

ভবিষ্যতের ইতিহাস-রচয়িতা একদিন হয়তো বলতে পারবেন, ভারতের মহাত্মা সেদিন ইংলণ্ডের ইতিহাসকেই স্পর্শ ক'রে এসেছিলেন কি না?

আলোচনার কি ফল হলো, কি হতে পারে, কি হবে, তার কিছুই তাঁর পক্ষে বুঝবার প্রয়োজন ছিল না। বুঝবার জন্যে চিন্তিতও ছিলেন না। স্বরাজ, জাতির মুক্তিকে এইখানে এসে উপহাররূপে লাভ ক'রে নিয়ে যাবেন, সে প্রত্যাশী হয়েও তিনি আসেননি। তিনি যা বুঝেছিলেন এবং সারা জীবন দিয়ে তাঁর স্বরাজ সাধনার অভিজ্ঞতায় যা বুঝে আসছিলেন, তা আরও বেশী ক'রে উপলব্ধি করলেন ফেরবার পথে। রোমের ভ্যাটিকানে সেণ্ট পল গির্জার অভ্যন্তরে ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের মূর্তির দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন। অশ্রুপ্লুত তাঁর দৃষ্টি। তিনি উপলব্ধি করলেন:

> "I saw there at once that nations like individuals could only be made through the agony of the Cross and in no other way."
>
> —আমি সেই দিকে তাকিয়ে তখুনি বুঝলাম যে, সত্যকারের মানুষ হতে হলে যেমন ক্রুশের বেদনার ভেতর দিয়েই হতে হয়, তেমনি সত্যিকারের জাতি হতে হলে সে জাতিকে ক্রুশের বেদনার ভেতর দিয়েই হতে হয়, এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, শূন্য হাতেই মহাত্মা ফিরে এলেন। কিন্তু জাতির জন্য তাঁর যে বৃহৎ উপলব্ধির সম্পদ অন্তরের ভেতরে তিনি নিয়ে এসেছেন, তা তখন প্রত্যক্ষ না হলেও কিছুকাল পরেই হলো। তাঁর সত্তা তো ক্রুশের বেদনার ভেতর দিয়েই তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল। জাতির সত্তাকে সেই পরম বেদনায় দীক্ষা দেবার জন্যেই তিনি প্রস্তুত হলেন। একটি দুটি জালিয়াঁওয়ালা নয়, শত জালিয়াঁওয়ালার মুখে জাতিকে ঠেলে দেবার জন্য তিনি আত্মবলিদানের এক পরম পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

উঠ জাগ মুসাফির

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ফিরে এসেই তিনি বড়লাট উইলিংডনের কাছ থেকে 'বড়দিনের উপহার' পেলেন—কতগুলি ঘটনা। পেশোয়ারে জনতার উপর প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ, নতুন অর্ডিন্যান্স এবং নেহরুর গ্রেপ্তার।

মহাত্মা আবার সত্যাগ্রহরূপে আইন অমান্য আন্দোলন আহ্বান করলেন। আবার য়েরোড়া কারাগার। এই কারাগারেই আম্রতরু ছায়ার নীচে একটি গৃহে একদিন সঙ্গীতধ্বনি শোনা যায়।

উঠ জাগ মুসাফির ভোর ভই
অব রৈণ কাঁহা যো সোবত হৈ ?
জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ
জো জাগত হৈ বহ পাবত হৈ।

হে পথিক ভোর হয়েছে, ওঠ জাগ, এখন রাত্রি কই যে শুয়ে রয়েছ ? যে ঘুমিয়ে থাকে সে হারায়, সে জাগে সে পায়।

এই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অনশন আরম্ভ হলো মহাত্মার, জাতীয় শুদ্ধির জন্য। কারণ জাতিকে যে জাগাবার প্রয়োজন হয়েছে, এখন শুয়ে থাকলে যে জাতির সত্তা হারিয়ে যাবে।

এমনি ক'রেই জাতিকে জাগাবার প্রয়োজন হয়েছিল সেদিন। যে জাতিকে স্বরাজ অর্জনের জন্য আত্মবলিদানের দীক্ষা দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন মহাত্মা, সেই জাতির আত্মশুদ্ধি তখনো হয়নি। অস্পৃশ্যতার পাপ জাতির সংসারে ঢুকে রয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাতিকে ভাগ ক'রে একটা নতুন শ্রেণীর তপশীল সৃষ্টি করলেন—ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারা। পৃথক নির্বাচন প্রথায় বর্ণহিন্দু ও অবর্ণ-হিন্দু নামে পৃথকভাবে দুটি সমাজ সৃষ্টির উদ্যোগ, অস্পৃশ্যতার পাপকেই চিরস্থায়ী ক'রে রাখা। তাই মহাত্মা ক্রুশের বেদনাকে আহ্বান করেছেন, জাতি নিজে উদ্যোগী হ'য়ে ভেদ দূর করুক, ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারাকে ব্যর্থ ক'রে দিক্।

তেইশ দিন অনশনের পর মহাত্মার জীবন সঙ্কটাপন্ন হলো। কিন্তু ক্রুশের বেদনা জাতিকে স্পর্শ করেছিল। দিকে দিকে যেন শত শত শিলাময় মহাকাল, মারুতী, মহাবীর, অম্বা ও নীলকণ্ঠেশ্বর সেই বেদনার স্পর্শে জাগ্রত হয়ে উঠলো। মুহূর্তে মুহূর্তে তারবার্তা আসে, শত শত মন্দির-দ্বার খুলে গেছে, হরিজনেরা দেববিগ্রহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। আর 'বর্ণহিন্দু' ও অ-বর্ণহিন্দু নেতারাও নিজেদের মধ্যে চুক্তি ক'রে ফেললেন। 'অনুন্নত' সমাজের নেতারা পৃথক নির্বাচনের দাবী ছেড়ে দিলেন, 'বর্ণহিন্দু' নেতারাও অনুন্নত সমাজের জন্য 'বিশেষ

সংরক্ষণের' ব্যবস্থা দিতে স্বীকার করলেন। গবর্ণমেণ্টও এই চুক্তি স্বীকার ক'রে নিলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই আম্রতরুর ছায়ার নীচেই আর একটি সুর শোনা গেল—জীবন যখন শুকায়ে যাবে, করুণাধারায় এস। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ গাইছেন গান, ক্রশের বেদনাস্নাত মহাত্মার কাছে। মহাত্মা অনশন শেষ করলেন।

করুণাধারায় এস

এর পর কয়টি বৎসর মহাত্মার কর্মধারা করুণাধারারূপেই জাতির জীবনে প্রবাহিত হয়ে গেল। হরিজনসেবার জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ভারতব্যাপী পরিব্রজ্যা আরম্ভ করলেন মহাত্মা। পল্লীময় ভারতের প্রাণ নূতন ক'রে সংগঠনের জন্য তিনি ব্রতী হলেন। ভারতের সাতলাখ-গ্রামের জীবন শ্রীহীন, তাই তো জাতির জীবন শুকিয়ে গেছে। দেশের গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক, তার দয়ার রূপটিও বৈদেশিক। জাতি চায় মাতৃভাষা, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা দেয় ইংরাজী ভাষা। গবর্ণমেণ্ট লেখাপড়া না শেখালে জাতি লেখাপড়া শেখে না। গবর্ণমেণ্ট রোগের ওষুধ না দিলে রোগ দূর করবার আর কোন উপায় জাতি জানে না। অন্ন-বস্ত্র সবই গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যিক করুণার ওপর নির্ভর ক'রে আছে এবং এই পরনির্ভর জীবন নিয়ে কি শুধু প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে, কবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসবে এবং সব অভাব ঘুচবে? তা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের দয়ার ওপর অন্ন-বস্ত্র-শিল্প সবই সঁপে দিয়ে জাতি যে বন্ধনে নিজেকে জড়িয়েছে, সেই বন্ধনে আবদ্ধ থেকে কি ক'রেই বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্ভব হবে? ক্ষণিকের সংগ্রামোচ্ছ্বাস হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালের সংগ্রাম হতে পারে না। যদি হঠাৎ স্বাধীনতা এসে যায়, তাতেই বা কি? স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দয়ার ওপরে সাত লক্ষ গ্রামের জীবন নির্ভর ক'রে থাকতে পারে না। সে নির্ভরতাও অধীনতা। স্বয়ংপূর্ণতা—স্বাবলম্বন, ভারতের গ্রামজীবনে এই নীতিকে সফল করার জন্য তিনি গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই কর্মধারার মধ্যে তাঁর প্রিয় হিন্দ্ স্বরাজেরই ছন্দ জেগে ওঠে। কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার, বনিয়াদী শিক্ষা, গ্রাম স্বাস্থ্য, গোসেবা, খাদি, রাষ্ট্রভাষা—জাতির দেহ ও প্রাণকে আত্মনির্ভর করার এক একটি উদ্যোগ। 'শান্ত বিপ্লবে'র উদ্যোগ। মহাত্মা জানতেন, ভারতের গ্রামের অভ্যুত্থানই জাতীয়

অভ্যুত্থান। এবং স্বরাজের জন্য বিরাট আত্মবলিদানের যে পরিকল্পনা তাঁর মনে প্রস্তুত হয়েছিল, মহাত্মা জানতেন সে আত্মবলিদানের সংগ্রাম গ্রাম-ভারতের দ্বারাই সম্ভব হবে।

জ্বালামুখীর আহ্বান

কয়েকটি ঘটনাবহুল বৎসর পার হতেই দেখা গেল, সেবাগ্রামে খাদি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একদিন এই বিরাট আত্মবলিদানের সংগ্রামে জাতিকে তিনি প্রস্তুতির ইঙ্গিত জানালেন।

"হিন্দুস্থান মে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটেগী। তুম লোগ উসকে সাক্ষী রহনা, ঔর জব বহ সমীপ আ জায় তো উস্‌মে কুদ পড়্‌না।"

—হিন্দুস্থানে ভয়ংকর জ্বালামুখী ফুটবে। তোমরাই তার সাক্ষী হবে। আর, যখন সে জ্বালামুখী নিকটে এগিয়ে আসবে, তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইঙ্গিত যখন জানালেন, তখন ১৯৪২ সালের জুন মাস, য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ 'স্বাধীনভাবে' ব্রিটিশকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সহায়তার মর্যাদা বুঝলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভারতবাসীর 'স্বাধীন' হওয়ার দাবীর মর্যাদা বুঝতে পারলেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে মহাত্মা ভারতের মনোভাব ঘোষণা করলেন—'কুইট ইণ্ডিয়া'। ভারতকে মন্ত্র দিলেন—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! "অন্ততঃ দশ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ দিবার জন্য তৈরী হও।" ৯ই আগষ্ট থেকেই ভারতে জ্বালামুখী ফুটে উঠলো। মহাত্মা বন্দী হয়ে চলে গেলেন আগা খাঁ প্রাসাদের অভ্যন্তরে, আর বন্দী কংগ্রেস নায়কবৃন্দ আমেদনগর দুর্গে।

আগষ্ট সংগ্রাম ভারতের গ্রামবাসীর সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ভারতকে শহীদ-ভূমিতে পরিণত করলো। পুলিশ আর সৈনিকের গুলীতে বিশ হাজার ভারতবাসী মৃত্যু বরণ করে।

আগা খাঁ প্রাসাদেই বন্দী মহাত্মার কোলে মাথা রেখে তাঁর বন্দিনী জীবন-সঙ্গিনী কস্তুরবাঈ শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিদায় নিলেন। এই আগা খাঁ প্রাসাদেই মহাত্মার প্রিয় সচিব মহাদেব দেশাই মহাত্মার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করলেন। এই

আগা খাঁ প্রাসাদে অবরুদ্ধ বন্দী মহাত্মা শুনলেন, মহাযুদ্ধের অভিশাপে জাতির সত্তা কী করুণ আর্তনাদ করছে—দুর্ভিক্ষ মুদ্রাস্ফীতি দুর্নীতি ও চোরাবাজার।

আগা খাঁ প্রাসাদের অভ্যন্তরে দুই প্রিয়জনের সমাধি রেখে মহাত্মা মুক্ত হলেন যখন, তখনো মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হয়নি। ভারতে একশো অর্ডিনান্সের শাসন চলেছে। মহাত্মা আবার তাঁর সেবাগ্রামকেই কর্মক্ষেত্র ক'রে যুদ্ধবিক্ষত দেশের অবসন্ন প্রাণ ও দেহ সংগঠনের জন্য তৈরী হলেন।

হিংসার কুজ্‌ঝটিকা

মহাযুদ্ধ শান্ত হতেই দেখা গেল যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের দাবী সম্পর্কে একটু স্পষ্ট ক'রেই কতগুলি নতুন কথা বলছেন। মহাত্মা তো শেষবারের মতই ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহারথীদের সম্মুখে গিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছেন। সেই কথার তাৎপর্য এতদিনে ঐতিহাসিক সত্যরূপে দেখা দিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদলই এলেন মহাত্মার কাছে, ভারতবাসীর হাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি ও ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করতে। এবং এসে তাঁরা দেখলেন, ভারতের মহাত্মা বসে রয়েছেন দিল্লীর এক ভাঙ্গি বস্তিতে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ উঠতে উঠতে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের একটা দাবী এইবার আরও জোরে ধ্বনিত হয়ে উঠলো—পাকিস্তানের দাবী। ভারতের মুসলমান সমাজের অধিকাংশ নিজেকে 'ভিন্ন-জাতি'-রূপে ঘোষণা করেছিলেন, সেইজন্য ভিন্ন ভূমিও দাবী করলেন। মহাত্মা ভারতের চিরকালের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দেহ দুই ভাগ করার চেষ্টার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু যাঁরা দেশ ভাগ করতে চাইছিলেন, তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ ধরলেন। এবং এর ফল যা হলো, ভারতের ইতিহাসে রাজনীতির নামে সেরকম বীভৎস নরবলির চর্চা কখনো হয়নি। এরকম যে হতে পারে, তাও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে দেখা দিল এই কলঙ্কের অধ্যায়, নিরীহ নরনারী ও শিশুকে হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ, পলিটিক্সের অনুশীলন হিসাবে।

দেশব্যাপী হিংসার সংঘর্ষ। আক্রান্ত নিরীহের আর্তনাদ, নিহতের শব, আহতের শোণিত—মহাশ্মশানের বীভৎসতা পুঞ্জীভূত হয়ে অহিংস সত্যাগ্রহীর সম্মুখে পরীক্ষারূপে দেখা দিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নামে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ

এক মহাপুরুষ চন্দনবাতাসের মত সুরভি বিস্তার ক'রে চললেন শ্মশানেরই পথে পথে। রাজনীতি নয়, তিনি উন্মত্তকে মনুষ্যনীতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। হিন্দুরাজ বা মুসলিমরাজের কথা নয়, তিনি রামরাজ আর খুদাই সলতনৎ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সত্যরূপী রামকে তিনি চিনেছিলেন। তিনি এখন রামাশ্রিত, রামময়, পরম নির্ভয়। তিনি বুঝলেন, নিজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দেবার ডাক এসে গেছে তাঁর জীবনে।

"রামকাজ কারণ তনুত্যাগী।
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী॥"

সত্যরূপী রামের কারণে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে লীন হয়ে যাবার জন্যই তাঁর অন্তর এইবার যেন পরম তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে। সে আকুলতা তিনি রোধ করতে পারছেন না।

তাই তাঁকে দেখা গেল নোয়াখালির শ্মশানে শিবরূপে। তাঁকে দেখা গেল কলকাতার বেলিয়াঘাটায় নীলকণ্ঠরূপে, সকল গরল নিজে আহরণ ক'রে নিচ্ছেন জাতিকে নির্বিষ করার জন্য।

এরই মধ্যে দেশ খণ্ডিত হয়েছে এবং স্বাধীন হয়ে গেছে, সারা দেশে উৎসবের প্রমত্ততা। কিন্তু যিনি দেশকে স্বাধীন করলেন তিনি এই উৎসবের আসর থেকে বহুদূরে, বেলিয়াঘাটার এক গৃহকোণে উপবাস ক'রে আর সুতো কেটে ব্রত পালন করলেন।

ভারত স্বাধীন, পাকিস্তান স্বাধীন, কিন্তু তবু হিংসার সংঘর্ষ ক্ষান্ত হয় না।

পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও সিন্ধুতে মুসলমানের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দু-শিখ চলে আসছে ভারতে। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় প্রতিহিংসারূপে দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবে। আবার ভারতের এই প্রতিহিংসার ঘটনা গিয়ে প্রতিঘাত করে পাকিস্তানের ওপর, অতি-প্রতিহিংসা দেখা দেয়। এইভাবে হিংসা-প্রতিহিংসার অবিরাম আনা-গোনা চলছে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। এই হলো ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের রূপ।

বিষবাষ্পের কুজ্ঝটিকা জাতির চিত্ত গ্রাস ক'রে ফেলবার জন্য উদ্যত হয়েছে। এমন কে শক্তিমান যোদ্ধা আছেন পৃথিবীতে, যাঁর ভাস্বর শৌর্য এই কুজ্ঝটিকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে?

পাঞ্জাবে বিশ হাজার অস্ত্রধারী প্রান্তরক্ষী সৈনিক দিয়ে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়নি। কিন্তু কলকাতার এক বৎসরব্যাপী অশান্তি ও পুঞ্জীভূত হিংসাকে প্রতিরোধ ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন এক কৌপীনবস্ত মহাক্ষত্রিয়—মহাত্মা গান্ধী। সৈনিক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও এই শক্তিমানের স্বরূপ দেখে এই সত্য স্বীকার করলেন—মহাত্মা একাই একটি প্রান্তরক্ষী বাহিনী ('one-man boundary force')। কোন্ শক্তি দিয়ে এই পরমশান্ত মানুষ লক্ষ হিংসার যূথবদ্ধ পরাক্রমকে স্তব্ধ করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া রণক্ষেত্রের অধ্যক্ষ বোধ হয় তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

সোমং লোকং প্রভাসেতি

কলকাতাকে শান্ত ক'রে, কলকাতার কাছ থেকে শান্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহাত্মা দিল্লীতে এলেন। দিল্লীকে শান্ত ক'রে তারপর পাকিস্তানে যাবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। দিল্লীর সান্ধ্য বাতাসকে তিনি দিনের পর দিন প্রার্থনা দিয়ে শুদ্ধ ও শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দিল্লী শান্ত হলো না।

তাই দিল্লীর মনুষ্যত্বের কাছে মহাত্মা চরম আবেদন জানালেন, আবার ক্রুশের বেদনা আহ্বান করলেন, অনশন আরম্ভ করলেন। দিল্লীর মুসলমান ও মুসলিম ধর্মস্থান নিরাপদে থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করবেন না, এই ছিল মহাত্মার সংকল্প। ক্রুশবিদ্ধ মানবতার বেদনা দিল্লীর মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করলো। দিল্লী শান্ত হলো। দিল্লীর কাছে শান্তির প্রতিশ্রুতিও পেলেন মহাত্মা।

যেখানে পাঁচ দিন আগে মনে হয়েছিল, বিষবাষ্পের কুজ্ঝটিকাই বুঝি সত্য, সেখানে দেখা গেল যে মহাত্মাই সত্য। সোমং লোকং প্রভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো ব চন্দিমা—তিনি অভ্রমুক্ত চন্দ্রের মত পৃথিবীকে প্রভাসিত করেন। যেখানে মনে হয়েছিল মূঢ় ঐরাবতের অটলতা সত্য, সেখানে দেখা গেল যে গঙ্গার প্রবাহই সত্য।

দেশ ও জাতি বৈদেশিকের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু আর এক ভয়ংকর ভ্রান্তির অধীনতা বরণ করতে চলেছে, যার নাম আত্মদ্রোহ। মহাত্মার জীবনে তাই তাঁর সত্যাগ্রহের নবপর্যায় স্থরু হয়েছে। কলকাতায় তিনি জয়ী হয়েছেন, দিল্লীতেও তাঁর প্রয়াস জয়যুক্ত হলো। তাঁর শান্তির অভিযাত্রার পথে

পথে এক একটি জয়তোরণ রচিত হয়ে চলেছে। উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ—আত্মার বলে আত্মাকে টেনে তোল, আত্মাকে অবসন্ন হতে দিও না। আত্মদ্রোহের বিভীষিকার মধ্যে মহাত্মা জাতির আত্মাকে সকল অবসাদ থেকে টেনে তুলে চলেছেন।

অমৃতপথ

মধ্যভারতে আজও একটি শিলাস্তম্ভ দেখা যায়, দু'হাজার বছর থেকে এই স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এই স্তম্ভের বেদিকায় উৎকীর্ণ লিপিতে একটি বাণী আজও আছে, দু'হাজার শীত, রৌদ্র ও বরষায় মুছে যায়নি।

ত্রীণি অমৃতপদানি অনুঠিতানি
নয়ন্তি সঙ্গ দম চ্চাগ অপ্রমাদ

—তিনটি অমৃতপথ আছে, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদ, যে পথে এগিয়ে গেলে মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণব গ্রীক হেলিয়োডোরাস্ এই স্তম্ভ রচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পৌঁছে গান্ধী নামে এক পথিকের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আরও বেশী ক'রে বুঝতে পারা যায় যে, সে বাণী ক্ষয় হবার নয়। দিল্লীর বিড়লা ভবন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় যে মহাত্মা প্রার্থনাসভায় আসেন, তিনিই তো এই অমৃতপথের যাত্রী, দম ত্যাগ ও অপ্রমাদে যাঁর জীবন পরিশুদ্ধ হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ভারতবর্ষ—স্বাধীন রাষ্ট্র। বিধ্বস্ত সোমনাথের মন্দির নতুন ক'রে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ তার অক্ষয় বোধিবটের একটি সজীব চারা স্বাধীন বর্মাকে উপহার পাঠিয়েছে, মাত্র কিছুদিন আগে। সেদিন ৩০শে জানুয়ারী, প্রতিদিনের মত সেদিনও সন্ধ্যায় মহাত্মা চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে।

যিনি চলেছেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁকে চেনে। জন্মান্ধ যাঁকে 'দেখবার' আশায় পথের ধারে এসে দাঁড়ায়। সীমান্তের পাঠানেরা যাঁকে বলে—মালাঙ্গ বাবা, মিশরবাসী যাঁকে বলে—অল্ মহাত্মা গান্ধী, ভারতবর্ষ যাঁকে বলে—বাপু, তিনি চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে।

যিনি জীবনে আঠার বার অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন—নিজ চিত্তশুদ্ধির জন্য, সহকর্মী আশ্রমবাসীর চিত্তশুদ্ধির জন্য, ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, দেশীয় রাজ্যের প্রজার অধিকারের জন্য, অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য—তিনিই চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে।

যিনি জীবনে সতর বার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আট বার কারারুদ্ধ হয়েছেন, মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রামের অপরাধে, যিনি আঠার বার সত্যাগ্রহীরূপে গণ-সংগ্রাম করেছেন, যাঁর জীবন আত্মশুদ্ধি ও আত্মেন্দ্রিয় জয়ের এক সুদীর্ঘ ও ব্রতময় নিরবচ্ছিন্ন সত্যাগ্রহ, যিনি জাতিকে স্বরাজের পতাকা দিয়েছেন, হিন্দ্ স্বরাজের পথ দেখিয়েছেন এবং রামরাজের স্বপ্ন দিয়েছেন—যিনি জাতির চিত্তে একটি রঙ উপহার দিয়েছেন, খাদির শুদ্ধ শ্বেত, যে রঙে নব রঙ মিশে আছে—সত্যই যাঁর একমাত্র ঈশ্বর, যিনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে নীতির দীক্ষা দিয়েছেন, তিনিই চলেছেন প্রার্থনাভূমির দিকে। একটি ধূমহীন প্রদীপশিখার মত শান্ত ও উজ্জ্বল তার রশ্মি।

প্রার্থনামঞ্চের কাছে এসে জনতার দিকে তাকিয়ে মহাত্মার মূর্তি সুস্মিত হয়ে উঠলো। অভিবাদনের জন্য দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

সেই নমস্কারকেই চরম ক'রে তিনি রেখে দিয়ে গেলেন। হে রাম! দুটি শব্দ উচ্চারণ ক'রে মহাত্মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। স্বাধীন ভারতের রাজধানীর মাটী স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতার শোণিতে রঙীন হয়ে উঠলো, ঘাতক তখন তার কাজ শেষ ক'রে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পোরবন্দর থেকে যমুনার রাজঘাট, উন-আশি বছরের পথ। চন্দনকাঠের চিতার প্রথম শিখা জানিয়ে দিল, অমৃতপথযাত্রীর একটি পরিক্রমা শেষ হলো। জাতির বাপু, বিশ্ববন্দ্য মহাত্মা প্রত্যক্ষের বাইরে চলে গেলেন। যাবার আগে কি বাণী তিনি দিয়ে গেলেন পৃথিবীকে? "আমার জীবনই আমার বাণী"।

রামরাজের আদর্শ

মহাত্মা গান্ধী বার বার বলতেন যে তিনি বামবাজেব প্রতিষ্ঠা দেখতে চান। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সাবা পৃথিবীতেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক্ এই ছিল তাঁর কামনা।

রামচন্দ্র নামে সত্যিই কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা, মহাত্মা গান্ধীব কাছে এটা কোন প্রশ্ন বা বিচার্য বিষয় ছিল না। সত্যিই বামবাজ নামে একটা আদর্শ রাজ্য কোন কালে পৃথিবীতে ছিল কিংবা ছিল না, এই তথ্যও মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাঁব যুক্তিব ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়নি। পুরাণবর্ণিত বাজা রামচন্দ্রের যে সব কীর্তিকলাপ শোনা যায়, তাই দিয়েও তিনি তাঁর রাম বা রাম-রাজের রূপ কল্পনা করেন নি।

বাল্মীকির রাম তপস্যারত শূদ্র শম্বুকের শির ছেদন কবেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তাঁর রাম কখনো কাউকে হত্যা করতে পারে না। সদা সুবিনীত করুণাঘন শ্রীরামের যে চরিত্র রামায়ণে পাওয়া যায়, সেই রাম, সেই একই ব্যক্তি কি এমন অরামোচিত কাজ করতে পারে?

কাজেই, 'রাম' কথাটি গান্ধীজীর কাছে কতকগুলি নীতির প্রতীক শব্দ মাত্র।

"আমি রাম অর্থে বুঝি 'সত্য', সত্যেরই নাম হলো রাম।"—হরিজন পত্রিকা (১৮।৩।৩৯)

গান্ধীজী পৃথিবীতে যে সুস্থ সুন্দব শোকহীন ও নির্ভয় রাজ্যের আবির্ভাব দেখতে চান, তাকেই তিনি রামরাজ আখ্যা দিয়েছেন।

এই রামরাজই গান্ধীজীর আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবময় সংজ্ঞা। রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির যে-সব তত্ত্বকে তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের সেবা সংগ্রাম ও সংগঠনের মধ্যে পেয়েছিলেন বা সত্য বলে বুঝতে পেরেছিলেন, তারই ওপর

প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের বাস্তব রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন। এই হলো তাঁর রামরাজ।

পুরাণবর্ণিত স্বর্গরাজ্যের কথা আমরা শুনেছি, যেখানে সকলেই অনন্তযৌবন, অমর ও অমৃতপানে বিভোর। সেখানে কামধেনু আছে, কল্পতরু আছে। এই স্বর্গরাজ্য নিছক কল্পনার ব্যসন, বাস্তবোচিত রীতি নীতি ও যুক্তির সঙ্গে এই কল্পনার কোন সামঞ্জস্য নেই।

গান্ধীজীর 'রামরাজ' এই পৃথিবীর মানুষেরই যুক্তি বুদ্ধি শ্রম ও মমতা দিয়ে তৈরী মানুষের সমাজ। এই রামরাজেরই অপর নাম তিনি দিয়েছেন খুদাই সলতনৎ বা ভগবানের রাজ্য। সারা পৃথিবীতে খুদাই সলতনৎ প্রতিষ্ঠিত হোক্, মহাত্মা গান্ধী এই কথাই বলতেন।

সুতরাং রামরাজ বলতে কোনরকম 'হিন্দুরাজ্য' বোঝায় না। বাল্মীকির রামায়ণবর্ণিত অযোধ্যা রাজ্যটিও বোঝায় না। গান্ধীজীর মতে, রামরাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ অতীতের কোন পুরাণবর্ণিত আদর্শেব দিকে ফিরে যাওযা নয়। রামবাজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটা হলো ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম।

> "রামরাজ অর্থে আমি হিন্দুরাজ বুঝি না, রামরাজ অর্থ ভগবানের রাজ্য……আমার কাছে, সত্য ও সন্নীতি ছাড়া আর কোন ভগবান নেই। ……রামরাজ নামে এই প্রাচীন আদর্শটি যে প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই।"—ইয়ং ইণ্ডিযা (১৯।৯।২০)

স্বরাজ কথাটির মধ্যেই গান্ধীজী তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। এই স্বরাজই হলো রামরাজ। ব্যক্তিজীবনে স্বরাজ, সামাজিক জীবনে স্বরাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনে স্বরাজ—সব মিলিয়ে রামরাজ।

গান্ধীজী তাঁর শত শত ভাষণে লেখায় বক্তৃতায় ও বাণীতে তাঁর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পবিকল্পনার সূত্রগুলি প্রকাশ করেছেন। এই সব সূত্রের ব্যাখ্যা বিস্তার ও ভাষ্য করলে গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংহিতা রচিত হতে পারে। শ্রীমননারায়ণ আগরওয়াল গান্ধীবর্ণিত রাষ্ট্রের ও শাসনতন্ত্রের রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও অনেকে করেছেন। এসব হলো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংহিতা। সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে, ঘটনাক্রম সাজিয়ে, ইতিহাসের নজীর তুলে, গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিচয় পরিবেশন।

তুলসীদাসের রামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ডে রামরাজ বর্ণনা আছে, কবির কল্পিত রামরাজ। গান্ধীজী তুলসীদাস-বর্ণিত এই রামরাজকে খুবই ভালবাসতেন। কারণ, এর মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবময় রূপটি পাওয়া যায়। কবির কল্পনা হলেও রামচরিত মানসের এই অধ্যায়টি বাস্তবোচিত আদর্শের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। গান্ধীবর্ণিত অর্থনীতি ও সমাজনীতির বহু সূত্র যুক্তি ও ব্যাখ্যার মধ্যে যে সত্যকে তত্ত্বরূপে আমরা পেয়ে থাকি, তুলসী রামায়ণের এই বর্ণনাটির মধ্যে তারই একটি কাব্যময় রূপ আমরা পাই।

রাম রাজ বৈঠে ত্রিলোকা, হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।
বয়রু না কর কাহু সন কোঈ, রামপ্রতাপ বিষমতা খোঈ

'রাম যখন রাজপাটে বসলেন, তখন তিন লোকে সর্বত্র শোক দূর হয়ে গিয়ে আনন্দের আবির্ভাব হলো। রাম-প্রতাপে সব বৈষম্য বা ছোট-বড় ভেদ দূর হয়ে গেল, কার সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না।'

রাম-প্রতাপের যে সংজ্ঞা বা পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে, গান্ধীজীর আদর্শ রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার রূপ ও রীতি তাই হওয়া উচিত। রাম-প্রতাপ সত্যিই 'প্রতাপ' (Force) নয়। প্রজার ভয়জনিত বাধ্যতার ওপর এই প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদ ও বৈষম্য গায়ের জোরে চালু ক'রে রাখার জন্য রাম-প্রতাপ নয়। শোকহীন ও আনন্দপ্রবণ প্রজাসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আস্থার ওপর রাম-প্রতাপের ভিত্তি।

দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা।
রামরাজ নহিঁ কাহুকি ব্যাপা।

রামরাজে কোন ব্যক্তির দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক দুঃখ নেই। রাষ্ট্র এখানে একমাত্র রক্ষার ধর্মে দীক্ষিত। প্রজাকে সকলপ্রকার ঐহিক দুঃখ হতে রক্ষা করাই আদর্শ রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নীতি। প্রজার জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য প্রজা নয়। রাষ্ট্রের হাতে সেইটুকু ক্ষমতা থাকবে যতটুকু ক্ষমতা প্রজাকে আপদ হতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন।

অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা, সব সুন্দর বিরুজ সরীরা।
নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা, নহি কোউ অবুধ লচ্ছন হীনা।

রামরাজ্যে অকালমৃত্যু কাউকে ব্যথিত করে না। সকলেই নীরোগ ও সুন্দর-শরীর। দীন দুঃখী ও দরিদ্রও কেউ নেই। অজ্ঞান ও অলক্ষণেও কেউ নেই।

রাষ্ট্র কতখানি উন্নত, তা নিরূপণ করার একটা প্রথা হচ্ছে, রাষ্ট্রের জনসাধারণের আয়ুষ্কালের পরিমাণ বিচার। যে দেশে লোক অকালে মরে, বুঝতে হবে সেদেশে সুরাজনীতি নেই, সার্থক রাজকতাও নেই ; সে দেশ রাষ্ট্র হিসাবে দুর্বল ও ব্যর্থ। তাই রামরাজ্য নামে যে আদর্শরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গান্ধীজী করেছেন, তাতে মানুষের জীবনকে এমন ভাবে লালিত করবার ব্যবস্থা থাকবে যার ফলে কারও অকালমৃত্যু সম্ভব হবে না। গান্ধীজী ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সংকল্প করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, যদি জীবন যাপনের প্রণালী শুদ্ধ নীতি এবং অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে মানুষ ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তাঁর মতে মানুষের স্বাভাবিক আয়ুই হলো ১২৫ বৎসর, কিন্তু জন্মগত এই দীর্ঘায়ুর সম্পদকে মানুষ তার নিজেরই মূঢ়তার জন্য অপব্যবহারে অকালে জীর্ণ করে দেয়। পার্থিব জীবন একটা অভিশাপ নয়, প্রাণ নামক এক বিজ্ঞানময় রহস্য পৃথিবীতে একটা লীলা রূপে প্রকাশিত। প্রাণকে দেখতে পাওয়া যায় না, প্রাণের লীলাই প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ এবং এই প্রাণলীলাই হলো জীবন। শিশুমৃত্যু, তরুণের মৃত্যু, অন্তঃসত্বা নারীর মৃত্যু—এই সবই প্রাণের বিরাট অপচয়। এমন রাজ্যকে শোকের রাজ্যই বলা উচিত, এবং যে রাজ্যের প্রজা শোক বেদনায় পীড়িত, সে রাজ্য থেকেই বা লাভ কি ?

রামরাজ্যে এই শোক নেই। শুধু তাই নয়, রামরাজ্যে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য শিক্ষা ইত্যাদি যে সম্পদ, তা কোন দলগত বা শ্রেণীগত অধিকার নয়। সর্ব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা—সকল সত্তা সেখানে সুখী। সেখানে সকলেই নীরোগ, জ্ঞানী ও সুলক্ষণ এবং সুন্দর। দীন ও দরিদ্র নামে বিত্তহীন কোন সমাজ নেই। এই অধিকার-সাম্যই হলো রামরাজ্যের ভিত্তি।

রামরাজ্যের এই কাব্যিক বর্ণনা বিশ্লেষণ করে যে রাজনৈতিক তাৎপর্য পাওয়া যায় তার প্রধান কয়টি সূত্র হলো : (১) বিত্তসাম্য (২) অধিকারসাম্য (৩) ভোগ-সাম্য ও (৪) বোধসাম্য।

রামরাজ্যে কেউ কুরূপ ও অলক্ষুণে নেই, এর সরল অর্থ হলো—মানুষের মনের রূপ-বোধ ও সুলক্ষণ-বোধ এমন হবে না যার ফলে কেউ কাউকে তুলনা করে রূপহীন বা অলক্ষুণে ব'লে মনে করবে। বর্তমান যুগে শ্বেতাঙ্গ প্রতাপে শাসিত পৃথিবীর সর্বত্র বর্ণবিদ্বেষ নামে একটা প্রবল কুসংস্কার রয়েছে। এটা পুরাতন

আর্যামিরও একটা সংস্কার। আর্যেরা কৃষ্ণকায় মানুষকে হীনচক্ষে দেখতেন এবং দস্যু আখ্যা দিতেন। গায়ের রংটা সাদা হলেই সুন্দর, চোখ নীল হলেই সুন্দর—এই সব রূপবোধের সংস্কার থেকেই মানুষের মনে বর্ণবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছে, তার ফলে ভারতের আদিবাসী থেকে সুরু ক'রে আফ্রিকার নিগ্রো পর্যন্ত কৃষ্ণকায় মানুষের সমাজ পীড়িত ঘৃণিত ও অত্যাচারিত হয়েছে। সাধারণ অল্পগৌর বর্ণের ভারতবাসী সংস্কৃতিবান হয়েও য়ুরোপীয় শ্বেতকায়ের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীই মানুষের এই বহু শতাব্দীপুষ্ট এক ভয়ানক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করেন।

রামরাজ্যে সকলেই সুন্দর, সেখানে এই বর্ণবিদ্বেষ নেই, রূপ সম্বন্ধে কোন হীন সংস্কার নেই, কেউ কাউকে কুরূপ ব'লে মনে করে না।

সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী, নর অরু নারি চতুর গুণী
সব গুণজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী, সব কৃতজ্ঞ নহি কপট সয়ানী

রামরাজ্যে সকলেই দম্ভশূন্য ও ধর্মরত। সকলেই গুণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী। সকলেই কৃতজ্ঞ। কপটতা করার কেউ ছিল না।

বিদ্বেষহীন ভেদহীন ও বৈষম্যহীন সমাজের এই হলো রূপ। সাধারণ মানুষ মনোবলে ও নীতিবলে কতখানি উন্নত, তাই হলো রাষ্ট্রের নৈতিক মহত্ত্বের পরিমাণ। জ্ঞান এখানে কোন অ্যাকাডেমি, ইউনিভার্সিটি বা মহামহোপাধ্যায় সমাজের একচেটিয়া সম্পদ নয়। পণ্ডিত নামে বিশেষ ক'রে কোন শিক্ষিত সমাজ নেই, কারণ সমাজের সকলেই শিক্ষিত। বুদ্ধিবৃত্তিও কারও ঘরোয়া বা বংশগত অধিকার নয়, সকলেই চতুর। এই জ্ঞানসাম্য ও বিদ্যাসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ, সেখানে কারও মনে দম্ভ আসতে পারে না। সমাজের এক অংশ বিদ্যাহীন হয়ে থাকলেই, বিদ্বান সমাজে দম্ভ হয়ে থাকে। রামরাজ্যে সেটা সম্ভব নয়। এই কারণে কারও পক্ষে কপটতা করাও প্রয়োজন হয় না। কারণ, আত্মসাৎ করার কোন ব্যবস্থা বা উপায় নেই, কারণ তাতে কারও কোন লাভ হয় না। এখানে কেউ রিক্ত এবং কেউ অতিরিক্ত, এমন প্রভেদের অস্তিত্ব নেই।

এ তো গেল রামরাজ্যে প্রজাসাধারণের অধিকারের কথা। সমানাধিকারের নীতির দ্বারাই রামরাজ্য নামে আদর্শ রাষ্ট্র চলছে। কিন্তু শুধুই কি সমানাধিকার-

তন্ত্রের ওপর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত? না, তা নয়। রামরাজ্যের আর একটি সমাজনীতি আছে।

সব উদার সব পর উপকারী
* * * *
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতি

এখানে সকলেই উদার ও পরোপকারী। সকল মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব রেখে চলে থাকে।

সুতরাং, শুধু অধিকারসাম্যের ওপর নয়, কর্তব্যসাম্যের ওপর রামরাজ নামে আদর্শরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজীর মতে কর্তব্যবাদই হলো প্রথম নীতি, অধিকাব-বাদ পরে। পরকে যে উপকার করে না, পরের কাছ থেকে উপকার পাবার জন্য সে কি দাবী করতে পারে? রাষ্ট্র বা সমাজ এমন কোন বস্তু নয়, যার কাছ থেকে মানুষ শুধু তার দাবী আদায় করতে থাকবে। রাষ্ট্রের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করাই তার প্রথম নাগরিক কর্তব্য, এবং এই সার্থক কর্তব্য থেকেই স্বাভাবিক ভাবে তার অধিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। গ্রীসীয় নাগরিক অধিকারের আদর্শ ও বর্তমান যুরোপের নাগরিক আদর্শের সংজ্ঞা থেকে গান্ধীজীর নাগরিক আদর্শের সংজ্ঞা এইখানে পৃথক্।

সূর্য পৃথিবীর জল শোষণ ক'রে উর্ধ্বে নিয়ে যায়। সূর্যেব এই অধিকারে আপত্তি করি না, কারণ সূর্যই আবার ছায়াময় মেঘের উপহার দিয়ে পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। পৃথিবীর প্রতি এই জলবর্ষণরূপ কর্তব্য পালন করে ব'লেই সূর্যের জলশোষণের অধিকার আদৌ শোষণের ব্যাপার নয়। বলা যায়, বর্ষণের কর্তব্যের ওপরেই সূর্যের শোষণ করার দাবী প্রতিষ্ঠিত। রামরাজ্যের বা আদর্শরাষ্ট্রেব নাগরিকতার এই নীতি—কর্তব্য দ্বারা অধিকার অর্জন করা। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, কর্তব্য এবং সেবা করবার জন্যেই অধিকার অর্জন করা। এক্ষেত্রে অধিকারবাদ গৌণ ব্যাপার, নাগরিকতার মুখ্য নীতি হলো সেবা এবং কর্তব্য।

আদর্শরাষ্ট্র বা রামরাজ্যে নরনারীর সম্পর্কও কি রকম হবে, তুলসী রামায়ণে তার পরিচয় আছে।

রাম ভগতি সব নরনারী
সকল পরম গতি কে অধিকারী

নর ও নারীর মধ্যে অধিকারভেদ নেই। বর্তমান যুগে নারীসমাজের অধিকার পৌরুষের রূঢ়তার দ্বারা কুণ্ঠিত ও দুর্বল হয়ে আছে। তাই সাফ্রেজিস্ট আন্দোলন প্রয়োজন হয়, আইন ক'রে নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নারীসমাজের অধিকার সংকোচ বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ দুর্বল ও অনগ্রসর রাষ্ট্রের লক্ষণ। রামরাজ্যে নর ও নারী উভয়েই সমান ভাবে পরমগতির অধিকারী। নারীত্ব কোন অপরাধ নয়। নারীর জীবন পুরুষের জীবনের মতই সকল সত্যের অনুশীলনে মহিমময় পরিণতি লাভের যোগ্য।

আর একটা কথা :

'এক নারী ব্রত রত নর ঝারী।'

রামরাজ্যে সকল পুরুষ একনারীব্রত পালন করে। আদর্শরাষ্ট্রে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। 'মনোগেমি' বা একবিবাহ নামে একটা সামাজিক নীতিকে প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্র আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহের অধিকার বস্তুতঃ নারীসমাজকে অপমান করার অধিকার মাত্র। রামরাজ্যে এই ঘৃণ্য প্রথা থাকতে পারে না।

দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্য সমাজ
জিতহু মনহিঁ অন স্থনিয় জগ রামচন্দ্র কে রাজ ॥

রামরাজ্যে রাজার হাত থেকে দণ্ডনীতি চলে গেছে। ভেদনীতির ব্যাপারটা শুধু নর্তকসমাজ তামাসা করার জন্য অভিনয় করতো। সেখানে জয় করার আর কাজ নেই, শুধু মন জয় করার কাজ রয়েছে, সেই হলো রামরাজ।

রামরাজ বা আদর্শরাষ্ট্র প্রতাপের (Force) ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রামরাজ্য কোন পুলিশী রাষ্ট্র নয়। এখানে পীনাল কোডের প্রয়োজন হয় না। ভেদনীতির ('divide et empera') কোন প্রয়োজন নেই। জয় করার আবেগে মুলুকগিরি বা মিলিটারিজ্‌ম নেই।

গান্ধীজী আদর্শরাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তার পরিচয় তাঁরই একটি উক্তি থেকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

"জাতির সমাজজীবন সত্যই যদি এমন নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় যে সমাজের সকলে নিজের শক্তিতে নিজেকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে জাতির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে শাসকমণ্ডলী গঠনের প্রয়োজন হয় না। এমন রাষ্ট্রকে বলা যায়

সুনীতিনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার ('enlightened anarchy') রাষ্ট্র। ব্যক্তি এমনভাবে নিজেকে শাসন করবে যে সে তার প্রতিবেশীর জীবনের কোন অধিকারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে উঠবে না। সুতরাং, পরিকল্পিত এই চরমোন্নত আদর্শরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশেষ কোন জনসংসদ থাকবে না, কারণ সত্যি ক'রে 'রাষ্ট্র' বলে কিছু এখানে নেই। কিন্তু এইরকম একটা পরিকল্পিত পূর্ণ-আদর্শকে তো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই কারণেই থোরোর সেই উক্তিটি ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে—'যে গবর্ণমেণ্ট সব চেয়ে কম শাসন করে, সেই গবর্ণমেণ্টই হলো সব চেয়ে ভাল শাসক।'*

এই আদর্শরাষ্ট্র বা রামরাজের সঙ্গে ক্রপটকিনের ব্যাখ্যাত আনার্কি (Anarchy) আদর্শের কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূলে মস্ত বড় একটা পার্থক্য আছে। ক্রপটকিনের মতে রাষ্ট্রহীন সমাজই হলো আদর্শ সমাজ।

গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনা অহিংস সমাজব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা রাজার হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় না। শাসন ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত। গান্ধীজী যে অহিংস পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের কথা বলেছিলেন, সেটা শুধু নীতিগত শুদ্ধতার দিক দিয়েই আদর্শ পদ্ধতি নয়। তার আর একটা প্রধান যুক্তি আছে। গান্ধীজী বলেন, সহিংস সংগ্রাম বা বিপ্লবের ভেতর দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা হয়, সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ঠিক জনসাধারণের হাতে আসে না, একটি দলবিশেষের হাতে চলে যায়। অহিংস সংগ্রামের সপক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হলো, এর দ্বারা অর্জিত ক্ষমতা আপনা হতে জনসাধারণের হাতে এসে পড়ে।

রামরাজ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘাত নেই, কাজেই ভেদনীতির প্রয়োজন হয় না। পররাজ্য জয় করার কোন প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিমানবের (Individual') শক্তি সামর্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী রুচি ও জীবনযাপন প্রণালী এমন ভাবে দ্বেষহীন ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে দণ্ডবিধানের জন্য রাজা বা রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ ক্ষমতা দেবার প্রয়োজন হয় না। একটা স্বয়ংচালিত সমাজ। আইনের জোরে বা সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির জোরে নয়, জনসাধারণের স্বীকৃতির দ্বারা চালিত সমাজব্যবস্থা। প্রজা এখানে রাজার

* "That Government is best which governs the least."—Thareau

দণ্ডনীতির ভয়ে শুধু 'আইনসঙ্গত' জীবনযাপন করে না, সমাজের প্রতি কর্তব্য-বোধের প্রেরণায় 'নীতিসঙ্গত' জীবনযাপন করে।

এই তো সেই রামরাজ, আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র, যা গান্ধীজীর হিন্দ্ স্বরাজ, তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ। এই সমাজের গঠন বিকেন্দ্রীকৃত (Decentralised) রূপে ব্যবস্থিত, কর্তব্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ংচালিত জনসাধারণের অধিকারসাম্য ও ভোগসাম্যে সুগ্রথিত। শ্রেণীভেদ নেই, বর্ণবিদ্বেষ নেই। নির্ভয় শোকহীন রাজ্য।

অহিংস রামরাজ্যের অযোধ্যা বর্তমান কলকাতা বোম্বাই নিউইয়র্ক লণ্ডনের মত ধনী ও নির্ধনের উপনিবেশ নয়, শোষক ও শোষিতের নগরী নয়। রামরাজ্যের অযোধ্যার প্রতি কুটিরে মণিময় প্রদীপ জ্বলতে থাকে।

"গৃহ গৃহ মণিদীপ বিরাজহি"

রামরাজ্যের মিউনিসিপালিটি বস্তী সৃষ্টি করে না। ক্লেদ পুরীষ ও আবর্জনা এখানে নিশ্চিহ্ন।

"রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর"

রামরাজ্যে মজা নদীর পঙ্কিলতা নেই। রামরাজ্যের নদী প্রজার সুখস্রোতের প্রবাহিণী মাত্র।

"উত্তর দিসি সরযূ বহ নির্মলজল গম্ভীর
বাঁধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহিঁ তীর ॥"

উত্তর দিকে নির্মল জলশায়ী গভীর সরযূ নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মনোহর বাঁধা ঘাট রয়েছে, নদীর কিনারায় এতটুকুও কাদা নেই।

"চারু চিত্র সালা গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই"

প্রত্যেক গৃহেই সুন্দর চিত্রশালা সাজান ছিল। রামরাজ্যের আর্ট ও কাল্‌চার বিশেষ শ্রেণীর উপভোগ্য সম্পদ নয়। গৃহে গৃহে বিরাজিত আর্ট, প্রজাসাধারণের জীবন শিল্পময়।

"সুমল বাটিকা সবহিঁ লগাঈ
বিবিধ ভাতি করি জতন বনাঈ"

রামরাজ্যে সকলেই যত্ন করে বিবিধ পুষ্পের উদ্যান রচনা করেন। এই বর্ণাঢ্য ও সুরভিত জীবনই রামরাজ্যের প্রজাসাধারণের জীবন। কাব্য এখানে

টেক্সট্‌-বুক রূপে প্রচলিত নয়, রূপ রস সৌরভ ও বর্ণময় এক পরম প্রীতি জনতার জীবন মণ্ডিত ক'রে রেখেছে।

রামরাজ্যের বাজারই বা কিরকম?

"বাজার চারু ন বনই বরণত
বস্তু বিনু গথ পাইয়ে"

বাজারের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, সেখানে বিনামূল্যে বস্তু পাওয়া যায়। এ কেমন করে সম্ভব?

"জহঁ ভূপ রমানিবাস তহঁ কী সম্পদা কিমি গাইয়ে"

যেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীপতিই রাজা সেখানে সম্পদের (বা মূল্যের) কথা কি করে বলা যায়? রামরাজ্যে বা আদর্শ রাষ্ট্রে টাকা নামক বস্তুটির মূল্য কতটুকু? যেখানে ফাট্‌কা চলে না, সুদখোর মহাজনী চলে না, উৎপাদকের শ্রমগত মূল্যকে যেখানে প্রবঞ্চনা করার প্রয়োজন নেই, সেখানে টাকা নিজে নিয়ন্তা নয়। টাকার অধিকার এখানে খর্বিত, মুনাফা নামক ব্যাপারটি এখানে চলবে কি করে? রামরাজ্যে লক্ষ্মীপতিই হলেন সকল ধনের একমাত্র অধিকারী। এখানে—'সবহি ভূম গোপালকা'—সব ভূমি গোপালের। সুতরাং এখানে মহাজন ও জমিদারের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হবে? রামরাজ্যে ক্যাপিটাল আছে, কিন্তু ক্যাপিটালিজ্‌ম নেই। কারণ এখানে ঘরে ঘরে ক্যাপিটাল, প্রতি ঘরে মণিদীপ বিরাজ করে। গান্ধীজীর উক্তি—"কয়েকজনের হাতে গিয়ে ধনসম্পদ জমা হউক, এ আমি চাই না। আমি চাই সকলের হাতে ধনসম্পদ জমা হবে" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১১-২৪)।

গান্ধীজী এই রামরাজ্য নামে আখ্যাত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রকেই ভালবাসতেন। তুলসীদাসের রামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ডে সেই রামরাজ্যের ভাবময় ও শোভাময় রূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই রূপ অলীক কল্পনার সৃষ্টি নয়, এটা অবাস্তবতার কাব্য নয়। একটি বাস্তব রাষ্ট্রের রাজনীতিগত সূত্রগুলিকে কাব্যময় রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

"লতা বিটপ মাগেঁ মধু চবহীঁ
মন ভাবতো ধেনু পায় স্রবহী॥
সসম্পন্ন সদা রহ ধরণী……"

লতা বা গাছ চাওয়া মাত্র মধু দান করে, গাভীরা ইচ্ছা হলে দুধ দেয়। পৃথিবী সর্বদা শস্যময়ী হয়ে রইল।

আদর্শ রাষ্ট্রে বা সমাজে শোষণের নীতি থাকতে পারে না। যার যা কিছু দেবার মত আছে, সে তা স্বেচ্ছায় দেবে; কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে আদায় করার প্রথা নেই। কারণ রামরাজ হলো শোষণহীন সমাজ। এখানে মানুষ ফাঁকি দেবার জন্যে তৈরী থাকে না, সমাজকে সেবা ও উপকার করাই তার স্বভাব। অর্থাৎ মানুষ এই স্বভাবের অধিকারী হতে পেরেছে। সেই জন্যে সে স্বেচ্ছায় সমাজকে তার উপহার দিয়ে চলেছে। মাটির ক্ষতি করে এখানে কৃষিকাজ করা হয় না, লতা ও বনস্পতির প্রাণশক্তিকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয় না। পয়স্বিনী গাভীর জীবনকে দুর্বল ক'রে তার দুধ আদায় করা হয় না। এক কথায় বলা যায়, সম্পদ আহরণের অত্যুগ্র লোভ ও আগ্রহে সম্পদের মূল ব্যবস্থাটিকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না।

মনের স্বাভাবিক আগ্রহে ও ইচ্ছায়, 'সবার পরশে পবিত্র করা' এই রামরাজ্যে জোর করে আদায় করার নীতি নেই। স্বেচ্ছায় (voluntary) ভিত্তির উপর এই রাষ্ট্রের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। পীনাল কোড, ট্যাক্স, আদালত, পুলিশ ও ফৌজ—এ সবের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের নীতিকে সকল প্রজা স্বেচ্ছায় মেনে চলছে না। কিন্তু রামরাজ্যের ভিত্তি হলো সকলের স্বেচ্ছাকৃত সমর্থন। লতা ও বিটপী, ধেনু এবং ভূমিও সকলেই স্বেচ্ছায় সৃষ্টি ও দান করে সমাজকে পুষ্ট করছে। এমন কি—

"প্রগটী গিরিন্হ বিবিধ মনিখানী
জগদাতমা ভূপ জগ জানী"

ভগবান রাজা হয়েছেন জানতে পেরে পর্বতে নানা মণির খনি নিজেরাই ইচ্ছে ক'রে দেখা দিল।

"সাগর নিজ মরজাদা রহহীঁ
ভারহিঁ রতন তটন্হি নর লহহী॥"

সাগর নিজের মর্যাদা অটুট রেখেই ইচ্ছে ক'রে তটোপকূলে নানারকম রত্ন ফেলে দিত, লোকে সেসব রত্ন ঘরে নিয়ে যেত। যথেচ্ছা নয়, স্বেচ্ছার আদর্শে দীক্ষিত সমাজে সম্পদসৃষ্টির রীতি ও নীতি এই। নিজের মর্যাদা ও ধর্ম না হারিয়ে সেবার প্রেরণায় স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি ও উপহার।

আদর্শরাষ্ট্রের ইকনমি তার একটি প্রধান পরিচয়। সম্পদের অপচয় বা অপরিমিত ব্যয় এখানে নেই। বিনা প্রয়োজনে সম্পদের প্রয়োগ বস্তুতঃ সম্পদের ব্যসন বা বিনাশ মাত্র; আদর্শ সমাজে এই অবিধি থাকতে পারে না।

............রবি তপ জেতেন হিঁ কাজ।
মাঁগে বারিদ দেহিঁ জল রামচন্দ্র কে রাজ ॥

যতটুকু তাপ কাজের জন্য প্রয়োজন, সূর্য ততটুকুই তাপ দিত। চাইলেই মেঘ জল দিত।

এমন আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ কি পৃথিবীতে কখনও সম্ভব হবে? তুলসীদাস বলেছেন—

ফূলহি ফরহি সদা তরু কানন, রহহি এক সঙ্গ গজ পঞ্চানন ॥
খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসড়াঈ, সবন্‌হি পরস্পর প্রীতি বড়াঈ ॥

বনে ও গাছে গাছে সর্বদা ফুল ফুটে থাকবে। হাতী ও সিংহ একসঙ্গে বাস করবে। পশু-পাখী তাদের স্বাভাবিক বৈরভাব ভুলে যাবে এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ক্রমেই বাড়িয়ে চলবে।

এই যে হিংসাহীন প্রীতিময় সমাজের ছবি, একি সুদূর ভবিষ্যতেও কখনও বাস্তব রূপে দেখা দেবে?

মানুষের ইতিহাসে যদি কখনও এই পূর্ণ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বলতে হবে মানুষের ঐতিহাসিক গতি একদিন নির্বাণ লাভ করবে, আর তাকে চলতে হবে না। কিন্তু গান্ধীজী মানুষের ইতিহাসকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নি। কখনো কোনদিন এমন কলুষশূন্য পূর্ণপ্রীতির রাজ্য সম্ভব হবে, এমন কথাও তিনি বলেন নি। তিনি মানুষের সমাজকে এক চিরগতিময় ডাইনামিক রূপেই উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে চলাই হলো আদর্শ, এগিয়ে চলাই হলো অমৃত লাভ। এই যাত্রার কোন শেষধাম নেই, মানুষের ইতিহাস হলো চিরপথিকের ইতিহাস। আদর্শে উপনীত হওয়া (attainment) নয়, আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ও চেষ্টাই হলো মানুষের ইতিহাস। রামরাজ্যে উপনীত হওয়া নয়, রামরাজ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াসই হবে আমাদের জীবন। এরই নাম রামাশ্রিত জীবন।

গান্ধীজী তাঁর 'ধ্যানের ভারতবর্ষের' যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তাতে দেখতে পাই যে তিনিও সে ভারতবর্ষে সৈন্যবাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। পররাজ্য

জয় করার কামনা সেই ভারতবর্ষের থাকবে না, সেই ভারতবর্ষ নিজে শোষিত হবে না, পরকেও শোষণ করবে না। কিন্তু তবুও যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক সৈন্য সে ভারতবর্ষে থাকবে। কারণ পূর্ণতা (perfection) একটা সীমাহীন লক্ষ্য মাত্র, বাস্তবে সম্ভব নয়। পেয়েছি আমার শেষ—এ কথা মানুষের ইতিহাসে কখনো ধ্বনিত হবে না। কবি তুলসীদাসের রামচন্দ্রকেও দেখতে পাই তিনি ধনুঃশর ধারণ করে আছেন। কিন্তু এই ধনুঃশরের ধর্ম বর্তমান যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফৌজী ধর্মের মত নয়।

জলজ বিলোচন শ্যামল গাঁতহি, পলক নয়ন ইব সেবকত্রাতহিঁ।
ধৃত সর রুচির চাঁপ তূণীরহি, সন্ত কঞ্জ বন রহি রন ধীরহিঁ॥

চোখের পাতা যেমন চোখকে রক্ষা করে, পদ্মলোচন শ্যামল রামচন্দ্র তেমনি সেবককে রক্ষা করে থাকেন। তাঁর হাতের ধনুঃশর দেখতে সুন্দর, সাধুদের পদ্মবনের পক্ষে তিনি সূর্যস্বরূপ, তিনি যুদ্ধে স্থিরবুদ্ধি।

১ আঘাতের অস্ত্র ধনুঃশরকে 'সুন্দর' বলা যায় কি করে? রামরাজ্যে রাষ্ট্রের যে অস্ত্রশক্তির কথা বলা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে তার একমাত্র ধর্ম হলো সেবককে রক্ষা করা। এই অস্ত্রশক্তির আর কোন ধর্ম নেই। রাষ্ট্রের এই অস্ত্রশক্তি একটা সমাজনিরপেক্ষ বা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নিজদম্ভ চালিত অর্গানাইজেসন নয়। চোখের পাতা যেমন চোখের অঙ্গ, অথচ চোখকে রক্ষা করে, রামরাজ্যের বা আদর্শরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাও সমাজের অঙ্গ রূপেই একমাত্র সেই রক্ষার ধর্ম পালন করে। ছুরিকা ডাকাতের হাতে পড়লে যে বিনাশের ধর্ম পালন করে, অস্ত্রোপ-চারক চিকিৎসকের হাতে ঠিক তার উল্টো রক্ষার ধর্ম পালন করে। আর্ত ও আক্রান্তকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, রামরাজের মিলিটারী বিভাগে তার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হয় না। পিতা যখন তার শিশুপুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, অথবা কখনো মারধর করেন, রাগের মাথায় করলেও সেটা নিশ্চয় শিশুপুত্রের প্রতি হিংসাপ্রণোদিত আচরণ নয়। শিশুপুত্রের মঙ্গলের জন্যই পিতার এই রূঢ়তা। গান্ধীজীর ব্যাখ্যাত নীতিতে যতটুকু সামরিকতা ও ক্ষাত্র-ব্রতের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সেটা এই রকমের মঙ্গলবুদ্ধি প্রণোদিত রূঢ়তা মাত্র। মেশিন ও আণবিক শক্তির মধ্যে তো কোন হিংসা নেই, তার ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ওপরেই তার হিংস্রতা বা প্রেমিকতা নির্ভর করে।

পূর্ণতা কখনো লাভ করা যায় না। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য, পূর্ণ অহিংসা, পূর্ণ সদাচরণ

—এতটা সফলতা কোন ব্যক্তি-মানবের পক্ষে বা কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অর্জন করা কোন কালে সম্ভব হবে কি না, গান্ধীজী বলতে পারেন না। কিন্তু তবু তিনি এই পূর্ণতার আদর্শকে এক বিন্দু খর্ব ক'রে গ্রহণ করতে চান না। আদর্শ বা লক্ষ্য পূর্ণরূপেই জীবনের সামনে থাকবে। এই পূর্ণতার দিকে পৌছবার প্রয়াসই হবে মানুষের প্রয়াস। রাস্কিনের "আন্ টু দি লাস্ট" পুস্তক প'ড়ে গান্ধীজী তাঁর জীবনদর্শনের এই মূলসূত্রটি চিরকালের মত সুস্থির ক'রে নিয়েছিলেন। "যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যক মানুষের যতদূর সম্ভব বেশী মঙ্গল সাধন করা" ('greatest good of the greatest number')—আধুনিক ডেমোক্রেসীর এই খণ্ডিত আদর্শকে তাই তিনি গ্রহণ করেন নি। 'বহুজনহিতায়' আদর্শ নয়, তিনি গ্রহণ করেছিলেন সর্বহিতের আদর্শ। সফল হই আর বিফল হই, সাধ্য হোক্ আর অসাধ্য হোক্, সামর্থ্য পাই আর না পাই, আদর্শ বড় হয়েই থাকবে। তাই তুলসীবর্ণিত রামরাজের 'সব নির্দম্ভ, সব গুণজ্ঞ, সব কৃতজ্ঞ, সব উদার'—এই সর্বজন-উন্নয়নের আদর্শটি গান্ধীজীর ভাল লেগেছিল। তাঁর সমগ্র সমাজনীতি এই সর্বজনহিতের কালব্যাপী ও জগৎব্যাপী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষ্য ও পন্থা

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবনের যে রূপ আমরা লক্ষ্য করি, সেটা মহানাট্যের মত। ঘটনার পরীক্ষায় এবং পরিণামে পূর্ণ একটি প্রবল গতিময় জীবন। এই গতিরও একটি বিশেষ রূপ আছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের গতিধর্মকে উপমার সাহায্যে বলা যায়, চিরতীর্থযাত্রীর পথচলার প্রকৃতি। অথবা বলা যায়, এক অভিযাত্রী আবিষ্কারকের জীবন, দুর্দম সন্ধানীর মত যাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সুপরিকল্পনা ও সুচিন্তার সঙ্গে এক পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসারিত হয়েছে। তিনিই বলেছেন, তাঁর জীবন হলো সত্যের সন্ধান।

এইখানে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মনীষা চিন্তা ও সাধনার সঙ্গে তাঁর জীবনের প্রকৃতি একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের গৌরব লাভ করেছে। সন্ধিৎসার জীবন, অন্বেষণার জীবন। শ্রেয়কে লাভ করা নিশ্চয় জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু শ্রেয়কে নিরন্তর অনুসন্ধান করাও কি একটা 'লক্ষ্য' নয়? এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবর্ষের জ্ঞানের ও সাধনার ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রেয়কে লাভ করার জন্য যে সাধনা, সেটা শ্রেয়োলাভের চেয়ে কম মহনীয় নয়। উদ্দেশ্য ও পথ, সিদ্ধি ও সাধনা, লক্ষ্য ও সন্ধান, সাফল্য ও প্রয়াস—জীবনের এই প্রাপ্তব্যের সাধনা ও প্রাপ্তির সাধনার মধ্যে কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়। দু'য়ের মধ্যে ভেদরেখা নেই। লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই জীবনের একমাত্র সার্থকতা নয়, লক্ষ্য লাভ না হলেই প্রয়াস 'ব্যর্থ' হয়ে গেল, এ'ও সত্য নয়। প্রয়াসই একটি ধর্ম, পন্থাই একটি লক্ষ্য, সাধনাই একটি সার্থকতা। "কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ?" এই পরম শেষকে হয়তো কোনকালেই পাওয়া যাবে না, কিন্তু তার জন্য দুঃখ কেন? পরম শেষকে লাভ করার জন্য যে চিরাগ্রহ ও চিরপ্রয়াস, তাই তো জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং আনন্দ।

লক্ষ্য বা আদর্শে শুধু সফলতা লাভ করতে পারাই জীবনের সাফল্য নয়। ক্ষুদ্র বস্তু যার কাম্য তার প্রয়াস সহজেই সাফল্য লাভ করে, কিন্তু এই সহজ সিদ্ধির দ্বারাই জীবনের মর্যাদা ও সার্থকতা প্রমাণিত হয় না। বৃহৎ এবং সৎ লক্ষ্য মাত্রই দুরূহ, সুতরাং যে লক্ষ্যে সহজে উপনীত হওয়া যায় না, এমন কি উপনীত

হওয়াই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু লক্ষ্যলাভের জন্য প্রয়াসের এই ব্যর্থতার অর্থ জীবনের ব্যর্থতা নয়। ইংরাজ কবি ব্রাউনিং তাঁর রচিত একটি কবিতায় আদর্শের সফলতা-বিফলতার তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন :

That low man seeks a little thing to do,
Sees it and does it.
This high man, with a great thing to pursue,
Dies ere he knows it.
This low man goes on adding one to one.
His hundred is soon hit.
This high man, aiming at a million
Misses an unit.

—ক্ষুদ্র মানুষ তার ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তুকে সহজেই দেখতে পায়, এবং লাভ ক'রেও ফেলে। কিন্তু বৃহৎ মানুষকে তার বৃহৎ লক্ষ্য ভাল ক'রে চিনে উঠতেই এত সময় লাগে যে চেনবার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। যে ক্ষুদ্র মানুষের লক্ষ্য হলো এক শত, সে সহজেই একের পর এক যোগ ক'রে তার শতকে পৌঁছে যায়। কিন্তু যার লক্ষ্য হলো কোটি, তার হয়তো এক পার হওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না।*

নোয়াখালিতে থাকতে মহাত্মা গান্ধী ৭৮ বৎসর বয়সে বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই বয়সে একটা নতুন ভাষা শিক্ষায় কত বৎসর সময় লাগতে পারে, এ চেষ্টায় কবে সফলতা লাভ হবে, এসব প্রশ্ন তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে একটি নীতি তাঁর বহুমুখী কর্মসাধনাকে প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে নীতি হলো চেষ্টার ও পন্থার নীতি। কোন্ মহৎ লক্ষ্য লাভ করতে হবে, এটাই একমাত্র চিন্তার বিষয় নয়। মহৎ পন্থায় সেই লক্ষ্য লাভ করতে হবে। পন্থার মহত্ত্ব লক্ষ্যের মহত্ত্ব অপেক্ষা ছোট নয়, ছোট করা যায় না। মহৎ লক্ষ্য কি, তাও কারও পক্ষে সুনিশ্চিত ভাবে নিরূপণ বা অনুমান করা সম্ভব নয়। একজন যাকে মহৎ লক্ষ্য বলে, আর একজনের মতে সে লক্ষ্য হয়তো নিকৃষ্ট বা হীন বলেই বিবেচিত হবে। একজন যে বস্তুকে কল্যাণের সার বলে মনে করে, আর একজনের বিবেচনায় সে বস্তু হয়তো সর্বহানির মূল। সত্য ও মিথ্যা সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট

* Browning's *A Grammarian's Funeral*

সংজ্ঞা পৃথিবীতে প্রচলিত নেই, মানুষভেদে সমাজভেদে এসম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান।

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতি হলো, কর্মণ্যেবাধিকারস্ত মা ফলেষু কদাচন। কর্মেই একমাত্র অধিকার, কর্মফলের ওপর অধিকার নেই। অর্থাৎ, একটা আদর্শ লাভের জন্য মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে, উদ্যম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সব ক'রেও ঠিক যে সেই আদর্শ লাভ হবেই হবে, পৃথিবীর ইতিহাসে ও ঘটনার প্রক্রিয়াতে এরকম গাণিতিক নিয়ম দেখা যায় না। পরিণামের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা কারও নেই, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। ঠিক যা ভাবা যায়, বাস্তবে তা হয় না। সকল উদ্যোগ নিখুঁত হলেও, পরিণামটি নিখুঁত ভাবে লাভ করা যায় না। সকল পরিণামের মধ্যে 'আকস্মিকের' একটা স্থান আছেই আছে।

তাই মানুষের ক্ষমতা ও অধিকার তার কর্মক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, সে তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই কারণে মানুষের কাছে তার পন্থার ও প্রয়াসের ধর্মই হলো সব চেয়ে বড় কথা। পন্থা ও প্রয়াসকে শুদ্ধ করে রাখতে হবে। শুদ্ধ পন্থায় কাজ করেছি, এই আনন্দকেই সার্থকতা বলে গ্রহণ করতে হবে।

কর্মফলের ওপর অধিকার নেই, গীতোক্ত এই নীতি শুধু ভারতীয় জ্ঞানীর আবিষ্কার নয়। এ নীতি অধ্যাত্মবাদীর একটা ভাব মাত্র নয়, আধুনিক জড়বাদী দার্শনিকও এই নীতিকে সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের একটি সূত্র রূপে লক্ষ্য করতে পেরেছেন।* মানুষ তাঁর নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দক্ষতা দিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অথবা একটা আদর্শগত অবস্থায় পৌঁছবার জন্য আয়োজন করে, কিন্তু সব ক'রেও দেখা যায় যে বাস্তব পরিণাম ঠিক পরিকল্পিত পরিণামের মত হয়ে ওঠে না। তার কারণ হলো, ঘটনার ওপর শুধু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যে কাজ করছে তা নয়, আরও এমন সব নিয়ম ও শক্তির প্রভাব পড়ছে ঘটনার ওপর, যে-নিয়ম ও শক্তির সম্বন্ধে এখনো মানুষের জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অথবা সেই সব নিয়ম এবং শক্তির ওপর মানুষের জ্ঞানগত ক্ষমতা এখনও অক্রিয় হয়ে আছে। এবং কোন কালেই জ্ঞানগত ক্ষমতায় মানুষ 'পূর্ণতা' লাভ করে উঠতে পারবে না। কাজেই লক্ষ্য লাভ করাই জীবনের একমাত্র সাফল্যের

* History is simply the activity of man pursuing his ends.—Karl Marx

প্রমাণ নয়। লক্ষ্য লাভের জন্য শুদ্ধ পন্থার প্রয়াস করা হয়েছে, এই হলো সাফল্য সান্ত্বনা ও সন্তোষের প্রমাণ। অধিকার বলতে এই কর্মের ওপর অধিকারটুকুই বোঝায়।

জীবন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মূলনীতির সূত্র এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে।

(ক) জীবনকে এক পরম অন্বেষণা বা সন্ধান রূপে তিনি উপলব্ধি করেছেন।

(খ) সত্যই হলেন ঈশ্বর। সত্যই অহিংসা, সত্যই প্রেম। এই সত্যই হলো সকল সন্ধানের লক্ষ্য, জীবনের পরম প্রাপ্তব্য।

(গ) সৎ পন্থায় প্রয়াস করাই সত্য লাভের একমাত্র নীতি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক রূপ বস্তুতঃ অন্বেষণ এবং সন্ধানের রূপ। উপনিষদের নচিকেতা যমলোকে যাত্রা করেছিলেন মৃত্যুর রহস্য উদ্ধার করে আনবার জন্য। পুরাণের সুপর্ণ গরুড় অমৃত আহরণে স্বর্গলোকে যাত্রা করেছিলেন। বৈষ্ণবের আকুলতা জীবনেশ্বর কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য শ্রীরাধিকার রূপ ধরে অভিসারে যাত্রা করে। ভারতের সঙ্গীত শিল্প স্থাপত্য এবং এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যকর্মের মধ্যেও যে আবাহন প্রার্থনা ও স্তব ইত্যাদি ধ্বনিত হ'তে দেখা যায়, তার ভাষাও বস্তুতঃ সন্ধানী পথযাত্রীর আকুলতার মত। মহাত্মা গান্ধীর জীবন এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তার ঐতিহ্যগত রূপের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে, কারণ তিনি সন্ধানী রূপেই তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন এবং চালিত করেছিলেন।

প্রশ্ন উঠবে, সৎ পন্থা কি? সৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন মানুষে মানুষে ধারণার তারতম্য আছে, সৎ পথ সম্বন্ধেও তাই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। এক জন যাকে সৎপথ মনে করে, অন্য জনে হয়তো তাকেই অসৎ পথ বলে মনে করে। অনেকে বলবেন, এবং বলেও থাকেন যে, নিজের বিবেক অনুযায়ী চলাই সৎ পথে চলা। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। সব মানুষের বিবেক কি এক? মানুষে মানুষে বিবেকেরও যে পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, 'বিবেক' অনুযায়ীই কোন মানুষ এমন কাজ করেছে, যেটা অন্য সকলের মতে নিতান্ত বিবেকবহির্ভূত অসৎ কাজ মাত্র। সুতরাং বিবেক অনুযায়ী কাজ করাই সৎ সাধনা নয়। সাধারণে যাকে বিবেক ব'লে মনে করে সেটা তো কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি, যা মানুষ তার শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী করে

নেয়। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিতে ভুল থাকলে 'বিবেক'ও ভ্রান্ত হবে, এটা স্বাভাবিক নিয়ম।

সৎ পথের নির্দেশ দেবে যে বিবেক, সে বিবেকও সৎ হওয়া চাই, এই হলো মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। সদ্ধর্মী বিবেক অনায়াসলভ্য নয়, এমনিতেই তাকে পাওয়া যায় না। শুদ্ধ বিবেক লাভ করারও একটা প্রক্রিয়া আছে।

"যেমন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা করতে হলে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত নীতি বা সূত্র অনুসরণ করে অবশ্যই চলতে হয়, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ে, সত্য উপলব্ধি করার বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে কতকগুলি আত্মসংযমের প্রাথমিক নীতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে নিতে হয়। সুতরাং নিজের বিবেক বা 'অন্তরের বাণী' অনুযায়ী কাজ করার সাথে প্রত্যেককে তার জীবনের আচরণগত সততা এবং শুদ্ধতার রূপ ও সীমা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে নিতে হবে।"

এই হলো মহাত্মা গান্ধীর যুক্তি। তিনি বিবেক শুদ্ধ করার প্রয়োজনকে বৈজ্ঞানিকের মত দৃষ্টি নিয়েই বিচার করেছেন। এখন প্রশ্ন থাকে, কি করে শুদ্ধ ও সত্য বিবেক লাভ হবে? এই প্রশ্নের সূত্র ধরে তিনি যে বিজ্ঞান পুনরাবিষ্কার করেছেন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী অতীত যুগে সে বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল সূত্র আবিষ্কার করে গেছেন। জীবনের আচরণকে, মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে কতকগুলি 'ব্রত' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করলে শুদ্ধসংস্কার লাভ হতে পারে না। শারীরিক এবং মানসিক ব্রত দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ শুদ্ধতার ব্রত, অহিংসার ব্রত, এবং অপরিগ্রহ ব্রত, ইত্যাদি।

চেষ্টার দ্বারা, কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার দ্বারা, মন ও ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করে তুলতে হলে, তার জন্য চাই 'ব্রত'। এই যথার্থ ব্রতী যে বিবেক লাভ করলেন, সেই বিবেকই যথার্থ বিবেক। এই ব্রতী যে 'অন্তরের' অধিকারী হলো, সে অন্তরের বাণীই যথার্থ বাণী।

ব্রহ্মচর্য অর্থ 'কৌমার্য' নয়। গান্ধীজী অতি ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্য কথাটি ব্যবহার করেছেন—শুদ্ধ নীতিময় জীবন। তেমনই 'অহিংসা' অর্থ তাঁর কাছে শুধু 'অ-হত্যা' নয়, অহিংসা অর্থে প্রধানতঃ প্রেম বা প্রীতির ধর্মই তিনি মনে করেছেন। আর, লক্ষ্য হলো সত্য। এই পর্যন্ত এসে আমরা বুঝতে পারি, গান্ধীজী কিভাবে জীবন বিজ্ঞানের তিনটি অধ্যায় বিভাগ করেছেন। লক্ষ্য,

পন্থা ও প্রয়াসের বিজ্ঞান। সাধারণভাবে যথাক্রমে বলা যায়—লক্ষ্য হলো সত্য, পন্থা হলো অহিংসা এবং প্রয়াসের বিজ্ঞান হলো ব্রহ্মচর্য। এর মধ্যেই কোনটাকেই কোনটি হতে ভিন্ন করা যায় না। একটি অপরের সঙ্গে যুক্ত, একটি অপরের ওপর নির্ভর ক'রে আছে। সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড জীবনদর্শন।

এইভাবে যিনি প্রকৃত ব্রতিরূপে মন বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির শুদ্ধতা ও সংযম ঘটিয়ে শুদ্ধ অন্তর লাভ করবেন, তাঁর পক্ষে সত্যোপলব্ধি সহজ হয়, তাঁর অন্তরের বাণী সহজেই সত্য পথের পরিচয় বলে দিতে পারে। কিন্তু তাঁরও কি ভুল হতে পারে না?

হতে পারে বৈকি, সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। একেবারে শুদ্ধ, একেবারে সম্পূর্ণ, একেবারে অভ্রান্ত, এটা জাগতিক নিয়মে সম্ভব নয়। প্রকৃত ব্রতীর পক্ষেও ভ্রান্ত হবার অবকাশ আছে, কিন্তু ভ্রান্তিকে চেনবার এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার শক্তিও এই ব্রতীর আছে। ব্রতী যে শক্তি লাভ করেন তাকে বলা যায় অভ্রান্তির দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি। শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, মহৎ থেকে মহত্তরের প্রতি তার জীবন গতি লাভ করে।

"পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যতদিন আমরা অপূর্ণ এই মরজীবনের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। আমরা শুধু আমাদের অনুভব ও চিন্তায় পূর্ণ সত্যকে কল্পনা করতে পারি। এই অস্থায়ী ক্ষণায়ু দেহের কোন শক্তির সাহায্যে আমরা সেই সত্যের মুখোমুখি সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি না, কারণ সেই সত্য হলেন অনন্ত।"

অধ্যাত্মের বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বরোপলব্ধির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ সামাজিক প্রসঙ্গে এসেও গান্ধীজী এই 'পূর্ণতার' তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন।

"মানুষ চিরকালই অপূর্ণ থাকবে এবং চিরকালই তার কাজ হবে পূর্ণ হবার প্রয়াস। পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ নির্লোভ বা ত্যাগ ইত্যাদি পূর্ণতার আদর্শ চিরকালই অসাধ্য হয়ে থাকবে, কিন্তু সেই পূর্ণতাকে পাওয়ার জন্যই নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে।"

আদর্শবাদী গান্ধী এই ভাবেই তাঁর জীবনচর্যার নীতিকে বস্তুতঃ গণিত বিজ্ঞানের সূত্রের মত ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে ভাববাদের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নাই। 'এক কদম আগে'—মাত্র এক পা আমি এগিয়ে যেতে চাই, তাই আমার

পক্ষে যথেষ্ট। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমি কাজ করতে চাই না, আমি বর্তমানকে গড়ে তুলবো, বর্তমানের সঙ্গেই আমার কাজ। এক পা এগিয়ে যেতে পারলেই দ্বিতীয় পদক্ষেপের স্থান আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চরৈবেতি! চরৈবেতি! এগিয়ে চলাই হলো জীবন, এগিয়ে চলাই হলো লাভ। জীবনের এই ডায়নামিক বা গতিপ্রবণ রূপ গান্ধীজীর কাছে অতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। সত্যের সন্ধানী হয়ে তিনি তাই জীবনের পথচলার বিজ্ঞান ও দর্শন নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আপনি আচরি সেই ধর্ম অপরকে প্রত্যক্ষ করিয়ে গেছেন।

বিকেন্দ্রীকরণ—সভ্যতার অহিংস গঠন

সমাজজীবনে যে-কোন সম্পদ শক্তি অথবা ঐশ্বর্য কেন্দ্রীভূত হলে তার ফলে কতগুলি গ্লানি এবং হানির সৃষ্টি হয়। পুঞ্জীভূত হওয়া, স্তূপীকৃত হওয়া, এই সবই ঠিক স্বভাবধর্মের সঙ্গত ব্যাপার নয়। অতিরিক্ততার মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবন, তা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক আর সমাজগত ভাবেই হউক, তার রূপের বিকাশ হয় গতিশীলতায়। সেই জন্যই কোন সম্পদ বা শক্তি যদি কেন্দ্রীভূত হয়ে সমাজজীবনে স্থান লাভ করে, তবে সেই সম্পদ ও শক্তি ঠিক অলংকার না হয়ে ভার হয়ে ওঠে এবং সামাজিক প্রাণের গতিধর্ম ব্যাহত করে।

কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ, বহুকে রিক্ত করা। মেদ মাংস মজ্জা যদি কোন শরীরে অতিরিক্তরূপে আশ্রিত হয়, তবে সেটা অস্বাস্থ্যই হয়ে দাঁড়ায়। একজনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ বহু জনকে ক্ষমতাহীন করা, এবং অত্যাচারের অবকাশ সৃষ্টি করা। বহু মানবের সমাবেশে যে 'ভীড়' সৃষ্টি হয়, সে ভীড়ের আচরণে মানবিকতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ লাভ করে না। জনবহুল বসতির রূপে যেখানে সহর গড়ে ওঠে, সেখানে গৃহধর্ম অথবা সমাজজীবন স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে পদে পদে বাধা পায়।

গান্ধীজী যে আদর্শসমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে কেন্দ্রিকতার স্থান নেই। শিক্ষা, কৃষি, পণ্য উৎপাদন এবং রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—সকলের মধ্যে তিনি 'বিকেন্দ্রীকরণ' চেয়েছেন। তাঁর চরকা শুধু সুতাকাটার একটি কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র মাত্র নয়, চরকা বস্তুতঃ তাঁর বিকেন্দ্রীকরণের দর্শন ও বিজ্ঞান। সমানশ্রমে এবং সকলের সহযোগিতায় যে ব্যবস্থা চলে, সেই ব্যবস্থাই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই বিকেন্দ্রীকৃত সমাজব্যবস্থাই হলো প্রকৃত অহিংসানুগ সমাজব্যবস্থার বহিরঙ্গ।

কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েৎ প্রথা ও গ্রামীণ জীবন—এসবের মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার একটা সহজ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কুটীরশিল্প হলো ব্যক্তির উদ্যোগে ও প্রতিভায় চালিত শিল্প। এক্ষেত্রে উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে যে লাভ হয়, সেই লাভ সম্পূর্ণরূপেই স্বয়ং শিল্পীর অধিগত হয়। কারখানাশিল্পের প্রকৃতি হলো

ভিন্ন। বহু-মানুষকে একটি স্থানে একত্রিত করে ধনিক তাঁর নিজের ইচ্ছামত পণ্য উৎপন্ন করেন। শিল্পী লাভ করে শুধু 'মজুরি', ধনিক লাভ করেন 'মুনাফা'। পণ্যসৃষ্টির মধ্যে শিল্পী তার রুচি ও ব্যক্তিগত প্রতিভা-প্রয়োগের স্বাধীনতা উপভোগ করে না। উৎপাদনের এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা থেকেই বহু বিরোধ ও গ্লানি দেখা দেয়। পরশ্রম শোষণের সুযোগ এর মধ্যে বেশী করে আছে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাতে উৎপন্ন সম্পদ ও লাভ ব্যাপকভাবে সমাজের বহু মানুষের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে না।

কিন্তু 'চরকা' নীতি-অনুসারে চালিত উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পদ সমভাবে না হোক্ ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। চরকা এই ঘরে-ঘরে-উন্নতির আদর্শ প্রতীক। কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েৎ ও গ্রামীণ জীবনে সবচেয়ে স্পষ্ট করে যেটা দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হলো প্রতি মানবের অধিকার প্রতিভা শ্রম ও আনন্দের স্বাভাবিক সুযোগ। মানুষের প্রতিভাকে রেজিমেণ্ট গঠনের মত কেন্দ্রীভূত করতে গিয়ে আধুনিক সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রে বস্তুতঃ মনুষ্যত্বকেই রেজিমেণ্ট করা হয়েছে। মানুষ নিজেকে মাত্র রাষ্ট্রভুক্ত জীব মনে করে এবং তার আচরণেও হৃদয়ের ধর্ম কুন্ঠিত হয়।

মানুষের প্রতিভাকে এই কেন্দ্রীভূত জীবনের সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা ও শিল্প ইত্যাদি সকল ব্যবস্থায় সহজ স্বভাবধর্ম দেবার নীতিকে ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারাও উপলব্ধি করেছিলেন। যে ব্যবস্থা সকলের আগ্রহে এবং উদ্যোগে চলে, সেই হলো স্বাভাবিক চলা। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটি প্রবন্ধে এই স্বাভাবিক গতিধর্মপ্রবণ ব্যবস্থার একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বড় বড় মেলা কি ভাবে আজও হয়ে আসছে, তার প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ-ব্যবস্থার সার্থকতা উৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। এই সব বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোন কমিটি নেই, সংবাদপত্রে বার বার বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেবার কোন রীতি নেই, অথচ আজও ঠিক নির্দিষ্ট তিথিতে ভারতের সকল দিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে এক একটি মেলা প্রতি বছরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই ভাবেই জনসাধারণের সংস্কৃতি রূপে যে আচরণ স্বভাবধর্মের মত নিষ্পন্ন হয়, তাই হলো সবচেয়ে সচল সংস্কৃতি।

বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে গান্ধীজীর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক্ :

(ক) "খাদি বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হলো উৎপাদন এবং উপভোগ নামে উভয় ব্যবস্থাকেই বিকেন্দ্রীকৃত করা।"

(খ) "খদ্দরের মূল তত্ত্ব হলো, প্রত্যেক গ্রামকে খাদ্যে এবং বস্ত্রে আত্মনির্ভর করা।"

(গ) "যদি ভারতবর্ষ অহিংস পদ্ধতিতে নিজকে গড়ে তুলে উন্নত করতে চায়, তবে আমার প্রস্তাব হলো, অনেক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাকে চালিয়ে যেতে এবং রক্ষা করতে হলে তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জোর খাটাবার আয়োজনও চাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘরে কেড়ে নিয়ে যাবার মত পুঞ্জীভূত সম্পদ থাকে না এবং সে সব ঘর রক্ষার জন্য পুলিসী ব্যবস্থারও প্রয়োজন নেই। ডাকাতের হাত থেকে ধনীর ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রাসাদ রক্ষার জন্যই প্রহরীর প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানাকে রক্ষার জন্যও এই ধরণের পাহারার ব্যবস্থা প্রয়োজন। গ্রামীণ পদ্ধতিতে সংগঠিত ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কম। বরং সহুরে পদ্ধতিতে সংগঠিত ভারতবর্ষ জল-স্থল-নৌ-সৈন্যে সজ্জিত থাকলেও বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার বেশী সম্ভাবনা আছে।"

(ঘ) "কারখানা-সভ্যতার দ্বারা অহিংস আদর্শ সার্থক করা যায় না। স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর গ্রামের দ্বারাই অহিংস সমাজের প্রতিষ্ঠা সফল হতে পারে। হিটলার ইচ্ছা করলেও ভারতের সাত লক্ষ অহিংস গ্রামকে ধ্বংস করতে পারবে না। ধ্বংস করতে গেলে সে নিজেই তার প্রতি-ক্রিয়ায় অহিংস হয়ে যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে শোষণের কোন স্থান নেই।"

গান্ধীজীর এই সব উক্তি থেকে বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক আদর্শের মূল সূত্রগুলি স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। আত্মনির্ভর ব্যক্তি-মানবের দ্বারা আত্মনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। চালিয়ে নেবার জন্য জোর খাটাবার কোন ব্যবস্থা, আইন বা শাস্তিবিধানের প্রয়োজন এখানে সবচেয়ে কম। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা শোষণের জন্যই দরকার, কেন্দ্রিকতা না থাকলে শোষণের অবকাশ হ্রাস পায়।

পৃথিবীর মানবিক সভ্যতার ইতিহাস আইন ও গায়ের জোরের ইতিহাস নয়। আইনের বা শাস্তির ভয়ে লোকে চুরি করে না, এমন থিওরি সত্য নয়। নিজের সংস্কার ও বিবেকের শাসনের জন্তই মানুষ সমাজবিরোধী কাজকর্ম করতে বাধা পায়। বরং বলা যায়, শুধু আইনের ভয়ে যেখানে অসামাজিক কাজ হয় না, সেখানে সমাজধর্ম বড় ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। ব্যক্তিগত বিবেক এবং স্বভাবের বশে যেখানে মানুষ সমাজধর্মের নীতি রক্ষা করে চলছে, সেখানেই সমাজধর্ম সুস্থায়ী ভিত্তি লাভ করেছে বলা যায়। মানবিকতার এক অলিখিত সংবিধান অনুযায়ীই পৃথিবীর কল্যাণের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। কোন বাড়ীতে আগুন লাগলে লোকে ছুটে আসে আগুন নেভাতে, গৃহজনকে রক্ষা করতে। যদি কেউ এভাবে সাহায্য করতে না আসে তবে রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দেবে, এমন আইন নেই। তবু দেখা যায় যে, আইন না থাকলেও, নিজের জীবন বিপন্ন করেও অনেকে আগুন-লাগা বাড়ীর মানুষকে উদ্ধার করতে চেষ্টিত হয়। এই যে অন্তর্নিহিত বিবেকের আইন, এর দ্বারাই মানুষের প্রাত্যহিক ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। শুধু আইন অনুযায়ী কাজ করলে, এবং আইনে যার নির্দেশ নেই তা না করলে, এক মুহূর্তে পৃথিবীর সভ্যতা অচল হয়ে যাবে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র নামে কেন্দ্রীভূত একটা শক্তির ভয়ে সমাজ চলছে না, চলছে অন্য কোন শক্তির প্রেরণায়। ভয়ে সমাজের অপকারক শুধু চুপ করে থাকে, এই মাত্র। কিন্তু সমাজ চলে, কল্যাণ চালিত হয় মানুষের অলিখিত 'অন্তরের আইন' অনুসারে।

বর্তমানে 'সহর' নামে যে, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা রয়েছে, তার প্রকৃতি অহিংসানুগ নয়। কারখানা ইণ্ডাষ্ট্রি এবং মেশিন, সবার মধ্যে একটা বিরাটত্ব ও অতিরিক্ততা দেখা যায়। এমন কি বর্তমান যুগের সেবাধর্মের প্রকৃতির মধ্যেও কেন্দ্রিকতার প্রকোপ দেখা যায়। শিক্ষার জন্য যে পদ্ধতিতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়, চিকিৎসার জন্য যে পদ্ধতিতে হাসপাতাল গড়া হয়, তার মধ্যেও কেন্দ্রিকতাজনিত হানি প্রবেশ করেছে। এই ধরণের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের কল্যাণসৃষ্টির প্রয়াসেও ঠিক শুদ্ধতা রক্ষা পায় নি। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে হানিও সৃষ্টি করেছে। মেশিন নামক যে বস্তু পণ্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার বিরাটত্বও মাত্রাছাড়া। মেশিনকে বিরাট করতেই হবে, এ নির্দেশ কোথা থেকে পেলেন

ধনিক ও বণিক সমাজ? * বর্তমানে পশ্চিমেও অনেক মনীষী মেশিনকে এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থাকে এইভাবে 'অতিকায় রূপে' সৃষ্টি করবার আগ্রহকে ভ্রান্ত আদর্শ ('Giantism') বলে মনে করেছেন। পরদেশে কলোনি বা উপনিবেশ-বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদ বা পরজাতিকে শাসন করে শোষণ, অনুন্নত দেশে পণ্যবিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা, এই সব আত্মম্ভর ও শোষণমূলক একটা আদর্শের জন্য য়ুরোপীয় মহাদেশের বণিকসমাজ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। শোষণের উদ্দেশ্য না থাকলে মেশিন কখনো অতিকায় হতো না, কারখানা নামে ভয়ানক কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থারও সৃষ্টি হতো না। কেন্দ্রিকতা থেকেই নতুন রূপে ফ্যাসিস্তির উদ্ভব। কেন্দ্রিকতার কারণেই চারুকলা সাহিত্য সঙ্গীত ও ক্রীড়ামোদ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মানবিকতা খুবই কুণ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রিকতা যেন সভ্যতা-অহল্যার এক পাষাণীভূত রূপ।

মহাত্মা গান্ধীর 'খাদি' তাই বস্ত্রমাত্র নয়। খাদিকে তিনি একটি বিজ্ঞান বলেছেন, চরকাকে তিনি বলেছেন ফিলসফি। সভ্যতার উন্মেষ কিভাবে পৃথিবীতে হয়েছে, এবং কোন্ পথে অগ্রসর হয়ে মানবীয় কল্যাণকে ব্যাপক ও গভীর করেছে, তার ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায় যে, মূলে রয়েছে বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতির ক্রিয়া। কেন্দ্রিকতা অস্বাভাবিক, ইতিহাসের সহজ গতি ক্ষুণ্ণ করে। দারিদ্র্য নামে অবস্থাটিও কেন্দ্রিকতার উদাহরণ, অর্থাৎ সম্পদহীনতা একটি ব্যক্তির জীবনে কেন্দ্রীভূত হওয়া।

সভ্যতার ফর্ম বা গঠন কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সমাজের কল্যাণধর্মী ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা উর্ধ্বমুখী হতে পারছে না, মাত্র আবর্ত সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে আলোড়ন আছে কিন্তু গতি নেই। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মধ্যে মানবিকতা সৌষ্ঠব হারায়, মর‍্যালিটি বা নীতিনিষ্ঠাও দুর্বল হয়। হয়েছেও তাই, সভ্যতা কয়েক যুগ ধরে সমূহভাবে কেন্দ্রিকতার প্রকোপে অভিভূত হয়ে আছে। মহাত্মা গান্ধী সভ্যতাকে এই নিজের নিগড়ে বন্দীকৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য ইতিহাসসঙ্গত স্বাভাবিক নিয়মের একটা মূলসূত্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন।

* হাতে চালানো সেলাইয়ের কল গান্ধীজীর মতে 'মেশিন' নয়। সেলাইয়ের কল চরকাবিজ্ঞান অনুযায়ী নির্মিত, কারণ এই কল ঘরে ঘরে ছড়িয়ে থাকে। যন্ত্রের বিকেন্দ্রীভূত রূপ এবং যন্ত্রশিল্পের বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার একটি উদাহরণ হলো সেলাইয়ের কল ও তার শিল্প।

সমাজকে সচল করা, স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংপূর্ণ করা, আত্মনির্ভর করা, সম্পদ উৎপাদনে ও উপভোগে বৈষম্য দূরীভূত করা, মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে কল্যাণকর হবার সুযোগ দেওয়া এবং প্রতিভাকে শিল্পীসুলভ আবেগে মণ্ডিত করা—এক কথায় বলা যায় অহিংস সামাজিক আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে যে কর্তব্য ও সাধনার প্রয়োজন, বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা হলো তারই গঠনতন্ত্র।

"পৃথিবীং মা হিংসীঃ"

পৃথিবীং মা হিংসীঃ। পৃথিবীকে হিংসা করো না, এই বাণী ভারতীয় চিন্তার অতি-পুরাতন আবিষ্কার। অহিংসা বা প্রীতির ধর্ম ভারতীয় চিন্তায় সংস্কৃতিতে এবং সামাজিক সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে মূল প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। ভারতীয় দর্শনে শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম কর্মযোগ, তৃষ্ণার ক্ষয় ও অহংবর্জিত পূর্ণ ত্যাগের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। ভারতীয়ের জীবনে বৈরাগ্য সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য জীবে-দয়া অবৈর মৈত্রী ইত্যাদি আচরণগত নানাবিধ আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। উৎসব সঙ্গীত শিল্পকার্য ইত্যাদিতে মহাপ্রকৃতির আনন্দলীলাকে নানাভাবে রূপ দেবার প্রয়াস হয়েছে। এমন কি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণকামনার মন্ত্র উদ্গীত হয়েছে। লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু। ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে, এক মূল অহিংসার ধর্মই নানা রূপ ও তত্ত্বে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছে। অর্থাৎ অহিংসাই যে ইতিহাসের মূল শক্তি, এই তত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয়ের চিন্তায় স্পষ্ট করে দেখা দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে যা কিছু হয়েছে, তা সবই অহিংসার আদর্শসম্মত, একথা সত্য নয়। ভারতবর্ষ নিজেই অনেকবার তার নিজেরই আবিষ্কৃত সত্যকে বিস্মৃত হয়েছে এবং তার জন্য পথভ্রান্তিও ঘটেছে। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় হলো যে, ভারতীয় চিন্তার গতি তার মূল সূত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে নি। সাময়িক অবসাদের পর, ভারতের চেতনা আবার সঞ্জীবিত হয়েছে ঐ অহিংসা বা প্রীত-ধর্মের প্রেরণায়।

অহিংসার আদর্শকে মহাত্মা গান্ধী আবার সঞ্জীবিত করেছেন। একটা আচরণের নীতি রূপে নয়, গান্ধীজী অহিংসাকে ইতিহাসের মূল শক্তি রূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হিংসার দ্বারা গঠিত হয় নি। যুদ্ধবিগ্রহ দেশলুণ্ঠন অভিযান ইত্যাদি পৃথিবীর অতীত ঘটনাবলীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক অর্থে সেগুলি ঠিক ইতিহাস নয়। যে-সকল ঘটনা, যে-নীতি, যে-মনোবল, যে-আচরণ মানুষের সমাজকে রক্ষা করেছে, তাই হলো ইতিহাস।

যা এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই ইতিহাস। তৈমুরলঙ্গের ঘাতকবাহিনী দিল্লী নগরীতে যে নরহত্যার উৎসব চালিয়েছিল, সে-ঘটনার আঘাতে মানুষের সংসার পিছিয়ে যাবার প্রতিক্রিয়া পেয়েছে কিন্তু এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায় নি। কিন্তু তারই মধ্যে যেসব মমতার ঘটনা দেখা দিয়েছিল, তার বিবরণ লিখিতভাবে নেই, তবু তাই হলো যথার্থ ইতিহাস। সেই ভয়ংকর দিনে কত মানুষ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে অপরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, কত তাতার সৈনিক হয়তো সে হিংস্র মত্ততা সহ্য করতে না পেরে তরবারি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে, কত ঘাতকের অস্ত্র হয়তো উত্তোলিত হয়েও বিবেকের বশে নমিত হয়েছে। হয়তো সেসব ঘটনার সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু সেই ঘটনাই হলো মানুষের ইতিহাস। যা রক্ষণ করে, মিলন রচনা করে, আহরণ করে, সম্মান করে, দান করে—তাই হলো ইতিহাস। এবং সে ইতিহাসের পেছনে যে চিন্তা বুদ্ধি ও অনুভব কাজ করেছে, তাই বস্তুতঃ সেই অহিংসা নামে এক শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

গান্ধীজী অহিংসাকে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মধর্ম বলে উপলব্ধি করেছিলেন। অহিংসা নামে যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষের সমাজ নিতান্ত প্রবৃত্তিতাড়িত প্রাণি-দশা থেকে রূপ রুচি ও নীতি দ্বারা মণ্ডিত হয়ে উন্নত-দশা লাভ করেছে, সেই শক্তিকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে জাগ্রত করে রাখাই উন্নতি-সাধনার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। গান্ধীজীর জীবন ও সাধনা হলো সচেতন ভাবে এবং সুপরিকল্পনার সাহায্যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অহিংসাকে প্রয়োগ করার পরীক্ষা এবং সাধনা। গান্ধীজীকে অনেকে এই আখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি হলেন 'পুনরাবিষ্কার-কুশল মহাপুরুষ' ('prophet of rediscoveries')। কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি চিরপুরাতন স্বাভাবিক ঐতিহাসিক এবং জাগতিক সত্যরূপে বিরাজিত 'অহিংসা' শক্তিকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। বর্তমান যুগের মানুষ চিন্তাবিভ্রম ও চিত্তদৈন্যের প্রকোপে ঐতিহাসিক অগ্রগতির যে মূল প্রেরণা ও শক্তিটিকে প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছিল, তিনি তাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শুধু ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে নয়, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই এক বিরাট পরীক্ষাগার-রূপে তিনি পরিণত করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ফলিত বিজ্ঞানের গবেষকের মত সুদীর্ঘ চিন্তা, দুরূহ ব্রত ও সনিষ্ঠ আচরণের দ্বারা অহিংসার সত্যতা শ্রেষ্ঠত্ব এবং শক্তিশালিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তারপর অথবা তারই

সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনে পরীক্ষিত এই অহিংসাকে তিনি মানব সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিলেন। যে সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক করা সম্ভব হয়েছে, সামাজিক ভাবেও তাকে সার্থক করা সম্ভব হবে, এটাও তিনি সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়ম বলে বুঝতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকগুরু এইভাবে তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করে না রেখে সমাজের সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করেছেন। গান্ধীজীও তাই করেছেন। তবে গান্ধীজীর অসাধারণত্ব এই যে, তাঁর মত এত ব্যাপকভাবে মানুষের সমাজকে ইতিহাসকে ও সভ্যতাকে এত বৃহৎ কর্মযোগ দ্বারা গড়ে তোলবার পূর্বদৃষ্টান্ত অতীতে নেই। সত্যগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে একক জীবনে সম্ভব, কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হয়ে সত্যাগ্রহকে জাতিগতভাবে সার্থক করার প্রয়াস করেছেন। আত্মবলিদান ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব, পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম অনেক ঘটনা হয়েছে। প্রবল এবং প্রবলসংখ্যক অন্যায়ীর বিরুদ্ধে সত্যরক্ষার জন্য একা প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছে এবং প্রাণ দিয়েছে এবং তার ফলে অন্যায়ীর প্রতাপ শেষ পর্যন্ত খর্বিত হয়েছে—এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বহু আছে। ব্যক্তিগতভাবে অহিংস প্রতিরোধের এই পদ্ধতিকে মহাত্মা গান্ধীই জাতিগতভাবে পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। একটি ব্যক্তির আত্মবলিদানে যদি এত বড় কাজ হয়, তবে একটি জনতার আত্মবলিদানে কি আরও বড় কাজ হবে না? গান্ধীজীও বলেছিলেন, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অহিংসার পরীক্ষায় যদি ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটী মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়, তাতেও তাঁর কোন দুঃখ নেই। একটা জাতি নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে বিশ্বসমাজকে যদি কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে, তবে মানুষের ইতিহাসই জয়যুক্ত হলো।

ইতালীর গির্জায় ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে তিনি তাই উপলব্ধি করেছিলেন—পরের কল্যাণের জন্য কোন ব্যক্তি যেমন নিজের জীবনে দুঃখ বরণ করে নেবার ফলে মহৎ ও শুদ্ধ হয়, কোন জাতিকেও মহৎ ও শুদ্ধ হতে হলে তেমনি জাতিগতভাবেই স্বেচ্ছায় দুঃখনির্যাতন বরণ করতে হবে। ভারতবর্ষকে তাই তিনি গণসত্যাগ্রহ বা জাতিগতভাবে অহিংস সংগ্রামের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। এত ব্যাপকভাবে এই পরিকল্পনা অনুসারে অহিংস সংগ্রামের পরীক্ষা ইতিহাসে পূর্বে কখনো হয় নি।

অহিংসার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী যেসকল উক্তি করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ কয়টি উক্তি বিচার করা যাক :

(ক) আমি নিছক কল্পনাবিলাসী নই, আমি কাজের আদর্শবাদী। অহিংসা শুধু ঋষি এবং মহাপুরুষদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও সমান গ্রহণযোগ্য ধর্ম। অহিংসা মানুষজাতির বংশগত জীবনের নিয়ামক বিধান, যেমন হিংসা হলো পাশব আচরণের নিয়ামক। কিন্তু পশুদের মধ্যেও আত্মিক-শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে। পশুর পক্ষে শুধু গায়ের জোরের নিয়ম ছাড়া আর কোন নিয়ম উপলব্ধি করার শক্তি নেই। মানুষ জীব হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্যই মানুষকে মহত্তর নিয়ম এবং আত্মিক শক্তির প্রতি অনুগত হয়ে চলতে হয়। * * * যেসকল ঋষি হিংসার পৃথিবীতে অহিংসার নিয়ম আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাঁরা নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকের চেয়ে বেশী প্রতিভাবান ছিলেন। তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়ে বেশী বীর যোদ্ধা ছিলেন।

(খ) প্রকৃত ডেমাক্রেসী বা গণতন্ত্র একমাত্র অহিংস পন্থায় লাভ করা ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

(গ) 'পূর্ণ-অহিংসা' কোন দেহধারী মানুষের পক্ষে আচরণে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। পূর্ণ-অহিংসা একটা থিওরির মত আনুমানিক সত্য, যেমন বিন্দু বা সরলরেখা সম্বন্ধে ইউক্লিডের থিওরি। কিন্তু এই থিওরি অনুসারেই জীবনের প্রতি মুহূর্ত ধরে আমাদের প্রয়াস করতে হবে।

(ঘ) অহিংসা অর্থ শুধু অ-হত্যা (non-killing) নয়।

(ঙ) অহিংসা-অর্থে অসৎ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা বোঝায় না। অহিংসা একটি সক্রিয় সংগ্রামের ধর্ম।

(চ) অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, শক্তিমানের অস্ত্র।

(ছ) কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসা ভাল।

শুধু কাজের বহির্পদ্ধতি বিচার করে হিংসা বা অহিংসার বিচার করা যায় না। কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য বা মন কাজ করছে, তাই দিয়ে কাজ বা আচরণের হিংসা বা অহিংসা প্রমাণিত হয়। ঘাতকের ছুরিকা এবং চিকিৎসকের ছুরিকা, উভয়েই মানুষের দেহে আঘাত করে। কিন্তু ঘাতকের ছুরিকাঘাত হিংসার ব্যবসায়, চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার অহিংসার ব্যবসায়। পিতা-মাতা

অল্পবয়স্ক সন্তানকে শিক্ষার জন্য যে শাস্তি দেন, সেটা রূঢ় আচরণ হলেও হিংসার আচরণ নয়। অহিংস আচরণে প্রতিশোধের স্পৃহা থাকবে না, অমঙ্গল কামনা থাকবে না। অন্যায়কারীকে জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, পূর্ণ প্রীতির ভাব নিয়েই তাকে বাধা দিয়ে তাকে নিবৃত্তি করতে হবে। অহিংস আচরণের মধ্যে অহমিকা বা স্বার্থের কোন স্পর্শ থাকবে না।

অস্ত্রের জোরে বা গায়ের জোরে অন্যায়কারীকে পরাভূত করা যায়। ফাসিস্তি গায়ের জোরে বড় হয়ে উঠে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তাইতে ফাসিস্তির স্থায়ী জয় প্রমাণিত হয় না। কোন অতি-ফাসিস্তির বাহুবলের কাছে আবার ফাসিস্তির পরাজয় হতে বাধ্য। হিংসার শক্তির মধ্যে ছোট-বড় ভেদ আছে। রাইফেল-সজ্জিত হিংসার কাছে লাঠি-সজ্জিত হিংসা সহজেই পরাভূত হয়। আবার আণবিক বোমায়-সজ্জিত হিংসার কাছে রাইফেল-মেশিনগানের হিংস্র শক্তি পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু এভাবে এক হিংসা দিয়ে অন্য হিংসাকে পরাভূত করে পৃথিবীতে হিংসারই উৎকর্ষ হয়ে চলেছে, এবং এই পদ্ধতিতে হিংসার বিরামও কোন দিন হবে না।

কিন্তু অহিংস শক্তির প্রয়োগে এই সমস্যা নেই। একজন কায়মনোপ্রাণে অহিংস ব্যক্তি এক লক্ষ অস্ত্রসজ্জিত হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে, অহিংসার মত এত বড় সার্বজনীন অস্ত্র আর নেই। এমন কি শিশুর পক্ষেও অহিংসার সাহায্যে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অহিংস পন্থার আরও কতগুলি শ্রেষ্ঠত্ব আছে: (ক) অহিংস পথে প্রয়াস করে যে ফল লাভ হয় সেটা স্থায়ী ফল। (খ) অহিংস পন্থায় সব চেয়ে দ্রুত এবং অল্প সময়ে লক্ষ্য লাভ হয়। (গ) অহিংস পন্থায় প্রয়াস করলে যে ফল লাভ হয়, তাও সার্বজনীন হয়। অর্থাৎ জনসাধারণ সে ফলের অধিকার লাভ করে। সহিংস পন্থায় পরিচালিত সফল সংগ্রামে অল্পসংখ্যক সংঘবদ্ধ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আসে এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তার ফলভোগী হয়। (ঘ) অহিংস পন্থার প্রয়াসে 'পরাজয়' বলে কোন ব্যাপার নেই। সহিংস পন্থায় সংগ্রাম করতে গিয়ে পরাভূত হলে স্বভাবতঃ মনোবল হানি হয়, নৈতিক অবসাদ ঘটায়। কিন্তু অহিংস সংগ্রামী তার প্রতিজ্ঞাকে রক্ষার জন্য শান্তভাবে নিজের দেহ ও প্রাণকে দুঃখনির্যাতন ও আঘাতের মধ্যে লুপ্ত করে দিতে প্রস্তুত। সুতরাং, তার মৃত্যুই সব চেয়ে বড় প্রতিবাদ। তার মৃত্যুই তার বিদ্রোহকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। যে অন্যায়ী

অহিংস সৈনিককে আঘাত দেয়, সে কখনই এ সন্তোষ লাভ করে না যে সে 'জয়ী' হয়েছে।

অক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিষং দানেন সচ্চেন অলীকবাদীনং।

বৌদ্ধ ধর্মপদের এই শ্লোকে অহিংস সংগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধীকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে, দান দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করতে হয়। শক্তি হিসাবে অহিংসাই বড়, প্রাচীন ভারতীয় মনীষী এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখা যায় যে হিংসার দ্বারা হিংসা পরাভূত হয় নি। পদার্থ-বিজ্ঞানের গাণিতিক সূত্রের মত অহিংসাও মানুষের প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম ও নিয়ামক, শক্তি ও নীতি।

পূর্ণ নির্ভয়ের দীক্ষা একমাত্র অহিংসার সাধকেরই পক্ষে প্রাপ্তব্য। অতি-ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকের মনও ভীরু হতে পারে। যে মুহূর্তে তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে, সে মুহূর্তে তার পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু অহিংস সৈনিকের মন সকল ভয়ের উর্ধ্বে, তার শক্তি তার হৃদয়ে নিহিত, অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নয়। তাই অহিংস কর্মী সৈনিক বা সাধক আত্মসমর্পণ জানে না। কারণ, তার মন সমর্পিত হয়ে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে। দ্বিতীয় বার বা নতুন করে তার পক্ষে কোথাও আত্মসমর্পণের দরকার হয় না। অহিংসা একটা বুদ্ধিজ সংস্কার মাত্র নয়, হৃদয়গত অনুভব বা ভাব মাত্র নয়। অহিংসার ভিত্তি হলো ঐকান্তিক ঈশ্বর-বিশ্বাস। যার সত্তা এই বিশ্বাসের দীক্ষা গ্রহণ না করেছে, তার পক্ষে প্রকৃত অহিংস হওয়া সম্ভব নয়।

———

সত্যাগ্রহ—সংগ্রামে ও সংগঠনে

অহিংস নীতি অনুসারে লক্ষ্যলাভের জন্য কর্ম ও প্রয়াসই হলো সত্যাগ্রহ, সংক্ষেপে সত্যাগ্রহের তাৎপর্য এইভাবে বলা যায়। অস্ত্রশক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের সংগ্রামে যেমন পদ্ধতি ও ভঙ্গী আছে, সত্যাগ্রহেও তাই আছে। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের সংগ্রামও অহিংসানুগ সত্যাগ্রহের দ্বারা চালিত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর মতে সত্যাগ্রহই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। অন্যায়ীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা, অন্যায়ীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ, এবং শুধু নতুন কল্যাণ গড়ে তোলা বা সংগঠন—এই তিন ক্ষেত্রেই কর্মীর পক্ষে সত্যাগ্রহ-পদ্ধতি সমান সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অস্ত্রশক্তির কার্যকারিতা আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে সফল হলেও সংগঠনের ক্ষেত্রে অস্ত্রশক্তি একেবারে নিষ্প্রয়োজন। আবার আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের ক্ষেত্রে অস্ত্রশক্তির যে সাফল্য দেখা যায়, সেটা স্থায়ী এবং যথার্থ সাফল্য কিনা, সে সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অস্ত্রশক্তির দ্বারা অন্যায়ীর বিরুদ্ধেও যে আক্রমণ চালিত হয়, সে আক্রমণে শুধু অন্যায়ীকেই পরাজিত করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের পরাজয় হয় না। ন্যায়ীর পক্ষেও অস্ত্রশক্তির দ্বারা সংহারক প্রথায় অন্যায়ীকে আক্রমণ করার মধ্যে কতগুলি আশঙ্কার কারণ থাকে। ন্যায়ী যদি অস্ত্রশক্তির দ্বন্দ্বে অন্যায়ীর কাছে পরাজিত হয়, তবে ন্যায়ীর নৈতিক এবং আত্মিক অবসাদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া, অস্ত্রশক্তি বা সংহারক শক্তি এমনই একটি বস্তু যা সাধুর চেয়ে অসাধু, এবং মানবিক চেয়ে দানবিক প্রকৃতির মানুষের হাতেই দক্ষতর প্রয়োগ লাভ করে।

তাই মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে সংগ্রামের এমনই এক পদ্ধতি টেকনিক ও আদর্শ উদ্ভাবন করেছেন, যার মধ্যে 'পরাজয়ের' কোন সম্ভাবনা নেই। সত্যাগ্রহ অর্থ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' (Passive Resistance) নয়। সহিংস সংগ্রামের মত সত্যাগ্রহের জন্য অর্থ অস্ত্র ও অন্যান্য বস্তুসম্ভারের প্রয়োজন নেই, দৈহিক বলশালিতার কোন দরকার নেই। ব্যক্তিগত ভাবে একা একা, এবং সকলে মিলে সমষ্টিগত ভাবেও সত্যাগ্রহ চালনা করা যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে—রাজনীতি, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব। নারী

পুরুষ ও শিশু, প্রত্যেকের পক্ষেই সত্যাগ্রহ করা সম্ভব। অহিংস সংগ্রামের তুলনায় সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইখানে; সত্যাগ্রহের সুযোগ কার্যকারিতা প্রযোজ্যতা ও ক্ষেত্রের রূপ অতি ব্যাপক। সশস্ত্রবাহিনী যেমন গঠিত হয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রণালী অনুসারে, তেমনি সত্যাগ্রহী 'বাহিনী'ও ট্রেনিং দিয়ে সংগঠন করা সম্ভব।

সত্যাগ্রহীর কতগুলি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী চারিটি 'মৌলিক যোগ্যতার' উল্লেখ করেছেন: (ক) সত্যনিষ্ঠা, (খ) পরিচালকের প্রতি পূর্ণ আস্থা, (গ) ব্যক্তিগত সকল সুখ ও স্বার্থ, এবং এমন কি প্রাণ বিসর্জন দেবার মত সংকল্পিত মনোবল ও (ঘ) প্রতিপক্ষের সম্বন্ধে 'বাক্যে আচরণে ও চিন্তায়' হিংসা আক্রোশ বা আঘাতের ইচ্ছা পোষণ না করা।

সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য কি?

(১) সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার পর ক্রমান্বয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি হতে থকে। সামরিক বাহিনীব সংগ্রামের মত এর মধ্যে গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাবার কোন ব্যাপার নেই। যত দিন যাবে, ততই এর শক্তির প্রসার ঘটতে থাকবে।

(২) সত্যাগ্রহরূপে চালিত সংগ্রামের দ্বারা যে অধিকার লাভ হয় তা স্বাভাবিক ভাবে এবং আপনা-আপনি জনসাধারণের হাতে চলে আসে। সত্যাগ্রহের দ্বারা অর্জিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অথবা সম্পদের অধিকারী হয় জনসাধারণ।

(৩) মাত্র একজন 'প্রকৃত সত্যাগ্রহীর দ্বারাই এক বিরাট অন্যায়কে পরাভূত করা'ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সত্যাগ্রহীর শক্তি সংখ্যাবহুলতার ওপর নির্ভর করে না।

(৪) জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অহিংস নীতিতে গঠিত করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ হয়েছে, শুধু এমন মানুষই যে সত্যাগ্রহ করতে পারে তা নয়। বিশেষ লক্ষ্যের জন্য বিশেষ কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ আন্দোলনে সৈনিকোচিত নিয়মানুবর্তিতা মেনে নিয়ে তার পক্ষে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব, অর্থাৎ সহিংস গণযুদ্ধের মত অহিংস গণ-সত্যাগ্রহও সম্ভব।

(৫) নেতা বা নায়কের অবর্তমানেও সত্যাগ্রহ চলতে পারে। কারণ সত্যাগ্রহীর সংকল্প ও নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তি তার নিজের মনে ও বিশ্বাসে!

অস্ত্রধারী সেনাদলের মত নেতার অবর্তমানে সত্যাগ্রহীর সংগ্রামশক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে না, অথবা মনোবল ভেঙ্গে যায় না।

অসহযোগ (Non-co-operation), সবিনয় অবজ্ঞা (Civil Disobedience), সবিনয় প্রতিরোধ (Civil Resistance), ইত্যাদি নামে পরিচিত এক একটী আন্দোলন সত্যাগ্রহেরই বিভিন্ন রূপগত প্রকাশ। সত্যাগ্রহই প্রকৃত ধর্মযুদ্ধ, যার পদ্ধতি এবং লক্ষ্য উভয়ই ধর্মসঙ্গত, কারণ অহিংসাই বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র ধর্ম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে, অথবা আত্মকৃত ভ্রান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে যে অনশনব্রত গান্ধীজী কয়েকবার অবলম্বন করেছিলেন, তা সত্যাগ্রহেরই আর-একটী রূপ। একক ভাবে, সমষ্টিগত ভাবে, অহিংসায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে, সাধারণ ভাল-মন্দে মিশ্রিত মানুষকে নিয়ে, বিদ্রোহের রূপে, বিপ্লবের রূপে, আন্দোলনের রূপে, শান্তি-ব্রত রূপে—বহুবিধ পদ্ধতিতেই সত্যাগ্রহ চালিত করা যায়। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কয়েকটী পদ্ধতির উদ্ভাবন ও পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু অস্ত্রশক্তির দ্বারা চালিত সংগ্রামে যেরকম হয়ে থাকে, অহিংস সত্যাগ্রহে সেরকম পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নেই। সহিংস সংগ্রামকে যেমন অধিকতর প্রবল অস্ত্রশক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ করে রাখা যায়, সত্যাগ্রহকে সেভাবে অবরোধ করা যায় না। যে কোন অবস্থার মধ্যেই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায়। কারণ প্রকৃত অহিংস মনোভাবে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিত্য নতুন সত্যাগ্রহের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব। শৃঙ্খলিত বন্দীও সত্যাগ্রহ করতে পারে। সত্যাগ্রহের পদ্ধতির শেষ নেই।

সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রেও পালনীয় কর্তব্যের কতগুলি মূল নীতি আছে :—

(১) সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে আঘাত দেবেন না, স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষের সকল আঘাত ও নির্যাতন নিজের ওপর বরণ করে নেবেন।

(২) প্রতিপক্ষের সঙ্গে বুঝাপড়া করবার অথবা প্রতিপক্ষের কাছে থেকে দাবী আদায় করবার জন্য আলোচনা ইত্যাদি অন্য পন্থায় সকল চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবেই সত্যাগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়।

(৩) সত্যাগ্রহে গোপনতার কোন স্থান নেই।

(৪) সত্যাগ্রহীর দাবী হবে ন্যূনতম।* দাবী করার মত বহু বিষয় থাকলেও, শুধু একটী সব-চেয়ে-কম পরিমাণের দাবী উপস্থিত করতে হবে।

(৫) প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা, চাপ দেওয়া, কৌশলে অপ্রস্তুত করা ইত্যাদি আচরণের কোন স্থান নেই সত্যাগ্রহে।

এপর্যন্ত সত্যাগ্রহের পদ্ধতি নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যতটুকু বলা হলো, তাই থেকে এই ধারণা করতে হয় যে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ নামে সংগ্রামের এক নতুন বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছেন। মানুষের ইতিহাসে এবং দৈনন্দিন জীবনে, অতীত থেকে বর্তমানের মুহূর্ত পর্যন্ত শত সহস্র অহিংস সংগ্রামের ঘটনা ঘটে চলেছে। রাজা ও রাষ্ট্রের সুগঠিত বাহিনীর রণনির্ঘোষ এবং অস্ত্রের ঝনৎকার শুনে সাধারণতঃ এই ধারণাই মানুষের হয়েছে যে, সংগ্রাম জিনিসটাই বুঝি অস্ত্রশক্তির সমারোহ। কিন্তু বিনা অস্ত্রে প্রতিদিনের জীবনে যে সংগ্রামে জয়-পরাজয়ের নির্ণয় হয়ে চলেছে, তা স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়ে না, কারণ সে সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও অভাব আছে। মানুষ নিজেরই অজ্ঞাতসারে চিরকাল ধরে তার জীবনের নানাক্ষেত্রে যে অহিংস পন্থায় সংগ্রাম করে আসছে, মহাত্মা গান্ধীর আবিষ্কারক-মন তার স্বরূপ ধরতে পেরেছে। যা অজ্ঞাতসারে চলছিল মহাত্মা গান্ধী তাকেই নীতি সূত্র ও প্রণালী দিয়ে একটী জ্ঞাতসারে সাধিতব্য সংগ্রামের বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারই নাম সত্যাগ্রহ। পারিবারিক জীবনে দেখা যায়, লাঞ্ছিত প্রিয়জন যখন প্রতিবাদ হিসাবে অনশন করে, তখন তার আবেদন বড় প্রবল হয়। শত শত ঘটনায় এমন ব্যাপার দেখা যায় যে, আঘাতকারীকে পাল্টা আঘাত দেবার চেষ্টা না ক'রে এবং কটুকথায় নিন্দা বা আক্রোশ প্রকাশ না ক'রে কোন ব্যক্তি নিঃশব্দে চলে গেছে, তখনই আঘাতকারী বিচলিত হয়ে উঠেছে এবং মার্জনা চেয়েছে। জগাই-মাধাইয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত কলসীর কানায় শ্রীনিত্যানন্দ আহত হলেও প্রতিবাদরূপে তাঁর মনে তিল মাত্র আক্রোশের উদয় হয়নি। বরং জগাই-মাধাইয়ের হিংসার বিনিময়ে তিনি প্রেম দান করার জন্যই উদ্যত হয়েছিলেন, এবং হিংসার বদলে প্রেম দান করবার এই

* জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির কৌরবদের কাছে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দাবী করেছিলেন। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রাম। যুধিষ্ঠির তাঁর এই ন্যূনতম দাবীর দ্বারা বস্তুতঃ সত্যাগ্রহসম্মত আচরণের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

'সত্যাগ্রহ' জগাই-মাধাইয়ের সমগ্র সত্তায় কি পরিবর্তন এনেছিল, সে কাহিনী সর্বজনবিদিত।

কিসের পরিবর্তন? কেমন ক'রে এই পরিবর্তন আনতে হয়? মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহের দার্শনিক এবং মনস্তত্বগত ভিত্তি এই দুটী প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

হৃদয়ের পরিবর্তন। মানুষের হৃদয়ে যে কল্যাণধর্মী চেতনা ও শুভপ্রবৃত্তি নিহিত রয়েছে, তাকে জাগ্রত ক'রে তোলবার একটা টেকনিক আছে। নিজে অহিংস হ'লে, এবং একমাত্র অহিংস পন্থাতেই অপরের অন্তর্নিহিত সদ্বুদ্ধি ও কল্যাণ-চেতনাকে উদ্বোধিত করা সম্ভব। মানুষ স্বভাবতঃ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, হিংসা মিথ্যা লোভ ইত্যাদি অশুভ সংস্কার সে লাভ করে অবস্থার বৈগুণ্যে ও পরিবেশে। মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্ ইত্যাদি জড়বাদী সমাজতাত্ত্বিকেরাও এই কথা বলে থাকেন যে মানুষের ভিতরটা ভাল, অর্থাৎ স্বভাবধর্মে মানুষ হলো সৎ ('essentially good')।

অন্যায়কারীকে পাল্টা হিংসার আঘাত দিলে তার এই অন্তর্নিহিত সদ্বুদ্ধিকে জাগ্রত করা যায় না। বড় জোর সে বিব্রত হয়ে অথবা ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু তার ফলে অন্যায় করার ইচ্ছা তার মনের মধ্যে সজীব হয়ে থেকেই গেল। গান্ধীজীর পথ ভিন্ন। অন্যায়কারীর হৃদয়-পরিবর্তন ('change of heart') করাই তাঁর লক্ষ্য, তারই উপযোগী পন্থা হলো সত্যাগ্রহ।

নিজের অহিংসা দিয়ে অন্যায়ীকে অহিংস ক'রে, নিজের শুদ্ধতা দিয়ে অন্যায়ীকে শুদ্ধ ক'রে যে জয় লাভ হয়, তাই প্রকৃত জয়, কারণ প্রতিপক্ষও এক্ষেত্রে 'অবনত' বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

সমূহ সংগ্রাম ('total war') নামে একটা কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হতে শোনা গিয়েছিল। সমগ্রভাবে সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধকে প্রসারিত করা, অর্থাৎ সর্বগ্রাসীযুদ্ধ। কিন্তু এই ধরণের সহিংস 'সমূহসংগ্রাম' প্রকৃত সমূহসংগ্রাম নয়। এর সমগ্রতা শুধু সমগ্র ধ্বংস করার কৃতিত্বে সীমাবদ্ধ। সমূহ সংগ্রাম যদি প্রকৃত অর্থে কোন সংগ্রামকে বলা যায়, তা হলো সত্যাগ্রহ। এ সংগ্রামে যুধ্যমান দুই পক্ষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত হয়। সত্যাগ্রহের চেয়ে বেশী বৈপ্লবিক অর্থাৎ সমূহ পরিবর্তনমূলক আর কোন সংগ্রাম নেই। মহাত্মা গান্ধীর একটী উক্তি উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে যে এবিষয়ে তিনি কত বড় নীতি পোষণ করতেন:

"প্রেমের ক্রিয়াশীল নীতি থেকেই সত্যাগ্রহ উদ্ভূত হয়েছে। এই নীতি বলে—যারা তোমাকে ঘৃণা করছে তাদের ভালবাস। সুহৃদ্‌কে ভালবাসা খুবই সহজ। কিন্তু শত্রুকেও ভালবাসতে হবে।"

শত্রুকে ঘৃণা করো না, মাত্র এই নাস্তিবাদ নয়। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ সর্বব্যাপক প্রেমের অস্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহ এমনই এক সংগ্রাম, যার অন্তে পরাজয় হয় শুধু অন্যায়ের। বস্তুতঃ জয়ী হয় উভয় পক্ষ। যেমন সত্যাগ্রহী তেমনি সত্যাগ্রহীর প্রতিপক্ষ, উভয়েই শুদ্ধ হয়।

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এপর্যন্ত যা বলা হলো, তার মধ্যে সত্যাগ্রহের সংগ্রামগত কথাই বেশী করে বলা হয়েছে। কিন্তু সত্যাগ্রহ মাত্র সংগ্রামই নয়, সত্যাগ্রহ একটী ব্রত, অর্থাৎ সংগঠনগত সাধনার পন্থা। নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য এবং সাধারণের কল্যাণ সৃষ্টি করার জন্য ব্রতরূপে প্রতিদিনের জীবনে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন আছে।

(ক) চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ পবিত্রতার সাধনা। (খ) ভয় বর্জন। (গ) ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস। (ঘ) বিনয়। (ঙ) ভ্রান্তি স্বীকার। (চ) -ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তির সংযম। (ছ) নির্লোভ।

সংসারত্যাগী বিবাগী হবার জন্য নয়, সাধারণ সংসারী মানুষ হিসাবেই আনন্দময় জীবনের অধিকারী হবার জন্য এই ব্রতের সার্থকতা মহাত্মা গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যাগ্রহী হয়ে সাধারণ মানুষকে জীবনযাপন করার এক নতুন সংহিতা তিনি রচনা করে গেছেন তাঁরই সমগ্র বাণী দিয়ে এবং সেই বাণীকে ফলিত বিজ্ঞানের সূত্রের মত তাঁরই বাস্তবজীবনে প্রয়োগ ক'রে তার বৈজ্ঞানিক সত্যতাও প্রমাণিত করে গেছেন।

মধ্যপথের আদর্শ

পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাস বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাস। জীবন যাপনের জন্য মানুষ তার চিন্তা ও কর্মের দ্বারা পরিবেশ সৃষ্টি করে, সে পরিবেশের আবার পরিবর্তনের প্রয়োজন আসে। মানুষ নিজেই আবার তার চিন্তা ও কর্মের দ্বারা সে পরিবর্তন সাধন করে।

এই পরিবর্তনের ইতিহাসে কতগুলি নিয়ম দেখা যায়। পৃথিবীর বহু সমাজবিজ্ঞানী এই সব পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী পার্থিব পরিবর্তনের ইতিহাসে যে সামাজিক নিয়মের লীলা লক্ষ্য করতে পেরেছেন, সে নিয়ম হলো 'মধ্যপথ'। পুরাতন থেকে নতুনে যে ঘটনার রূপ পরিবর্তিত হবার জন্য ধাবিত হয়ে চলেছে, তার নিয়ম ধ্বংসধর্মী নয়। উচ্ছেদ ক'রে, লুপ্ত ক'রে ও দলিত ক'রে চলা মানবীয় কল্যাণের পদ্ধতি নয়। কল্যাণমূলক পরিবর্তন প্রতি ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে পুরাতনে ও নতুনের মাঝখানে একটা সমন্বয়ের পথ খুঁজে চলে। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে নতুনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে কোন গতিধর্মী (Dynamic) আবেগ সৃষ্টি হয় না। এমন নূতনত্ব সহজেই অচলতা প্রাপ্ত হয়। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডিরোজিওর কাছে ছাত্রসমাজ নূতনত্বের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। জাতীয় ঐতিহ্যের সব কিছু বর্জন ক'রে একেবারে পূর্ণ ইংরাজীয়ানা একটা উন্নত মতবাদরূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল যে এই পুরাতনবর্জিত পূর্ণ নূতনত্ব সচল হলো না। বরং জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে নতুনকে গ্রহণ করার জন্য ব্রাহ্মসমাজ যে মধ্যপথের আদর্শ ধরেছিল, সেই আদর্শ সমাজের জীবনে সচলতা লাভ করেছিল। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা ক'রে নতুনকে গ্রহণ করার আবেদন ছিল, তাই সেই আবেদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে সময়ের প্রচারিত কোন পূর্ণ বিজাতীয় নূতনত্ব অথবা পূর্ণ পুরাতনপন্থী গোঁড়ামি, কোনটাই দাঁড়াতে পারেনি। মধ্যপথের আদর্শই সচলতা লাভ ক'রে ভারতীয় সমাজের চিন্তায় প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে 'মজ্ঝিম নিকায়' নামে একটা কথা আছে; এর অর্থ মধ্যপথ।

অ্যারিস্টটলের নীতিতেও 'সুবর্ণ মধ্য' (Golden Mean) নামে একটা কথা আছে, যার তাৎপর্য এই যে, মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক পরিবর্তনে দেখা যায় যে, তার মধ্যে অশোভন নিষ্প্রয়োজন অন্যায় অসৎ ইত্যাদি অনেক নেতিবস্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তারই জন্য মনে হতে পারে যে, ধ্বংস ক'রে দেওয়াই বুঝি পরিবর্তন সাধনের স্বাভাবিক পন্থা ও নিয়ম। কিন্তু তা নয়। আগুন ধ্বংস করে, কিন্তু আগুনেরই উদ্ভব হলো দুই পদার্থের সংযোগ বা মিলনশক্তি থেকে। তেমনই প্রত্যেক পরিবর্তনে অনেক কিছু অবান্তর বস্তু ধ্বংস হয়, তাই ব'লে পরিবর্তন দুই শক্তির বিরোধ থেকে উদ্ভব হয় না। দুই শক্তির সংযোগ থেকে, পুরাতন ও নতুনের সমন্বয় থেকে উদ্ভব হয়। পুরাতনের মধ্যে যা সৎ ও কল্যাণ রূপে রয়েছে, তাই নতুনের সৎ ও কল্যাণের হাত ধরে, এই মিলনবাদই পরিবর্তনের নিয়ম। সমগ্র পুরাতনের ওপর আঘাত দিয়ে অতি দ্রুত নতুনের প্রতিষ্ঠা করার যে পন্থাকে সাধারণত: বৈপ্লবিক পন্থা বলা হয়, সে পন্থায় এই হানি হয় যে, পুরাতনের কিছু কিছু মন্দ ও অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাল এবং ন্যায়েরও ধ্বংস হয়। তা ছাড়া, এ ধরণের সমূহভাবে পুরাতনধ্বংসী পরিবর্তন সাধনের চেষ্টায় যেটুকু 'সুফল' পাওয়া যায়, তা'ও স্থায়ী হয় না। দৃষ্টান্ত, ফরাসী বিপ্লব।

ইতিহাসের মধ্যে যে প্রবাহধর্ম রয়েছে, তার স্বরূপ যার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে, তার পক্ষে এই মিলনবাদ ও মধ্যপথের তত্ত্ব উপলব্ধি করা সহজ। পুরাতন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে নয়, পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা ক'রেই ঘটনার প্রবাহ চলেছে। 'মধ্যপথ' সেই গতিপ্রবাহের খাত। প্রস্তরযুগের মানুষের জ্ঞান ও কর্মের তুলনায় লৌহযুগের মানুষের জ্ঞান ও কর্মকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই মনে হবে, উভয়ের মধ্যে মস্ত বড় ব্যবধান। কিন্তু এই ব্যবধান অর্থ উভয়ের মধ্যে ইতিহাসের বিচ্ছেদ নয়। মাঝখানে সহস্র বৎসর ধরে সেই প্রস্তরযুগের মানুষের জ্ঞান ও কর্ম সহস্রবার নতুনের সঙ্গে মধ্যপথে মিলিত হয়েছে। পুরাতন মধ্যপথ থেকে নতুন মধ্যপথ—এই হলো পরিবর্তনের রূপ। পূর্বের মধ্যপথ রেখা থেকে পরবর্তী মধ্যপথ রেখা পর্যায়ক্রমে উন্নত।

পুরাতন থেকে নতুনে ঘটনার গতি মধ্যপথ ধরে অগ্রসর হয়। এই এগিয়ে চলা কখনো ধীরগতি, কখনো বা প্রবলগতি। ক্রমবিকাশ এবং বিপ্লব উভয় রূপেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। পরিবর্তনের দুটী প্রক্রিয়াই ইতিহাসে দেখা যায়। এবিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হলো :

"ক্রমবিকাশ অথবা বিপ্লব, উভয় পদ্ধতিতেই জাতির উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়। দুটীরই প্রয়োজন আছে। 'মৃত্যু' জীবনের একটী অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কিন্তু এই মৃত্যুই আবার জন্মরূপে দেখা দেয়। এই পরিবর্তন হলো বৈপ্লবিক। মানুষের উন্নতির জন্য যেমন জীবনের প্রয়োজন, ঠিক তেমনই মৃত্যুরও প্রয়োজন! ঈশ্বরের চেয়ে বড় বিপ্লবী আর কেউ নেই। যে পর্বত-মালাকে তিনি দীর্ঘ ধৈর্য ও যত্ন দিয়ে গড়েছেন, এক মুহূর্তে তিনি তাকে চূর্ণ ক'রে সমতলভূমির সঙ্গে মিলিয়ে দেন। তিনি বন্যা প্রেরণ করেন; যেখানে এক মুহূর্ত পূর্বেও শান্ত অবস্থা ছিল, সেখানে ঝঞ্ঝা প্রেরণ করেন! ইতিহাসের বেশীর ভাগই হলো বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিবরণ, তথাকথিত সচেষ্টভাবে পরিকল্পনা ক'রে পরিবর্তন সাধনার ব্যাপার তার মধ্যে কম। ইংলণ্ডের ইতিহাসই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।"

গান্ধীজীর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ বিপ্লব কথাটী যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, মহাত্মা গান্ধী তার থেকে ভিন্নতর অর্থে কথাটী ব্যবহার করেছেন। বিপ্লবের দেশরূপে আখ্যাত ফ্রান্স এবং রুশিয়ার ইতিহাসে নয়, ইংলণ্ডের ইতিহাসেই তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সার্থক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পুরাতন ও নতুনের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে অর্থাৎ মধ্যপথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিই ইংলণ্ডের ইতিহাসে বেশী ক'রে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন কখনো ধীরগতিতে এবং কখনো বা প্রবলগতিতে সম্পন্ন হযেছে।

পরিবর্তনের মধ্যে আকস্মিকতারও স্থান আছে, ঘটনা অভাবিত ভাবে দেখা দিয়ে পরিকল্পনাকে ওলট-পালট করে দেয়। এই দিক দিয়ে বিচাব করলে পরিবর্তনের মধ্যে বৈপ্লবিকতার একটা স্থান আছে বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সজ্ঞানে সে যেখানে পরিকল্পনা ক'রে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়াস করছে, বাস্তবে সেখানে আরও এমন অনেক শক্তির প্রভাব কাজ করছে যা তার বোধ এবং কল্পনাব বাইরে। কাজেই তার কর্মফল সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যা আশা করা যায়নি, তাই হয়তো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ব্যর্থতা ও সাফল্য উভয়ই এই ধরণের বৈপ্লবিক মূর্তিতে দেখা দিতে পারে, এবং তাই সমস্ত ঘটনাকেই মনে হবে যেন একটা আকস্মিকের খেলা।

পরিবর্তনের আর-একটী নিয়ম গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন—সহযোগিতা।

পৃথিবীর সামাজিক উন্নতি সহযোগিতার নীতির জন্যই সম্ভব হয়েছে। বহু ব্যক্তির সহযোগিতায় পরিবার, বহু পরিবারের সহযোগিতায় শ্রেণী ও গোষ্ঠী এবং বহু গোষ্ঠী ও শ্রেণীর সহযোগিতায় জাতির উদ্ভব। প্রাণিজগতে যে সহজাত জৈব হিংসার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, একজনকে গ্রাস করে নিয়ে আর-একজনের আত্মপুষ্টি, সেই পাশব প্রথার ঠিক বিপরীত হলো সামাজিক প্রথা। অপরকে সাহায্য ক'রে, সকলের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ একটু ত্যাগ ক'রেই সামাজিকতা নামে মানবজীবনের একটা সুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে একমাত্র মানুষই অন্য জীবের তুলনায় উন্নত হতে পেরেছে। নিজের ভাগ্য নিজ হাতে গড়বার শক্তি মানুষই পেয়েছে তার সামাজিকতার গুণে। সহযোগিতা 'মধ্যপথ' নীতিরই আচরণগত প্রকাশ।

মধ্যপথ, পরিবর্তনের এই নিয়মে অহিংসা ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে। দ্বন্দ্ববাদ এবং পরকে গ্রাস করার রীতি মূলতঃ হিংসা নামে অবনতিপ্রবণ অপশক্তির প্রকাশ। সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি শিক্ষা শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী সমস্যার সমাধান পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য যে চিন্তা করেছেন, তার সবই মধ্যপথের নিয়মে সমাধান সন্ধানের প্রয়াস। যেমন মানুষের চরিত্রের মধ্যে, তেমনই প্রত্যেক নতুন বা পুরাতন প্রথা ও ব্যবস্থার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয়েরই মিশ্রণ দেখা যায়। সেই কারণে মানুষ বা ব্যবস্থার ওপর সমগ্রভাবে আঘাত দিয়ে পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। দুইয়ের বিরোধ সমাধান করার নিয়ম হলো, দুইয়ের মধ্যে নিহিত সৎ-কে এক সূত্রে সমন্বিত করা। মানুষ পরিকল্পনা না করলেও ঘটনার সমন্বয় হয়ে থাকে, যা নতুন শক্তিরূপে সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়ে যায়।

কতগুলি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত উদ্ধৃত করা যাক, যা থেকে তাঁর মধ্যপথের আদর্শগত তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে :—

শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ :

(১) "আমি পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজমের অবসান চাহি, কিন্তু পুঁজি বা ক্যাপিটালের অবসান চাহি না। পুঁজি জিনিসটা খারাপ নয়, পুঁজির অন্যায় ব্যবহারই হলো খারাপ।"

(২) "ধনিকের পুঁজি যেমন একটা শক্তি, তেমনি শ্রমিকের শ্রমও একটা

শক্তি। এই দু'য়ের সহযোগিতাই সম্পদ সৃষ্টির সুষ্ঠু পথ। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধ হবেই হবে, এমন কোন নিয়ম নেই।"

(৩) "ধনিকের হাত থেকে তার সম্পদ 'কেড়ে নেওয়া' (expropriation) সাম্য প্রবর্তনের পন্থা বলে অনেকে মনে করেন। আমি মনে করি, ধনিকের পক্ষে তার সম্পদ 'ছেড়ে দেওয়া' হলো সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্রেয়স্কর পন্থা।"

ধর্ম :

(১) "প্রত্যেক ধর্মই হলো ভিন্ন ভিন্ন পথ, সবই এক লক্ষ্যে গিয়ে মিলিত হয়েছে। লক্ষ্য যখন এক, তখন ভিন্ন ভিন্ন পথ গ্রহণে কি এমন আসে যায়? সত্যি কথা বলতে গেলে, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, ততগুলি 'ধর্ম' আছে।"

(২) "যে নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে পরের ধর্মের অন্তরেও প্রবেশ করেছে।"

(৩) "প্রত্যেক ধর্ম-মতবাদে সত্য আছে, প্রত্যেক ধর্ম-মতবাদে কিছু না কিছু ভ্রান্তি আছে। আমার কাছে হিন্দুধর্ম যেমন প্রিয়, তেমনই অন্য ধর্মও প্রিয়।"

জাতীয়তা :

"জাতীয়তার প্রতি আমার প্রীতির কারণ এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে আমার ধারণা হলো এই : মানুষ জাতি যাতে সুখী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে তারই জন্য আমার দেশের স্বাধীনতা চাই। আমার দেশ লুপ্ত হয়ে গিয়েও তার ফলে যদি মানুষ জাতির মঙ্গল হয়, তবে আমি তাই চাই। আমাদের জাতীয়তার এই আদর্শই হওয়া উচিত।"

সংস্কৃতি :

"আমি আমার ঘরের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলে রাখতে চাই না, ঘরের জানালাগুলিও অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে চাই না। আমি চাই প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি বাতাসের মত অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে আমার ঘরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হোক। কিন্তু এই বাতাসের ঝাপটায় আমি আমার ঘরের ভেতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে রাজী নই।"

প্রাচীন ঐতিহ্য :

"যা কিছু প্রাচীন তাই ভাল, আমি এরূপ কুসংস্কার পোষণ করি না। যা কিছু ভারতীয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছে, মাত্র এই জন্যই কোন বস্তু ভাল, আমার এধরণের কোন বিশ্বাস নেই।"

স্বদেশী :

"বিদেশে উৎপন্ন সর্বপ্রকার সামগ্রীকে বর্জন করাই স্বদেশী, আমি কখনো একথা বলিনি। * * * দেশের মঙ্গল হতে পারে, বিদেশজাত এমন কোন সামগ্রীকেও বর্জন করা সঙ্কীর্ণ 'স্বদেশী'। * * * 'স্বদেশী'র মত ভাল আদর্শকেও যদি বিবেচনাশূন্য একটা সংস্কারের মত ব্যবহার করা হয়, তবে সেটা ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। * * নিজের দেশে যে পণ্য উৎপাদনের সুবিধা নেই বা দেশবাসীর যোগ্যতা নেই, সেই পণ্যকেই উৎপাদনের জন্য অর্থ ও সময় অপচয় করা এবং বিদেশজাত সেই পণ্যকে বর্জন করা বস্তুতঃ একটা অপরাধ।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য :

"আমি প্রাচ্য সভ্যতা থেকে আলোক লাভ করেছি। এর অর্থ এই নয় যে আমি কূপের মণ্ডূকের মত হয়ে থাকবো। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে যদি আলো আসে, সে আলো গ্রহণ ক'রে আমি লাভবান হব এবং গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। শুধু আমাকে সাবধান থাকতে হবে যে, পাশ্চাত্যের আলোকের ঝল্‌কানিতে আমার চক্ষু ধাঁধিয়ে না যায়। আলোকের ঝল্‌কানিকে আলোক ব'লে যেন ভুল না করি।"

প্রাদেশিকতা :

"আমি গুজরাটী, কিন্তু যখন আমি বাংলা দেশে থাকবো, তখন বাংলা দেশের যা কিছু ভাল আছে তা অতি দ্রুত আমাকে গ্রহণ করতে এবং শিখে ফেলতে হবে এবং বাংলা দেশের মধ্যে যা খারাপ আছে, তা কখনই স্পর্শ করবো না। বাংলায় থাকবো সদা সর্বদা বাংলা দেশকে সেবা করার জন্যই, কখনো স্বার্থের জন্য তাকে শোষণ করবো না। আমার 'প্রাদেশিকতার' সীমাকে ভারতসীমা পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে, যাতে এই দেশীয় সীমা-ক্ষেত্র শেষপর্যন্ত পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে বিশ্বৈকবোধ জাগ্রত করতে পারে।"

আর্ট বা চারুকলা :

(১) "প্রকৃত চারুকলা শুধু বিষয়ের কর্ম বা বহিরঙ্গকে প্রকাশ করার জন্য নয়, বিষয়ের বাহিরে ও গভীরে যে ভাব রয়েছে তাকেও প্রকাশ করতে হবে। এমন আর্ট আছে যা শুধু বিনাশ করে, এবং এমন আর্ট আছে যা জীবন সঞ্চার করে।"

(২) "আর্টের বহিঃসৌষ্ঠব তখনই সার্থক্ হয়েছে বলা যেতে পারে যখন এই বহিঃসৌষ্ঠব বা রূপের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার ভাব ও রূপ প্রকাশ লাভ করে।"

কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রম :

"বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার যে শ্রম তার মূল্য আছে এবং জীবনে ও সমাজজীবনে তার স্থান আছে। কিন্তু আমি কায়িক শ্রমের মূল্য সম্বন্ধেই বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই। কায়িক শ্রম বাদ দিয়ে চলবার স্বাধীনতা কোন মানুষকে দেওয়া উচিত নয়। কায়িক শ্রম যে করে, তারই বৌদ্ধিক শ্রম বা চিন্তাশক্তি বেশী সৃষ্টিশীল হতে পারে।"

বিবাহ ও দাম্পত্য :

(১) "বিবাহে নরনারীর দেহগত মিলন সাধিত হয়, কিন্তু আদর্শ-বিবাহ হলো তাই যা এই দেহগত মিলনকে আত্মিক মিলনের পন্থা ব'লে গ্রহণ করে। বিবাহের দ্বারা নর ও নারীর মনে যে মানসিক প্রেমের উদ্ভব হয়, সেই প্রেম ভগবানের ও বিশ্বের প্রতি প্রেম অর্জনের একটা প্রয়াসের অধ্যায় মাত্র।"

(২) "স্ত্রী স্বামীর ক্রীতদাসী নয়, তার সঙ্গিনী ও সহকর্মভাগিনী। স্ত্রী স্বামীর সকল সুখ-দুঃখের সমভাগিনী। স্বামীর পক্ষে যেমন তার নিজের পথ বেছে নেবার অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীরও আছে।"

জন্মনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ :

"ব্যক্তির বা সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্তানের জন্ম নিরোধ বা সংযত করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু 'কৃত্রিম' পন্থায় নিরোধক বস্তুর ব্যবহার দ্বারা জন্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। নীতিসঙ্গত জন্মনিরোধের পন্থা হলো স্বেচ্ছাচার সংযম ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন। প্রবৃত্তিকে সংযত না ক'রে শুধু প্রবৃত্তির পরিণামকে কৃত্রিম উপায়ে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার পদ্ধতি আমি সমর্থন করি না।"

নর ও নারীর অধিকারভেদ :

(১) "আমার অভিমত হলো, নর ও নারীর সত্তার মৌলিক কোন প্রভেদ নেই, উভয়ের সমস্যাও মূলতঃ একই মানবিক সমস্যা। দু'জনের মধ্যেই যে আত্মা বিরাজমান, তা একই আত্মা। দু'জনেই একই ভাবে সুখদুঃখকে অনুভব করে। এক জন অপরকে পূর্ণ ক'রে তোলে, একজনের সাহায্য ছাড়া অপর জন চলতে পারে না।"

(২) "কিন্তু এসত্ত্বেও কতগুলি এমন বিষয় আছে, যেখানে নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। মানুষ হিসাবে উভয়ের সত্তার মধ্যে একত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু শারীর গঠনে উভয়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য বিদ্যমান। এই কারণেই দু'জনের জীবনের কর্ম-ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য আসতে বাধ্য। মাতৃত্বের কর্তব্য, বিরাট নারীজগতের অধিকাংশকে এই কর্তব্য পালন করতেই হবে। এই কর্তব্যের জন্যই নারীর পক্ষে এমন কতগুলি গুণ ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন যা পুরুষের মধ্যে না থাকলেও চল্‌তে পারে।"

(৩) "পুরুষ রুটী অর্জন করে, নারী সেই রুটী পরিবেষণ করে। নারী হলো মূলতঃ গৃহিণী। সন্তানকে পালন করা তার বিশেষ দায়িত্ব। যদি নারীকে রাইফেল্ নিয়ে যুদ্ধ করার কর্তব্যে নিয়োজিত করা হয়, তবে সেটা সে সমাজের পুরুষ ও নারী উভয়েরই মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর।"

মেশিন ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ :

(১) "আমি মেশিনের বিরোধী নই। মেসিন মানুষের প্রভু হয়ে যেন উঠতে না পারে আমি এই চাই।"

(২) "আমি ইণ্ডাস্ট্রির বিরোধী নই, আমি ইণ্ডাস্ট্রিয়লিজ্‌ম্ চাই না।"

উল্লিখিত যেকয়টী বিষয়ের সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারই মধ্যে তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধতিটী লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বিষয় ব্যবস্থা প্রথা চিন্তা ও সংস্কার বিশ্লেষণ ক'রে তার ভেতর থেকে সদ্ধর্ম জানবার প্রয়াস। যে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়, যে আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তার বিরোধী নয়—যে বিবাহ নিতান্ত বন্ধন নয়, স্বেচ্ছাচারও নয়—যে উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্যাপিটাল নামে শক্তি আছে অথচ ক্যাপিটলিজ্‌ম্ নামে শোষণ নেই—যে মেশিন মানুষের হাতে চলে, মানুষকে চালায় না—যে স্বদেশীতে বিদেশীর প্রতি ঘৃণা নেই অথচ দেশপ্রীতি আছে—যে নারীত্বে মনুষ্যত্বের গৌরব আছে অথচ পৌরুষের

অনুকরণ নেই—প্রত্যেক সামাজিক বিষয়ে গান্ধীজী সেই মধ্যপথের আদর্শ ব্যক্ত করেছেন। এই ভাবে মধ্যপথানুযায়ী যে পরিবর্তন তাই যথার্থ পরিবর্তন অর্থাৎ অগ্রগতি। পিছিয়ে থাকার সংস্কারের টান এবং সম্মুখের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ ক'রে নয়, ঐ দুই নেতি পরিণামকে পরিহার ক'রে, সৎ ও বাস্তবের ওপর ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে এগিয়ে চলার পথ এই মধ্যপথ।

———

গঠন কর্মপদ্ধতি—অহিংস বিপ্লব

মহাত্মা গান্ধী আঠারটী গঠন কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। গঠন কর্মপদ্ধতির অর্থ হলো—"সত্য ও অহিংস পন্থায় পূর্ণ স্বরাজ রচনা করা"।

পূর্ণ স্বরাজ অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেখানে 'স্বরাজ' নেই। স্বরাজ বস্তুতঃ মানবিক সভ্যতারই একটী আদর্শ। সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এই স্বরাজ হলো সাধনার বিষয়।

তবে, গান্ধীজী তাঁর স্বরাজ সাধনার ক্ষেত্রহিসাবে তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত আঠার দফা গঠন কর্মপদ্ধতিকে মনে হবে যে সেগুলি যেন একান্তভাবে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান। যেমন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এ সমস্যা পৃথিবীর অনেক দেশে নেই। সুতরাং, মনে হতে পারে, গান্ধীজীর গঠন কর্মপদ্ধতি শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। গঠন কর্মপদ্ধতি একটী সার্বজাতিক আদর্শ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সাধন নামক পদ্ধতিটীকে একটা সুস্পষ্ট উদাহরণরূপেই গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো, ধর্মগত বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। ধর্মমতের কারণে এক সমাজ অন্য সমাজ থেকে পৃথক্ হয়ে রয়েছে, বিদ্বেষের প্রকোপে পরস্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হয়ে রয়েছে, এ দৃশ্য বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেই কমবেশী দেখা যায়। ধর্মমতের পার্থক্যের কারণে বিদ্বেষবাদ, এটা পৃথিবীরই এক পুরাতন সমস্যা। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় বিদ্বেষ মানুষের ইতিহাসকে বহু কলঙ্ক ও অভিশাপে লিপ্ত করেছে। সুতরাং, মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নামে যে সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত একটী গঠন কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে গভীরতর এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। বর্তমান সভ্যতাকে এক অতি প্রাচীন গ্লানি থেকে মুক্ত করার নীতি, যুগপুষ্ট একটী মিথ্যাদৃষ্টিকে স্বচ্ছ করার পদ্ধতি। এ যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হয়, তবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর কি?

গান্ধীজীর প্রবর্তিত আঠার দফা গঠন কর্মপদ্ধতির প্রত্যেকটীর মধ্যে এই রকম গভীরতর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেগুলি যেন

কয়েকটী ভারতীয় সমস্যা সমাধানের, বর্তমানের কতগুলি লৌকিক ভ্রান্তি দূরীকরণের প্রয়াস ব'লে মনে হবে। কিন্তু, একটু চিন্তা ক'রে বিচার করলেই বোঝা যায় যে, এই গঠন কর্মপদ্ধতি হলো সার্বজাতিক ঐতিহাসিক সাধনার সুনির্দিষ্ট কয়েকটী পদ্ধতি, যার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নীতি নিহিত রয়েছে।

(১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, (২) অস্পৃশ্যতা পরিহার, (৩) মাদক বর্জন, (৪) খাদি, (৫) গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন, (৬) গ্রাম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা, (৮) প্রৌঢ় শিক্ষা, (৯) নারীসমাজের উন্নয়ন, (১০) জনস্বাস্থ্য শিক্ষা, (১১) স্বভাষা প্রেম, (১২) রাষ্ট্রভাষা প্রচার, (১৩) অর্থনৈতিক সমতা, (১৪) কৃষকের উন্নতি, (১৫) শ্রমিকের উন্নতি, (১৬) আদিবাসীর সেবা, (১৭) কুষ্ঠরোগীর সেবা, (১৮) ছাত্রসমাজের আত্মশিক্ষা।

ভারতবর্ষের কর্মীর কাছে মহাত্মা গান্ধী এই যে আঠারটী গঠন কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করেছেন, তার আর একটু ব্যাখ্যা সন্ধান করলেই দেখা যায় যে, এই গঠন কর্মপদ্ধতি মানবিক সভ্যতাকে সংগঠন করারই পদ্ধতি, সুতরাং বিশ্বের সর্বদেশের কর্মীর পক্ষে গ্রহণীয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এর অর্থ হলো ধর্মমতের পার্থক্যের কারণে সমাজে-সমাজে যে অসৌহার্দ্য দেখা যায়, তার অবলুপ্তি। অস্পৃশ্যতা পরিহার, জন্মগত কারণে উচ্চনীচ ভেদাভেদের সংস্কার বিলোপ। মাদক বর্জন, আহার্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু যুগব্যাপী এক ভ্রান্ত আচারের লুপ্তি। দেহমনের ক্রিয়াকে কতগুলি ধীরক্রিয় বিষদ্রব্য দিয়ে প্রমত্ত অথবা অবসন্ন করা, শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধিবিবেচনার জীবনকে কতকগুলি কৃত্রিম তন্দ্রা দিয়ে অভিভূত ও অপ্রকৃতিস্থ করা—এই হলো মাদকতা। আধুনিক সাইকো-অ্যানালিসিস বিজ্ঞানেও বলা হয়েছে যে, মাদক চর্চা হলো বস্তুতঃ একটি আত্মহত্যা-কম্প্লেক্স। নিজের ব্যক্তিত্বে বিকার সৃষ্টি, অপমৃত্যুর প্রতি মোহ। মাদক চর্চা আনন্দের চর্চা নয়। নিজ দেহে ও বহিঃপ্রকৃতিতে যে অপার আনন্দের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে, মাদকী তার অস্বভাবী কৃত্রিমতার জন্য সে আনন্দ উপভোগ ও আহরণ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মাদক চর্চা একটী অতি প্রাচীন ভ্রান্ত সংস্কার; এর উচ্ছেদ হ'লে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হবে।

খাদি, অর্থাৎ নিজ হাতে কাটা সুতায় প্রস্তুত বস্ত্রে নিজ দেহ শোভিত করার ব্রত। স্নান ও প্রসাধনের মত নিজ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ সৃষ্টিও বস্তুতঃ একটা ব্যক্তিগত শিল্পকলা। খাদির মধ্যে অর্থনীতিটুকুই একমাত্র বা প্রধান বিষয় নয়। প্রধান হলো এর অন্তর্নিহিত মানবিক নীতি, কর্মবৃত্তিকে সৃষ্টিশীল ক'রে রাখবার আর্ট। খাদিকে এডুকেশন বা শিক্ষাও বলা যায়, অর্থাৎ ব্যক্তির প্রতিভাকে গঠনকর্মে, সাধুশ্রমে, সৌন্দর্যবোধে, মাত্রাজ্ঞানে ও শুদ্ধতায় দীক্ষা দেবার অনুশীলন। গত মহাযুদ্ধে 'শক্-প্রাপ্ত' বৈমানিক যোদ্ধাদের চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে সুতাকাটা লেস-বোনা এবং এমব্রয়ডারি কাজ দেওয়া হতো। সুতাকাটার মত ঐ সাধারণ কারু-শ্রমের ভেতর দিয়েই শক্-প্রাপ্ত বৈমানিক রোগীরা ধীরে ধীরে তাদের মানসিক সুস্থতা ফিরে পেত। কাজ এবং বৃত্তি সম্বন্ধেই বর্তমানের ধারণা ভ্রান্ত হয়ে গেছে, এবং কাজের পদ্ধতির মধ্যেও যে একটা বিজ্ঞান আছে তাও অনেকে অনুভব করে না। খাদি হলো এই কাজের পদ্ধতিগত বিজ্ঞান। নিপুণতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, মাত্রাবোধ, আত্মনির্ভরতার অনুশীলন, এবং তারই সঙ্গে নিজের প্রতিভাকে সৃষ্টি-প্রবণ ক'রে তোলা, এই হলো খাদির শিক্ষা। প্রবৃত্তি নামক যে ইন্দ্রিয়জ আগ্রহ শরীর ও মনের ভেতর থেকে বাহিরে আত্মপ্রকাশ খোঁজে, তাকে যদি নির্বাধ ক'রে দেওয়া হয়, তবে সেটা পরপীড়ন অপহরণ আক্রমণ এবং আত্মসাৎ ইত্যাদি সমাজবিরোধী ক্রিয়ারূপে দেখা দিয়ে থাকে। খাদিকর্ম এই প্রবৃত্তিকে নীতিমণ্ডিত করে। এবং আত্মসাৎ করার চেষ্টাকে নয়, আত্মপ্রয়াসকেই জীবনচর্চার বুনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি চরকায় সুতা কাটে তবে তার ফলে সমাজমানসের যে উৎকর্ষ ঘটে সেটাই হলো চরকার শ্রেষ্ঠ উপহার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে সহযোগিতার প্রেরণা ও রুচি জাগিয়ে চরকা ব্যক্তিকে সমাজপ্রেমিক করে তোলে।

গ্রামশিল্প উন্নয়ন—বিকেন্দ্রীকৃত সম্পদসৃষ্টির নীতি হলো ঘরে ঘরে সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার নীতি। নিজের গ্রামের কুম্ভকারের রচিত মৃৎপাত্রে যে অন্ন পরিবেষণ করা হয়, সে অন্নের সঙ্গে সামাজিক চেতনার প্রসাদ থাকে। খাদি যেমন ব্যক্তির জীবনে আত্মনির্ভরতার শক্তি ও সৌন্দর্য দান করে, গ্রামশিল্পও তেমনি গ্রামের জীবনে আত্মনির্ভরতার শক্তি এবং সৌন্দর্য দান করে। শিল্প জিনিসটাই নিতান্ত প্রয়োজনের পণ্যরূপে উপভোগ করার বস্তু নয়। তার মধ্যে যে মানুষের হাতের স্পর্শ আছে তাও উপভোগ করার বিষয়। পল্লীর শিল্পীর শ্রমে যে পণ্য সৃষ্টি

হয়, তার মধ্যে এই মানবিক স্পর্শটুকু আর্থিক মূল্যের অতিরিক্ত আর একটি মূল্য স্থষ্টি করে, যা দেহের প্রয়োজন ছাড়িয়ে মনের প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে সামাজিকতাকে সম্পূর্ণতা দান করে।

গ্রামস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার চর্চা, এরও যে অর্থনৈতিক সার্থকতা আছে, তাতে সন্দেহ কি? হিসাব করে দেখা গেছে যে, মাত্র দূষিত জল পান করে ভারতের গ্রামবাসীরা যেসব অস্থখে ভোগে, তার জন্য বৎসরের অর্দ্ধেক সময় তারা কর্মে অক্ষম হয়ে থাকে। অর্থাৎ, শুধু শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও ব্যবহার সার্থক করতে পারলে গ্রামবাসীর শ্রমক্ষমতা ও শ্রমসময় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হতে পারে। এবং তার ফলে শস্য শিল্প পণ্য ইত্যাদি সম্পদও দ্বিগুণিত হতে পারে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র পানীয় জলের শুদ্ধতাই গ্রামের অর্থনীতির পক্ষে দ্বিগুণ লাভের ব্যাপার।

অর্থনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে, মানবিক নীতির দিক্‌টাই দেখা যাক্। গ্রাম ও গৃহাবাস যদি অপরিচ্ছন্ন হয়, তবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্যও বিচ্ছিন্ন হয়। নীল আকাশ, স্বচ্ছ স্থর্যালোক, স্থশ্যামল বন, তৃণাকীর্ণ প্রান্তর, পুষ্পকুঞ্জের সৌরভ, বাতাসের সঞ্চার, লতাগুল্মের বর্ণবৈচিত্র্য ও পাখীর কূজন —এই সব মিলিয়ে যে নৈসর্গিক সামঞ্জস্য রয়েছে, তার সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করেই গ্রাম, গৃহাবাস ও জনপদ রচিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জীবনে দৈহিক স্বাস্থ্যও হলো এই নিখিল প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে ছন্দ রেখে চলার অবলম্বন। তাই পরিচ্ছন্নতা হলো একটি মানবিক নীতি। ব্যক্তি, গ্রাম ও জনপদের জীবনচর্চায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারূপে পুরীষ-দুর্গন্ধ-আবর্জনা ও পঙ্কিলতা প্রতিদিন স্থষ্টি হয় সত্য, এবং এই আবর্জনাকে প্রতিদিন অপসারিত ও ধ্বংস করাই সভ্যতার একটি বৃহৎ সংস্কার। হিন্দুর নিত্যক্রিয়ায় স্নান শৌচ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিরাট বিধিবিধান আছে, তা বস্তুতঃ সভ্যতারই এক বিরাট বুনিয়াদ। পৃথিবীতে বর্তমানে যে সকল সমাজ আদিম অবস্থায় রয়েছে, দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বোধ ও সংস্কারের খুবই অভাব। ক্লেদ পুরীষ ও আবর্জনাকে দূরীভূত করার নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষা করেই অসভ্য মানুষ সভ্য হয়েছে। এবং বর্তমান সভ্যতারও ট্র্যাজেডি হলো এই যে, কোথাও অশিক্ষার প্রকোপে, এবং কোথাও বা সভ্যতার ঐ মৌলিক সংস্কারটি সম্বন্ধে সচেতন ধারণার অভাবে অনেক সভ্য সমাজ ও সভ্য ব্যক্তির জীবনেও আদিম মানুষের মত

অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে। এর ফলে শুদ্ধ নিসর্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধ এবং জলবাতাস ও বর্ণ সৌরভের সঙ্গে রুচিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা এই সুরুচিকে পুনরুদ্ধার করার অথবা প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি। গৃহাবাস সুন্দর না হলে ব্যক্তির মনে পারিবারিক প্রীতি ও মমতার বোধ দুর্বল বা বিকৃত হয়। গ্রাম সুন্দর না হলে গ্রামবাসীর মনে প্রকৃত দেশপ্রেম সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং, 'সাফাই' কাজের তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, এই কাজ বাহ্যতঃ ভাঙ্গির বা মেথরের কাজ হলেও বস্তুতঃ শিল্পীর কাজ।

বুনিয়াদী শিক্ষা, মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক গুণাবলীকে প্রকাশ ও আয়ত্ত করার শিক্ষা। কতগুলি সুনির্দিষ্ট সুনীতি মতবাদ বা সংস্কার দিয়ে ছাত্রের চিন্তাকে গড়ে তোলা নয়। ছাত্রের মনে যে সহজ গঠনধর্ম রয়েছে, তারই অনুশীলনের ভেতর দিয়ে গুণাবলীর বিকাশ। গুণাবলী বলতে বোঝায়—স্মরণ ক্ষমতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাবোধ, নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, অনপচয়, মিতাচার, দৃঢ়তা, আশাবাদ ইত্যাদি। কায়িক শ্রমের ভেতর দিয়ে মন ও বুদ্ধির চর্চা। কেতাব নয়, বহিঃপ্রকৃতি এবং শিল্পকার্যের ভেতর দিয়ে জ্ঞান লাভ। "জীবনের ভেতর দিয়ে জীবনের শিক্ষা"—বুনিয়াদী শিক্ষার এই হলো মূল নীতি।* ইনটেলেক্‌চুয়াল বা বুদ্ধিগত শ্রমকে কায়িক শ্রমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করার ফলে পৃথিবীতে অনেক ভ্রান্তি ঘটেছে। যাঁরা শুধু চিন্তা করেন বা লেখেন, তাঁরাই সমাজে 'ভদ্রলোক' রূপে একটি ভোগিশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে শ্রেণীবিরোধ নামে একটা অসামাজিক ব্যাপার প্রত্যেক জাতি ও সমাজে ঘটে চলেছে। কায়িক শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকলে, শ্রেণীকৌলীন্য নামে অহমিকার সৃষ্টি হতো কি না সন্দেহ। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এই দিক দিয়ে মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে মানবতাপ্রবণ করে গড়ে তুলবার আয়োজন।

জ্ঞানলাভের পদ্ধতি যেমন মাত্র টেক্সটবুকের উপর নির্ভর করে না, তেমনি 'শিক্ষা' নামক বিষয়টিও মাত্র লিপি বা অক্ষরের ওপর নির্ভর করে না। নিরক্ষর ব্যক্তিও শিক্ষিত হতে পারে। নীতিশিক্ষার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, কারণ লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটও নিরক্ষর চাষীর তুলনায় বেশী নীতিহীন হয়েছে, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, মতবাদ, সংস্কার, টেকনিক ইত্যাদি বিষয়েও নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা যায়, বিনা অক্ষর ও পুস্তকের

* "Education of life through life."

সাহায্যে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর বহু দেশে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যাই সমধিক। এই প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরসমাজ দেশের নাগরিকরূপেই রয়েছে, অথচ 'অশিক্ষিত' হওয়ায় তাদের প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। জাতির পক্ষে এটা বস্তুতঃ বিরাট প্রতিভার অপচয়। অথচ অল্পসময়ের মধ্যেই এই নিরক্ষর সমাজকে একটা পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এবং সেটা সম্ভব হলে জাতির সমষ্টিগত প্রতিভার রূপগুণ ও পরিমাণই বদলে যাবে, উন্নত হবে। দেশব্যাপী সামগ্রিক ও আবশ্যিক শিক্ষা বিস্তার করে সাধারণকে শিক্ষিত করা যায় সত্য। এই শিক্ষার ফলে দেশের আজকের সকল শিশু বিশ বছর পরে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এ'ও সত্য। কিন্তু এটা দীর্ঘকালসাপেক্ষ ব্যবস্থা। তা ছাড়া আর একটা সমস্যা আছে। শিশু ও কিশোরেরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, আর তার পিতামাতা অশিক্ষিত হয়ে রয়েছে, এই অবস্থা নবীনে-প্রবীণে বিরোধের ভাব প্রবল করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, অশিক্ষিত পিতামাতার রুচিতে চালিত পারিবারিক জীবন শিক্ষার্থী শিশুর জীবনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে না। তাই প্রৌঢ়শিক্ষার প্রয়োজন, অল্পসময়ের মধ্যে সমাজকে সুশিক্ষিত করার উপায়।

নারীসমাজের উন্নয়নও বর্তমানে সমগ্র বিশ্বসভ্যতারই একটি প্রয়োজন। নারী নিজেও তার অধিকার ও কর্তব্যের রূপ সম্বন্ধে সচেতন নয়। পুরুষ নারীকে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে খাটো করে রেখেছে। এটা সভ্যতারই একটা গলদ। পৃথিবীর মানবসমাজকে যদি পুরুষ ও নারী নামে দুই 'জাতি' রূপে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে নারীই অনুন্নত। নারীসমাজের প্রতিভা পৃথিবীতে আজও ব্যাপকভাবে সার্থকতা লাভের সুযোগ পায়নি। এমন কি, বর্তমানে যেসকল বৃত্তি সংস্কার রুচি ও কর্তব্যকে নারীসুলভ বলা হয়, তা'ও বস্তুতঃ পুরুষের বিচার অনুসারে পরিকল্পিত। নারীর দেহগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে নারীর কতকগুলি বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প দর্শন রাজনীতি ও সমাজনীতির সহস্র কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভা অনাহূত হয়ে থাকবে, এটা মানবিক সভ্যতারই অসম্পূর্ণতার লক্ষণ। তারপর, আরও দেখা যায়, অধিকাংশতঃ পুরুষদের প্রতিভার দ্বারাই সমাজ ও রুচি গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সমাজের মধ্যে 'পৌরুষ'ভাব প্রবলতর হয়ে আছে। 'প্রকৃতির' ভাব প্রবল নয়। অর্থাৎ নারীজাতির প্রতিভা সম্যক্‌ভাবে সুযোগ পেলে সমাজ ও সভ্যতার রূপ রুচি ও ভঙ্গীর মধ্যে

এমন অনেক সম্পদ ও মূল্য দেখা দিত, যা আজিকার দিনে নেই। রূপের যিনি পূর্ণ-সত্তা, পুরাণকার তাঁকে অর্দ্ধনারীশ্বর বলেই কল্পনা করেছেন। অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ নারী নিয়েই সম্মিলিত রূপে শিব পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। নারীজাতির মধ্যে দেহগত ভাবে, মানসিক প্রবৃত্তিরূপেই সৃষ্টি ও লালনের আগ্রহ নিহিত রয়েছে। এই আগ্রহ যদি সমাজগঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিণাম লাভের পথ পায়, তবে কোমলতা মৃদুতা ও লালনপালনের গঠনধর্মে সমাজের চেতনা ব্যাপক ভাবে অভিষেক লাভ করবে। তার ফলে, সমাজ ও সভ্যতারই রূপ বদলে যাবে।

বিভিন্ন ধর্মের মত বিভিন্ন ভাষাও পৃথিবীর মানুষকে নানা ভাবে ভাগ করে রেখেছে। এই ভাষাভেদও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের ভাব সৃষ্টি করে। অথচ ভাষা হলো, তা যে দেশেরই হোক্, একটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। দরবারী কানাড়া নামক সুরময় একটি রূপ, একটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, কোন মানুষ বা জাতির পক্ষে বিদ্বেষ বা ঘৃণার বিষয় হতে পারে না। ভাষাও তাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে ভাষা দিয়ে আপন-পর জাতি বিচারিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ভাষা সম্বন্ধে এই পুরাতন কুসংস্কারকেই বদলে দিতে চেয়েছেন। প্রতি জাতির মাতৃ-ভাষা তার জাতীয় সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। এবং সব মিলিয়ে এই বহুবিচিত্র ভাষাভাণ্ডার পৃথিবীরই সম্পদ। যেমন, সর্বদেশের ফুলই পৃথিবীর ফুল রূপে সর্বজাতির পক্ষে আদরণীয়, তার মধ্যে ঘৃণা করার বা ভেদ সৃষ্টি করার কিছু নেই। নিজ নিজ ভাষাকে ভালবেসে মহৎ কর, এই হলো গান্ধীজী প্রবর্তিত অন্যতম গঠনকর্ম।

ভারতবর্ষকে এক দেশ ও এক জাতির দেশরূপে কল্পনা করে গান্ধীজী একটি রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা গঠনেরও পরিকল্পনা করেছেন। বহু-ভাষা হলেই বহু-জাতি রূপে পৃথক্ হয়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ভাষার দ্বারা যেমন মানুষ সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করেছে, তেমনি সাংস্কৃতিক শক্তির দ্বারাই তার পক্ষে ভাষাসৃষ্টি করে নেওয়া সম্ভব। ভাষার ঐতিহাসিক কাজটিই বা কি? একটি উপত্যকায়, একটি দ্বীপে, একটি দেশের সকল মানুষকে সামাজিক ভাবে এক করে রাখার কাজ করেছে ভাষা। সুতরাং, একটি মহাদেশের মানুষকে সামাজিক ভাবে এক করে রাখার জন্য মহাদেশীয় ভাষা সৃষ্টি হতে পারবে না কেন? ভাষার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সার্থক করাই জ্ঞানী মানুষের স্বাভাবিক সাধনা। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার উদ্দেশ্যই তাই।

বহুভাষাসম্বলিত ভারতবর্ষের মানুষকে একটি ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার সূত্রে গ্রথিত করা যায়। দূর ভবিষ্যতের সভ্যতাকে আমরা কল্পনা করে নিয়ে বলতে পারি, এই একভাষা সৃষ্টির বৈপ্লবিক প্রেরণা একদিন সারা পৃথিবীকেই একসূত্রে সম্মিলিত করতে পারবে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা গঠনের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে গঠনকর্মের উদ্যোগ করে গেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, সে গঠনকর্মের নীতি ও বিজ্ঞান অনুসারে আগামীকালে 'পৃথিবীর রাষ্ট্রভাষা'ও সৃষ্টি হতে পারে। বহুভাষী পৃথিবীব বহুজাতির মানুষ একটি বিশ্বভাষার প্রয়োজনও অনুভব করবে, এবং তা একদিন সম্ভব করতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন বহুধর্মসমন্বিত পৃথিবীর মানুষকে 'অহিংসা' নামক একধর্মের সূত্রে সম্মিলিত করা, তেমনি বহুভাষাসমন্বিত পৃথিবীর মানুষকে একটি একভাষার সূত্রে সম্মিলিত করা, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত সরল গঠনকর্ম-পদ্ধতির মধ্যে এই বৃহত্তর তাৎপর্য রয়েছে।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত এই ভাষাগত গঠনকর্মের মধ্যে বিরোধের কোন স্থান নেই। স্বভাষা বা মাতৃভাষাকে দুর্বল করে জাতীয় ভাষার সমৃদ্ধি, অথবা জাতীয ভাষাকে দুর্বল করে কোন আন্তর্জাতিক ভাষার সমৃদ্ধি—এধরণের কোন প্রক্রিয়া এর মধ্যে নেই। ববং, গান্ধীজী বলেছেন যে ভারতবাসীর শিক্ষায় ইংরাজী ভাষাব আধিপত্য অনেক অনর্থ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ভারতীয়ের পক্ষে ইংবাজীর খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে জাতীয ভাষারই প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ভাষাকে এসে জাতীয় স্থান দখল করতে দেওয়া চলে না। তেমনি জাতীয় ভাষাও মাতৃভাষাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না।*

আর্থিক সমতা, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজের এই এক লক্ষ্য, কারণ সর্বদেশের সমাজেই সম্পদ উপভোগের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য ঘুচিয়ে দেবার পন্থা হিসাবে অনেক বৈপ্লবিক থিওরীও শোনা যায, কম্যুনিজম সোস্যালিজম ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বৈপ্লবিক থিওরীর মধ্যে একটা মৌলিক ভ্রান্তি আছে। বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে আর্থিক সমতা সৃষ্টির পন্থা

* গান্ধীজীর পূর্বে বাঙালী মনস্বিবৃন্দই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা তথা জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার কথা বলে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"হিন্দীভাষার সাহায্যে ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাঁহারা ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।" ভূদেব, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও বাঙালী সুধী হিন্দীভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণের কথা বলেছেন।

হিসাবে এই সকল তথাকথিত বৈপ্লবিক অর্থনীতিতে যে নির্দেশ আছে, সেটা বস্তুতঃ হিংসামূলক। বিত্তবানকে বিত্তভ্রষ্ট করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে নিছক আঘাতবাদের কোন স্থান নেই, এবং সমাধানের বিষয়টিকে একপক্ষের দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন না।* ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে আর্থিক সমতা স্থষ্টির দায়িত্ব দুই পক্ষেরই। ধনিক তার লোভ লাভ ও সঞ্চয়ের দাবী স্বেচ্ছায় বর্জন করে বিত্তগত উচ্চতা থেকে 'নেমে' আসবে, এবং শ্রমিক তার কর্তব্য পালন করে তার মর্যাদাকে বিত্তহীনতার স্তর থেকে উচ্চতর বিত্তে নিজেকে 'টেনে' তুলবে। গান্ধীজীর এই গঠনমূলক বিপ্লব একপক্ষগত কর্তব্য নয়, উভয় পক্ষের কর্তব্য। জোর করে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইতিহাসে সফল হয়েছে দেখা যায় না। ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত এবং পরিণাম থেকেই বোঝা যায়, একরকম জোর করে ধনসাম্য স্থষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সোভিয়েট রুষিয়ার তথাকথিত ধনসাম্য প্রকৃত ধনসাম্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেখানে পুরাতন পুঁজিবাদী ধনিকের বদলে নূতন এক ম্যানেজারিয়াল ধনিক সমাজ স্থষ্টি হয়েছে বলে শোনা যায়। উপার্জনের বৈষম্যও সেখানে বিদ্যমান। সম্পদ স্থষ্টির ক্ষেত্রে ক্যাপিট্যাল এবং শ্রম, উভয়ই দুটি শক্তি। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি চলতে পারে না। এবং এই দুই শক্তির সহযোগিতা সম্ভব। গান্ধীজী ধনিকবাদ বা ক্যাপিটালিজমের অবসান চান, কিন্তু ক্যাপিটালের অবসান চান না। যদি ক্যাপিটালকে সম্পদ বলা হয়, তবে শ্রমশক্তিও অনুরূপ সম্পদ। শুধু অর্থই ক্যাপিটাল নয়, টেকনিক্যাল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদিও মানুষের ক্যাপিটাল। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁর ক্যাপিট্যাল, সাঙ্গীতিকের স্বরজ্ঞান ও কণ্ঠস্বর

---

* কিন্তু বিত্তবানকে কোন অবস্থাতেই বিত্তাধিকারচ্যুত করা চলবে না, এ নীতি গান্ধীজী সমর্থন করেন না। ব্যক্তি যে-সম্পত্তি সঙ্গতভাবে অর্জন করেনি ('not legitimately acquired'), সে-সম্পত্তির অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বিচ্যুত করা হবে। সঙ্গতভাবে অর্জিত হলেও ব্যক্তির সম্পত্তিকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে ('for the best interest of the nation') রাষ্ট্র তথা প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিজের অধিকারে নিয়ে নিতে পারবেন, নেওয়া উচিত। দিল্লীতে প্লেগ দেখা দিলে দিল্লীর বড়লোকদের বড় বড় সখের অট্টালিকাগুলিকে গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই অধিকার করে নিতে পারবেন, প্লেগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য। এক্ষেত্রে অট্টালিকার মালিকের ক্ষতিপূরণ করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও সখের সম্পদ কেড়ে নিলে 'ক্ষতি' করা হয় না। গান্ধী বলেন—"they will be dispossessed, and they will be dispossessed, I may tell you, without any compensation."

[দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর বক্তৃতা]

তাঁর ক্যাপিটাল, কবির অনুভূতি ও শিল্পীর কল্পনাও তাঁদের নিজ নিজ ক্যাপিটাল। এই ক্যাপিটাল মাত্র অপরকে শোষণের কাজে নিযুক্ত হবে, এমন কি কথা আছে? ক্যাপিটালের অপপ্রয়োগেই অপরকে শোষণ করা হয়, সুপ্রয়োগে নয়। সুতরাং ক্যাপিটালকে ধ্বংস করে নয়, ক্যাপিটালকে নীতিসঙ্গত পন্থায় প্রয়োগ করে সমাজকল্যাণ সৃষ্টি করার পন্থাই গান্ধীজীর মতে গ্রহণীয়। তিনি বিশেষভাবে ভোগসাম্যের কথা বলেছেন। দুই একটি প্রাসাদ, তার পাশে কয়েক হাজার বস্তি—এরূপ অসাম্য তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। যাঁর হাতে ক্যাপিটাল থাকবে, তাঁকে উচ্চশ্রেণীর ভোগী হতেই হবে, এটা অসঙ্গত। সম্পদের অধিকারী যিনি হবেন, তিনি মাত্র 'অছি' বা ট্রাষ্টিরূপে সেই অধিকার রাখবেন। স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে পৃথিবীতে নানা প্রথার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানের ক্যাপিটালিস্ট সমাজ এক ধরণের স্বত্ব উপভোগ করেন। গান্ধীজী স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে এই সব পুরাতন ধারণা এবং প্রথারই পরিবর্তন করতে চান। তাঁর মতানুসারে, সম্পদের ওপর স্বত্বাধিকার ব্যক্তিগত ভোগের অধিকাররূপে নয়, 'অছির অধিকার' (trust ownership) হিসাবেই রাখতে হবে। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকন্যাদের ট্রাষ্টি বা অছি, সমাজের সম্পদবানেরাও তেমনি সম্পদের অছি হবেন। সম্পদ রক্ষা এবং পরিচালনার জন্য তিনি, তাঁর জন্যে সম্পদ নয়।

সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য করবাবহৈ—উপনিষদে কথিত সমাজ বিজ্ঞানের এই 'সহতা'র নীতি (Co-operation), সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী—এই 'সমতা'র নীতি, সব মিলিয়ে যে আদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে তার চেয়ে বড় সাম্যবাদ তো আর কিছু নেই। আর্থিক সমতা বলতে অর্থের সৃষ্টিতে অধিকারের সমতা বোঝায় না, অর্থের উপভোগেরই সমতা বোঝায়। সমাজকে সম্পদ ও সেবাদানের শক্তিতে ও অধিকারে সকলকে সমান করা যথার্থ সাম্য হতে পারে না। সকলকে সমান যোগ্য করে গড়ে তোলা যায় না এবং মানুষে মানুষে প্রতিভা ও যোগ্যতার কমবেশী তারতম্য হলেও পৃথিবীর তাতে কোন ক্ষতি হয় না। সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ—দুই হাত আকারে সমান হলেও দুই হাতের কর্মপটুতা সমান নয়। এ 'অসাম্য' মানবজীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। সম্পদ ভোগের অধিকারে উচ্চ-নীচ প্রভেদ সৃষ্টি করে রাখাই হলো আসল ভুল। এ প্রভেদ অপনোদন করাই হলো আর্থিক সমতা।

কৃষক ও শ্রমিক সমাজের শ্রেণীগত কতগুলি বিশেষ সমস্যা আছে, এবং তার

সমাধানের জন্য তাদের সংগঠন প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী এক্ষেত্রে সংগঠনে ও আন্দোলনে যে নীতিকে সবচেয়ে বড় করে ধরেছেন, সেটা হলো অহিংসার নীতি। শস্য ও শিল্পের উৎপাদনে সবচেয়ে বড় অংশ কৃষক ও শ্রমিক সমাজই গ্রহণ করেছে, এবং সেজন্য তাঁদের জীবিকাগত কতগুলি স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন আছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের কয়েকটি মতবাদে কৃষক ও শ্রমিককে শুধু 'শ্রেণী'রূপেই বিচার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা যেন সমগ্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের স্বার্থ স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে, সমাজের স্বার্থ এবং কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণীগত স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত, অবিচ্ছেদ্য। বৃহত্তর সমাজের বা সকলের যেটা কল্যাণ, সেটা কৃষক-শ্রমিকেরও কল্যাণ। সেই জন্যই শ্রেণী-সংঘর্ষের পন্থায় নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সহযোগিতাই হলো সর্বকল্যাণ সৃষ্টির পথ। আত্মোন্নতির জন্য জমিদার বা পুঁজিবাদী মালিক ইত্যাদি শোষককে আঘাত করতে গিয়ে কৃষক-শ্রমিক এমন পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, যেটা সমাজের পক্ষেই সম্পদহানির ব্যবস্থা হবে। সমাজকে আঘাত করে নয়, এমন কি জমিদার বা পুঁজিবাদী নামক ব্যক্তিদেরও আঘাত করে নয়, জমিদারী প্রথা ও পুঁজিবাদ প্রথার বিরুদ্ধেই আঘাত দিতে হবে। বর্তমানে নানা দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন যে পন্থায় ও যে দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত, তার মধ্যে এই একটা গলদ আছে। মালিকের বিরুদ্ধে লড়বার সময় সমাজের সম্পদকে ক্ষুন্ন করার চাপ না দিয়ে ট্রেড-ইউনিয়নবাদী শ্রমিক আত্মোন্নতির আর কোন পন্থা ভাবতে শেখেনি। গান্ধীজী তাঁর কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনে যে অহিংস পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন, তার চেয়ে নীতিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত পন্থা আর কিছু হতে পারে না। দ্বন্দ্ববাদ ও সংঘর্ষবাদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্ররোচনা আছে, ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু বাস্তবোচিত সত্যতা নেই। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় গঠিত আমেদাবাদের শ্রমিক ইউনিয়ন বস্তুতঃ এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তর ইউনিয়ন। বিগত ত্রিশ বছরের ইতিহাসে ও অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র আমেদাবাদের শ্রমিকেরাই নিজেদের অধিকার সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। শুধু শ্রেণী-স্বার্থ-সচেতন হয়ে নয়, মূলতঃ সমাজ-স্বার্থ-সচেতন হয়ে কৃষক ও মজুরকে তার আত্মোন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু গান্ধীকথিত গঠন কর্মপদ্ধতির মধ্যে 'কৃষকের উন্নতি' নামে যে অনুষ্ঠানের বিষয় বলা হয়েছে, সে অনুষ্ঠান শুধু কৃষকের শ্রেণীগত আত্মসংগঠনের

উদ্যোগ নয়। অ-কৃষকের দ্বারা কৃষকের সেবা ও উন্নয়নের কাজ। কৃষকের শ্রেণীগত স্বার্থ যে শ্রেণীর স্বার্থের প্রকোপে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, সেই শ্রেণীর মানুষেরই ওপর এই ব্রতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তুমি 'স্বেচ্ছায়' তোমার স্বার্থবাদ বর্জন করে কৃষককে উন্নত কর। অ-কৃষকের স্বার্থ ও কৃষকের স্বার্থ সেই 'সহতা' ও 'সমতা' নীতির সূত্রে সামঞ্জস্য লাভ করুক্। গান্ধীজীর সাম্যবাদে জোর করে বিত্তাধিকারচ্যুত (expropriation) করার চেয়ে বিত্তবানের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় (voluntary) স্বার্থবাদ ও বিত্তাধিকার বর্জন করার পন্থাই যথার্থ স্থায়িফলপ্রদ পন্থা বলে বিবেচিত হয়েছে।

আদিবাসীর সেবা—গঠনকর্মবিধির অন্যতম বিধিরূপে গান্ধীজী উল্লেখ করেছেন। ভারতে আদিবাসী নামে আড়াই কোটি কালি-প্রজা আছে, যারা 'অনার্য', যাদের গায়ের রং কালো, যারা অরণ্যে বাস করে। যুগ যুগ ধরে এই আদিবাসি-সমাজ সভ্যসমাজের কাছে ঘৃণিত হয়ে এসেছে। এই ঘৃণাকে বলা যায় জাতিগত (Race) বিদ্বেষ। শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে নিগ্রোসমাজ যে ঘৃণাপূর্ণ আচরণ লাভ করে, তা'ও জাতিগত বিদ্বেষ নামে এক কুসংস্কারের ব্যাপার। এ কুসংস্কার বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বন্যজীবের ওপর যে ধরণের একটা হিংসার ভাব মানুষ পোষণ করে, 'বন্য অনার্য্য আদিম ও অসভ্য' সমাজের প্রতিও কতকটা সেই ভাবই সভ্যেরা পোষণ করেন। য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকাতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকায় বস্তুতঃ আদিম সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে একপ্রকার শিকার করেই উচ্ছেদ করেছে। এই বিদ্বেষের আর এক প্রকাশ বর্ণবিদ্বেষ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'আদিবাসি-সেবা'র বিধান বস্তুতঃ এই পৃথিবীব্যাপী বর্ণবিদ্বেষ দূরীভূত করার বিধান। এর আর একটা তাৎপর্য আছে। বর্তমানে পৃথিবীর সভ্যতার ক্ষেত্রেই দুটি সমাজ যোগ্যতায় পরস্পর থেকে পৃথক্ হয়ে রয়েছে—সভ্য সমাজ ও অসভ্য সমাজ। বর্তমান পৃথিবীতে কয়েক কোটি অ-সভ্যের অস্তিত্ব এই সত্যই প্রমাণিত করে যে, কয়েক কোটি মানবজীবন পতিত হয়ে রয়েছে যাকে আবাদ করলে সোনা ফলতে পারতো। আদিবাসি-সেবার মূল তাৎপর্য হলো, আদিম ও আধুনিকের এই সভ্যতাগত বৈষম্যের অবসান।

কুষ্ঠরোগীর সেবা—এই বিধান মনুষ্যসমাজেরই একটি অতি হীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে সুস্থ করে

তুলতে পারে না, অপরের সেবা ও সাহায্যের প্রয়োজন। রোগী মানুষকে সুস্থ মানুষ সেবা করে, তবেই সমাজ সুস্থ হয়। সভ্যতার এই হলো নিয়ম। রোগীকে ঘৃণা করে নয়, রোগীকে করুণা করে এবং সেবা ও সাহায্য দিয়েই সমাজ-স্বাস্থ্য এবং সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে। সভ্যতার এই নিয়ম জানা থাকা সত্ত্বেও আজও দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আদিমকালেব কুসংস্কার অনুযায়ী রোগীকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করে থাকে। যক্ষ্মা ক্যানসার বসন্ত কলেরা ইত্যাদি রোগী সম্বন্ধে সুস্থ মানুষের মনে এই ভয় দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী ভয়। শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও। ভারতবর্ষেও প্রাচীন কালে কোন কোন রাজ্যে কুষ্ঠরোগীকে রাজার নির্দেশে পুড়িয়ে মেরে ফেলার নিয়ম ছিল। এই হৃদয়হীনতা বর্তমানের সভ্য মানুষের মনেও নানাভাবে কমবেশী রয়ে গেছে। অথচ রোগীর সম্পর্কে সহৃদয় সেবকের মনোভাবই সভ্য সংস্কারের একটি অপরিহার্য নীতি। মহাত্মা গান্ধী তাই কুষ্ঠরোগীর সেবাকে গঠনকর্মবিধির অন্যতম বিধিরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এই গঠনকর্মকে বলতে পারা যায়, মনকে সব চেয়ে বড় বৈপ্লবিক সেবাধর্মে দীক্ষিত করার কাজ। পৃথিবী থেকে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ হ্রাস করা অথবা দূরীভূত করা, এটাই এই গঠনকর্মের প্রধান লক্ষ্য নয়। রোগীকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে ভয় ও ঘৃণা করার অমানুষী কুসংস্কারকে জয় করাই এই গঠনকর্মসাধনার প্রধান লক্ষ্য এবং প্রধান লাভ।

ছাত্রসমাজের কর্তব্য সম্বন্ধেও গান্ধীজী গঠনকর্মবিধি নির্দিষ্ট করেছেন। ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজেব দিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী কর্তব্যের তালিকাটি উপস্থিত করেছেন। ভারতীয় ছাত্রেরা যে সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তার সমাধানের জন্য ছাত্রদের যে পালনীয় কর্তব্য আছে, মহাত্মা গান্ধী তারই উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সেবামূলক কতগুলি কাজের উল্লেখ করেছেন। মোটের ওপর ছাত্রের পালনীয় গঠনকর্মবিধির বিবিধ বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সূত্রটি পাওয়া যায়, সেটি হলো ছাত্রের আত্মশিক্ষা। যে কোন দেশেই হউক, শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের কাছ থেকেই ছাত্র তার জীবনের প্রাপ্তব্য সব শিক্ষা লাভ করতে পারে না। বিদ্যায়তনে প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থাকবেই। সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে ছাত্রের নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত শিক্ষার দ্বারা। তা ছাড়া, শিক্ষা নামক বিষয়টিরও একটি আত্মনির্ভর রূপ গান্ধীজী কল্পনা করেছেন। একলব্য কোন গুরুর সাহায্য ছাড়াই

নিজেকে সুদক্ষ ধানুকীরূপে শিক্ষিত করে তুলেছিল। বিনা শিক্ষকে শিক্ষালাভের এইরূপ পন্থা আছে, একক তপস্যার মত। অধ্যয়ন ছাত্রদের তপস্যা। মহাত্মা গান্ধী ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধেও এক বৈপ্লবিক নীতি ঘোষণা করেছেন। শুধু অধ্যয়ন নয়, সেবামূলক কর্মের তপস্যা—এই হলো ছাত্রের আত্মশিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার পন্থা। বিদ্যায়তনে যে শিক্ষার অভাব আছে, ছাত্রকে সেই শিক্ষা নিজেব চেষ্টায় অর্জন করতে হবে।

আঠার দফা গঠনকর্মবিধিব যে তাৎপর্যের পরিচয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হলো, তা থেকে সহজেই অনুভূত হবে, মহাত্মা গান্ধী সমাজ ও সভ্যতাকে বিপ্লবের কোন্ মন্ত্র দিয়ে গেছেন। এই বিপ্লবের রূপ শান্ত উৎসবের মত, শিল্পীর ছন্দোবদ্ধ কর্ম সাধনার মত। যে ভিত্তির ওপর কল্যাণের রূপ স্থায়ী হয়, তারই প্রতিষ্ঠা। এবং যে ভিত্তিব ওপর অকল্যাণ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তারই অপসারণ। অল্পদিনের মধ্যেই মৌলিক পরিবর্তন, এর নামই বিপ্লব। এ বিপ্লব শুধু আঘাত ও সংঘর্ষমূলক পন্থায় সিদ্ধ হবে, পাশ্চাত্ত্যেব ধারণার সীমা এই পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধী বৈপ্লবিক পন্থারই একটি নূতন রূপ আবিষ্কার করেছেন—গঠনমূলক বিপ্লব। এ বিপ্লবে যে পরিবর্তন আসে সেটা ক্ষণিক আড়ম্বর নয়, সেটা চিরস্থায়ী। পাশ্চাত্ত্যের প্রতিভায় ও চিন্তায় বিপ্লববাদের এই রূপ আবিষ্কৃত হতে পারেনি। অহিংসাকে যিনি ঐতিহাসিক শক্তিরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেই মহাত্মার দ্বারাই এই অভিনব অথচ অত্যন্ত বাস্তব 'পরিবর্তনের বিজ্ঞান' আবিষ্কৃত হয়েছে।

গঠনকর্মবিধি কি শুধু গঠনকর্মী নামে আখ্যাত একটা কর্মিসমাজেরই পালনীয় ব্রত? তা নয়। প্রতি মানুষের অন্তরেই এক গঠনকর্মী শিল্পী ও সেবকের সত্তা রয়েছে। তাকে জাগ্রত করাই গঠনকর্মীর কাজ। এই কাজ শুধু ভারতীয়ের পক্ষে 'পূর্ণস্বরাজ' অর্জনের পথ নয়, দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ।

ঈশ্বরনির্ভর জীবনের রূপ

ঈশ্বরই একমাত্র 'পূর্ণ'। মানুষ অপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করে, এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণতাই হলো যথার্থ জীবন।

ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সহজসাধ্য কাজ নয়। ঈশ্বরের ওপর সত্যি-কারের পূর্ণবিশ্বাসী ক'জনই বা দেখা যায়? এবং ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে জীবন-যাপনের চেষ্টা করছেন এমন মানুষ এক একটা যুগের মধ্যে অথবা বহু শতাব্দীর মধ্যে এক-আধজন দেখা যায়। তাঁরাই মহামানব, এবং গান্ধীজীও তাঁদের মধ্যে একজন। ঈশ্বরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রতি মুহূর্ত চেষ্টা করছেন, এমন ব্যক্তির জীবনকেই আমরা পূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন বলতে পারি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনকাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, পরে প্রমাণ পেয়েছিলেন যে ঈশ্বর আছেন। তার্কিকের মন নিয়ে, সংশয়ীর যুক্তি নিয়ে, এবং অবিশ্বাসীর কঠোর সতর্কতা নিয়ে তাঁরা তাঁদের চিন্তার গভীরে সন্ধান আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাসলাভ করেন। গান্ধীজী তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস এরকম কোন সংশয়ী সন্ধানীর প্রাপ্তির মত লাভ করেননি। তাঁর সন্ধানের আরম্ভেই ঈশ্বরবিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন, এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই তিনি সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন এবং দীর্ঘ জীবনের শত শত ঘটনায় ও পরীক্ষায় তিনি উত্তরোত্তর এই প্রমাণই বেশী করে পেতে থাকেন যে ঈশ্বর আছেন।

তবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসই ঈশ্বরবিশ্বাস নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করাই হলো ঈশ্বরবিশ্বাস, এবং একেই বলা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। গান্ধীজীর এই চেষ্টার ইতিহাসই হলো তাঁর জীবনের আসল ইতিহাস ও পরিচয়। গান্ধী-জীবনের সমগ্র রূপ প্রকাশ ও পরিণতির মূলে যে শক্তি কাজ করেছে, সে শক্তি হলো গান্ধীজীর ঈশ্বরবিশ্বাস। গান্ধীজীর কথিত জীবন-তত্ত্বের সকল কথার প্রধান কথা হলো ঈশ্বরবিশ্বাস।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গান্ধীজী অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু সেসব কথা এমন কোন নতুন কথা নয় যা তাঁর আগে পৃথিবীর সাধু সাধক ও জ্ঞানীরা বলেননি। পৃথিবীর অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধকের জীবনকাহিনী অনেকেরই কাছে বিদিত আছে। তাঁরা কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, অর্থাৎ কিভাবে জীবনকে ঈশ্বরমুখী করেছিলেন, তার পরিচয় অনেকেরই জানা আছে। গান্ধীজীও কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করেছেন, সেইটি হলো আসল জ্ঞাতব্য বিষয়। গান্ধীজীর এই চেষ্টার মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্যে তাঁকে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্বাসী সাধকের তুলনায় স্বতন্ত্র না হোক বিশিষ্ট বলে তো মনে হবেই। যুগে যুগে লোকগুরু মহাপুরুষেরা লোকসাধারণ্যে বিশ্বাসময় জীবনের এক একটি আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই সব লোকগুরুদের সমসাময়িক মানুষ, অথবা সেই শতাব্দীর মানুষ, কিংবা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মানুষ সেই বিশ্বাসময় জীবনের আদর্শকে বুঝেছে, এবং অনুসরণেরও চেষ্টা করেছে। কিন্তু কালের নিয়মেই, কয়েক শতাব্দীর পরের মানুষের কাছে এক যুগ বা দুই যুগ পূর্বের লোকগুরুর প্রবর্তিত অথবা প্রচারিত বিশ্বাসসাধনতত্ত্ব দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও যেন নিছক একটি ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সেই বিশ্বাসসাধনতত্ত্বকে মাত্র একটা রীতিগত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের মতই মানুষ পালন করেছে। এর ফলে হয়েছে মানুষের আত্মিক শক্তির অবনমন। তার পরেই আবার এমন লোকগুরু এসেছেন যাঁর জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের এক নতুন রূপ প্রকাশ লাভ করেছে। সেই যুগ বা পরবর্তী নিকটযুগের মানুষ তাঁকে সহজে বুঝতে পেরেছে এবং মানুষের আত্মিক শক্তিও আত্মপ্রকাশের একটা আদর্শ লাভ করেছে। ইনিও পরবর্তী যুগে আবার কিছুটা দুর্বোধ্য হয়েছেন। যেন যুগোচিত প্রয়োজনে, এক একটা যুগের মানুষের বুদ্ধি রুচি ও চিন্তার বিশেষ গঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঈশ্বরবিশ্বাসেরই এক একটা নতুন রূপ এক একজন লোকগুরু সাধকের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সকল যুগের সাধক ও লোকগুরুর বিশ্বাসবাদের মূলে একটি সত্য রয়েছে—সে সত্য হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর তো আর যুগে যুগে বদলে যাচ্ছেন না। বদলে যাচ্ছে জাগতিক মানুষ। জগৎ পরিবর্তনশীল, মানুষের জ্ঞান রুচি প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত জ্ঞান রুচি বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা মানুষ করেছে, সেই চেষ্টার পদ্ধতিটা ঠিক কয়েক যুগ আগের পদ্ধতির মত হতে পারে না। ঈশ্বর সেই এক, এবং সম্পর্কটাও এক,

যুগে যুগে একই। এর মধ্যে নতুনত্ব হয় না। নতুনত্ব শুধু সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে।*

গান্ধীজী বিংশ শতাব্দীর মানুষ। বিংশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তা রুচি ও প্রবৃত্তির ওপর যুগের সকল বৈষয়িক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের নূতনত্ব নূতন প্রভাব বিস্তার করেছে। যে সংশয় বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনে দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সংশয় বিগত শতাব্দীর বা অতীতের কোন শতাব্দীর মানুষের মনে ছিল না। সংশয় ছিল, কিন্তু সে সংশয়ও ছিল অন্য রকমের। বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনের প্রকৃতিও পূর্ব শতাব্দীর মানুষের তুলনায় কিছুটা ভিন্নতর। নূতন যুগের এই নূতনতর মন কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে তা দেখিয়ে দেবার জন্য নতুন একটি ঈশ্বরবিশ্বাসী জীবনের আদর্শ আবির্ভূত হবার প্রয়োজন ছিল। গান্ধীজীর আবির্ভাবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক নূতন রূপ প্রকটিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দী এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী আরও দুই-এক শতাব্দীর মানুষের পক্ষে যে উপায়ে ঈশ্বরবিশ্বাসী হবার প্রয়োজন আছে, সেই উপায় প্রদর্শিত হয়েছে লোকগুরু গান্ধীর জীবনে। গীতায় কৃষ্ণ-ভগবান বলেছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। নিছক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়েই পৃথিবীর মানুষজাতির ইতিহাসে এ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় যে, যুগে যুগে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভ্যুদয় ঘটে আসছে। ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে এ পৃথিবীর কোন কোন অংশের মানুষ কোন কোন কালে জীবনের নৈতিক উৎকর্ষ ও শক্তি হারিয়ে অবনত হয়েছে। এ রকম ধর্মস্য গ্লানি ইতিহাসে বারবার হয়েছে, কিন্তু এই গ্লানিই মানুষের চরম পরিণাম হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন করে এবং নতুন রূপে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভ্যুদয়ে যুগের গ্লানি কেটে গেছে। মানুষ-জাতির জীবনে বস্তুতঃ একটা ঐতিহাসিক নিয়মের মতই পতন-অভ্যুদয়ের এই

* "ইতিহাসের দু'হাজার বছর আগের মানুষ যে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরতত্ত্বকে) বুঝেছিল, সেই ঈশ্বরের উপরেই পৃথিবী যদি চিরকাল নির্ভর ক'রে থাকে, তবে সেটা পৃথিবীর পক্ষে সুখের বিষয় হবে না। 'ঐতিহাসিক' ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রচার করবে না। যে ঈশ্বর আজ আপনার জীবনের ভেতর দিয়ে যে রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, সেই ঈশ্বরকেই বুঝুন এবং অপরকে বোঝান।

"যজ্ঞ কথাটার অর্থ হলো পূজা—তার অর্থ ত্যাগ। যজ্ঞকর্ম আত্মস্বার্থবাদ বর্জন ক'রে পরসেবার কাজ। এই অর্থে যুগবিশেষে যজ্ঞও বিশেষ হয়ে থাকে। সকল যুগের যজ্ঞ একই হতে পারে না। ধর্মের মূলনীতি এক জিনিষ, এবং ধর্মাচরণ আর এক জিনিষ। স্থান ও কালের পরিবর্তনে ধর্মের মূলনীতির পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ধর্মাচরণ স্থান ও কালের পরিবর্তন অনুসারে পরিবর্তিত হয়।"

—গান্ধী

পালা চলে আসছে। এই পতন ও অভ্যুদয় নিশ্চয় সমান মাপের নয়। সমান মাপের হলে মানুষের ইতিহাস একই জায়গায় থম্‌কে থাকতো এবং সেই লক্ষ বৎসর পূর্বের বন্য-পশুপ্রায় আদিম মানবকেই এক একটা পতনযুগের পর সংসারে পুনরাবির্ভূত হতে দেখতাম। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, পতনের মাপটাই ছোট এবং অভ্যুদয়ের মাপ ও মাত্রা তার চেয়ে বড়। মানবজাতি বার বার পতিত হয়েও বার বার উঠে দাঁড়িয়েছে, একটি চিরন্তন আশ্রয়কে আবার আঁকড়িয়ে ধরেছে। সে আশ্রয় হলো ঈশ্বরবিশ্বাস। ভারতে গান্ধী এ যুগের মানুষের সম্মুখে নতুন করে উঠবার এবং ধরে দাঁড়াবার সেই সুচিরনির্ভর আশ্রয়টির সন্ধান নতুন করে দিয়ে গেছেন।

গান্ধীজীর জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তাঁর সমস্ত চেষ্টাই হলো মানুষের জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী করার চেষ্টা। তিনি পৃথিবীতে যে মানবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছেন সেটা হলো ঈশ্বরসঙ্গত রাজ্য —রামরাজ্য, কিংডম অব গড।

ঈশ্বর বলতে তিনি বুঝেছেন 'সত্য'কে। ঈশ্বরই সত্য, এই চিন্তার সূত্র ধরে তিনি ক্রমে উপলব্ধি করলেন যে—সত্যই ঈশ্বর। 'ঈশ্বরই সত্য' (God is Truth) এই উপলব্ধি থেকে তিনি পৌছলেন আর এক উপলব্ধিতে—সত্যই ঈশ্বর (Truth is God)। তিনি বলেছেন, এই দুই উক্তির মধ্যে 'সূক্ষ্ম পার্থক্য' (fine distinction) আছে। সূক্ষ্ম পার্থক্য, কিন্তু প্রথম উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় উপলব্ধিতে পৌছতে তাঁর দীর্ঘ 'পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে একটানা অবিরাম সত্যের সন্ধান' করতে হয়েছিল।

সত্যই ঈশ্বর, এই উপলব্ধির পর তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছে, এই 'সত্য'কে তথা 'ঈশ্বর'কে লাভ করবার উপায় কি। এই চিন্তা ও এই প্রশ্নের সূত্রেই তিনি জীবন-দর্শনের মূল সূত্রটিকে আবিষ্কার করেছেন। ঈশ্বরলাভের উপায় হলো প্রেম (Love), অর্থাৎ অহিংসা (Non-violence)। লক্ষ্য এবং লক্ষ্য লাভের উপায়, এই দুই দু'য়ের মধ্যে তাৎপর্যগত ব্যবধান নেই বলেই গান্ধীজী মনে করেন। তাঁর মতে ঈশ্বরলাভের পন্থাতে থাকাই তো ঈশ্বরলাভ। সুতরাং প্রেমই হলো ঈশ্বর (God is Love)।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার একমাত্র পন্থা হলো ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অর্থ, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বরের

ইচ্ছা অনুসারেই জগৎ চলেছে, সব ঘটনার প্রভু তিনি—সুতরাং তাঁর ইচ্ছাতেই নিজেকে ছেড়ে দিলে, ঐশ্বরিক ইচ্ছারই একটি অংশে নিজেকে পরিণত করা হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমার এই হৃদয়কে তোমার দেবালয়ের প্রদীপ করে নাও। মীরাবাঈ প্রার্থনা করেছেন, আমাকে তোমার মন্দিরের দীপালি হয়ে থাকতে দাও। এইভাবে, নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি অংশে পরিণত করাই ঈশ্বরের কাছে-থাকা। 'অনন্তের' সঙ্গে যোগ স্থাপনের এই রীতি। বিশ্বসৃষ্টির ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত 'অসীম আনন্দে'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, মানুষী জীবনের পরম পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে পদ্ধতি গান্ধীজী তাঁর জীবনে অনুসরণ করেছেন, তারই মূলসূত্রগুলি তাঁর উক্তি থেকে উদ্ধৃত করা যাক্।

(ক) যিনি প্রচুর পরিমাণে অহংকারবর্জিত বিনয়ভাবে (humility) লাভ করেননি তাঁর পক্ষে 'সত্যে'র সাক্ষাৎ সম্ভবপর নয়। যদি সত্যের মহাসাগরের বক্ষে সাঁতার দিতে চাও তবে নিজেকে একেবারে 'শূন্য' (zero) ক'রে ফেল।

(খ) একটি তৃণও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না, একথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি।

(গ) ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বিধান, এ দুইটি ভিন্ন বিষয় নয়। স্বয়ং ঈশ্বরই হলেন তাঁর বিধান।*

(ঘ) ঈশ্বর আমাদের নিকট হতে দূরবর্তী কোন শক্তি নয়। তিনি অদৃশ্য এক পরম শক্তি, আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। নখ আঙ্গুলের মাংসের যত নিকটে, তিনি তার চেয়েও বেশী নিকটে রয়েছেন।

(ঙ) সমুদ্রের জলবিন্দু যদি নিজেকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে সেই মুহূর্তে তাকে শুকিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যতক্ষণ এই জলবিন্দু এক হয়ে থাকে, ততক্ষণ এই জলবিন্দু সমুদ্রেরই বিরাটত্বের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। তেমনি, মনুষ্য যখন নিজেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বস্তু ব'লে মনে করে না, তখন সে ঈশ্বরেরই সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি-বোধই হলো ঈশ্বরলাভের অন্তরায়।

---

* 'God is Law-himself.'

(চ) ঈশ্বর সতত সক্রিয়, এক মুহূর্ত তাঁর কাজের বিরাম নেই। সুতরাং অহংকার বর্জন ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করার অর্থ এই নয় যে মানুষ তার জীবনে আর কোন কাজ করবে না। সতত ক্রিয়াশীল এই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার অর্থ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা নয়: বরং সতত সক্রিয় হয়ে ওঠা। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ যে করে, তার কাজের অন্ত নেই, বিশ্রামও নেই। তাকে চির-সন্ধানী ও চির-কর্মী হয়ে থাকতে হবে। এই নিরন্তর শ্রমই তার বিশ্রান্তি, এই ক্লান্তিহীন আকুলতা এবং প্রয়াসই হলো তার জীবনের পরমা শান্তির পথ।*

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই ক্ষান্তিহীন আকুলতার পরিচয়ে বলা হয়েছে:

তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি দিনে
এক কাল না যায় কাটন।

ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য চিত্তের এই আকুলতাকে বাইরের কাজেও প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। সে কাজ হলো প্রেমসাধনার কাজ অর্থাৎ মানবসেবার কাজ। এই কাজও হবে ক্ষান্তিহীন—চিন্তায় সংকল্পে ও কর্মে। মানুষের সেবার জন্য নিরন্তর এবং প্রতিমুহূর্ত কর্মপ্রবণ হয়ে থাকাই ঈশ্বরের জন্য যথার্থ আকুলতা প্রকাশের সাধনা।

ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করার জন্য চিত্তে ও কর্মে যে প্রেমপ্রবণ আকুলতার প্রয়োজন, সে আকুলতা লাভের জন্য 'প্রার্থনা' নামে একটি আন্তরিক অনুষ্ঠানের কথাও গান্ধীজী বলেছেন। প্রার্থনাকে তিনি ঈশ্বরানুভূতি লাভের জন্য পালনীয় সকল আচরণের 'সারবস্তু' ব'লে মনে করেন।

কিন্তু 'প্রার্থনা' কা'কে বলে?

প্রার্থনা অর্থ ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া নয়। ঈশ্বরকে কোন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া নয়, কারণ কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়, তিনি পরম বেত্তা। প্রার্থনা হলো অন্তর-সত্তার (soul) আকুতি, এবং নিজের ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতাকে প্রতি দিন স্বীকার করা। নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করার প্রয়াস। নিজের অন্তরের ভেতরে সন্ধান করা। নিজেকে মৃদু দীন ও নিরহংকার করার প্রয়াস।

* 'This restlessness constitutes true rest. This never-ceasing agitation holds the key to peace ineffable.'

ঈশ্বরকে কোন কাজের কথা, অথবা কি করা উচিত, এসব স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিই তো সর্বসৃষ্টির অধিশ্বর, এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে।

কোয়েটা সহর ভয়ংকর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবং সেখানে গিয়ে পীড়িত মানবের সেবায় কাজ করবার জন্য গান্ধীজী প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে কোয়েটা সহরে প্রবেশ করতে দেননি।

কোয়েটার ভূমিকম্প ঈশ্বরেরই ইচ্ছার প্রকাশ, গান্ধীজী তাঁর সেবাকার্যের চেষ্টায় যে বাধা পেয়েছিলেন, সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত। কিন্তু এই যুক্তি অনুসারে কি বলতে হবে যে, কোয়েটার পীড়িতদের সেবার জন্যে চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই? পীড়িতের দুর্দশা মোচনের কাজটাও ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে, এবং সে জন্য ঈশ্বরের কাছে একটা প্রার্থনা জানিয়ে গান্ধীজীর পক্ষে চুপ ক'রে বসে থাকা কি অসঙ্গত হতো?

গান্ধীজী বলেন, খুবই অসঙ্গত। প্রার্থনা করার অর্থ কাজ এবং কাজ করার দায়িত্ব বর্জন করা নয়। কাজ বাদ দিয়ে শুধু প্রার্থনা করা প্রার্থনাই নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে, এবং তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে এই মাত্র প্রার্থনা করতে হবে—তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতি মুহূর্ত্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে কাজ করতে হবে। এই স্বীকৃতিই প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনা না থাকলে মানুষের পক্ষে কোন বৃহৎ কল্যাণকর্মে যথার্থ প্রেরণা ও শক্তি লাভও সম্ভবপর হয় না।

ইংরাজের ইতিহাসে পরিচিত কর্মবীর যোদ্ধা ক্রমওয়েলের একটি উক্তি আছে।—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, কিন্তু তোমার বারুদ তাজা ক'রে রাখ ('Have faith in God but keep your powder dry')। দেখা যাচ্ছে যে, ক্রমওয়েল ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' এবং 'আত্মচেষ্টা', এই দু'য়ের মধ্যে বিশ্বাসের বেশির ভাগটা গিয়ে পড়েছে আত্মচেষ্টার ওপর। নিজের চেষ্টার ওপরেই ক্রমওয়েলের নির্ভরতা বেশি, তাই বারুদ তাজা ক'রে রাখবার প্রয়োজনের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। 'যে নিজেকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেন'—এই রকম বিশ্বাসবাদই এক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজীর বিশ্বাসবাদ ঠিক এরকম নয়, অনেকখানি ভিন্ন। বরং বলা যায়—মূলতঃ ভিন্ন। গান্ধীজী যদি ঐ কথা বলতেন তবে কথাগুলিকে পালটিয়ে বলতেন—

'বারুদ তাজা রাখ, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ'। এই উক্তিতে, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরতাই হলো মুখ্য, বারুদের ওপর নির্ভরতাটা গৌণ। বারুদ তাজা রাখতে হবে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পরিণামে ঈশ্বরের ইচ্ছাই জয়ী হবে। ঈশ্বরনির্ভব এই কর্মবাদই প্রকৃত কর্মবাদ। কর্মী অথবা কর্মযোগী হিসাবে প্রকৃত শক্তির অধিকারী তিনিই হতে পারেন, যিনি ঈশ্বরেচ্ছার ওপরেই সর্ব কর্মের ফলাফল অর্পণ ক'রে, আত্মনির্ভরতা নামক সাধারণ মোহটি বর্জন ক'রে চলতে পারেন। ক্রমওয়েলীয় মনোভাবে যে দৌর্বল্য আছে, সেই দৌর্বল্যই কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে পার্থের 'হৃদয়দৌর্বল্য' হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।

তবে কি ঈশ্বরের কাছ থেকে 'করুণা' লাভের আশা মানুষ করবে না? তাঁর কি করুণা নেই?

গান্ধীজী বলেন, তিনি ঈশ্বরের করুণার প্রমাণ পেয়েছেন। নিজের জীবনেই বহুবার পেয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর করুণা করেন নিজের ইচ্ছায়। আপনি করুণা প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি করুণা করবেন আপনার ইচ্ছামত নয়, তাঁর ইচ্ছামত। আপনি যে বস্তুকে 'করুণা' মনে ক'রে প্রার্থনা করছেন, সেটা সত্যই করুণা কি-না, তা কি আপনি বলতে পারেন? ভুলের বশে অমৃত মনে ক'রে বিষকেই তো চাইতে পারেন? আপনি তো ধ্বংসশীল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি এবং ধারণা দিয়ে তৈরী একটা জীবন মাত্র। আপনার চাওয়ার মধ্যে অবশ্যই ভুল হ'তে পারে। কিন্তু ভুল করেন না তিনি, সেই ঈশ্বর; সেই 'সৎ', যিনি হলেন পরম-নির্ভরতা! তিনি আপনাকে করুণা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু সে করুণা হলো তাঁরই করুণা, আপনি যে বস্তুকে করুণা ব'লে মনে করেন সে বস্তু নয়।*

মানুষ যে দুঃখের আঘাত পায়, তা'ও ঈশ্বরেরই দান। তবে কি বলতে হবে যে, এই দুঃখের আঘাতগুলি হলো ঈশ্বরের অকরুণা? গান্ধীজী বলেন—না। ঈশ্বর ঠিক 'শাস্তি' দেন না, তিনি আঘাত প্রেরণ করেন মানুষকে 'শুদ্ধ' করার জন্য। 'আঘাত সে যে পরশ তব'! এই বিশ্বাস ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম প্রধান উপায়, এই বিশ্বাস জীবনে লাভ না করলে ঈশ্বরবিশ্বাসেই অপূর্ণতা থাকে, সুতরাং মনুষ্যত্ব অপূর্ণ থাকে। ফরাসী ইতিহাসে প্রখ্যাতা সেই কৃষক দুহিতা জোয়ান অব আর্কের জীবনকাহিনী নিয়ে একটি ইংরাজী ছায়া-ছবি হয়েছে। তার শেষ দৃশ্যে দেখা যায়—কুমারী জোয়ানকে রজ্জুবদ্ধ ক'রে শুকনো

*'He is always at your beck and call, but on his terms, not on your terms.'

কাঠের স্তূপের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে, এবং আগুন ধরানো হয়েছে। জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে অচঞ্চল ও শান্ত। আগুনের প্রথম শিখা যেই জোয়ানের দেহ স্পর্শ করলো, জোয়ানের মুখে একটি কথা উচ্চারিত হলো—মধুর ঈশ্বর! (Sweet God!) জ্বালাকর অগ্নিশিখার প্রথম স্পর্শকে ঈশ্বরের 'মধুর' স্পর্শ ব'লে উপলব্ধি করলো জোয়ান—চিত্রনাটকে এই ঘটনা সন্নিবেশ ক'রে কাহিনীর লেখক বিশ্বাস-বাদের সার কথাই অভিব্যক্ত করেছেন। বাংলার কবি রজনীকান্ত সেনের শোকাঘাতপীড়িত এবং নিদারুণ রোগযন্ত্রণাকাতর শেষজীবনে লিখিত কবিতাগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁবা বুঝতে পারবেন, প্রকৃত বিশ্বাস কা'কে বলে। প্রত্যেকটি আঘাতের মধ্যে কবি ঈশ্বরের করুণার পবিচয় পেয়েছেন, এবং সেই উপলব্ধিকে কাব্যরূপ দান করেছেন।

নির্ভয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এই আব একটি পদ্ধতি। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পিত মানুষই প্রকৃত নির্ভয়ের অবিকারী হয়। নির্ভয় হবাব চেষ্টাও ঈশ্বরের কাছে উপনীত হবার চেষ্টা। গান্ধীজী নির্ভয়-তত্ত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "বাইরের সব ভয় বর্জন করতে হবে। কিন্তু নিজের ভেতরের শত্রুদের (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) অবশ্যই ভয় করতে হবে। ভেতরের এই শত্রুদের পরাভূত করতে পারলে, বাইরের ভয়গুলি আপনা থেকেই লোপ পেয়ে যাবে। ভিতরের ভয়গুলি সবই এই দেহজ মোহকে কেন্দ্র ক'রে অবস্থিত। সুতরাং যে মুহূর্তে এই দেহের ওপর থেকে আসক্তি অপ-সারিত করা হবে, সেই মুহূর্তে ভিতরের সকল ভয়ও দূর হয়ে যাবে।... সম্পদ, আত্মীয়স্বজন এবং এই দেহ—এসবের ওপর থেকে যখন আসক্তি বর্জন করা হবে তখনই দেখা যাবে যে হৃদয়ে ভয় নামক কোন বস্তু আর নেই। প্রভুত্ববোধ বর্জন ক'রে নিজেকে সেবকে পরিণত করলে, এবং নিজেকে পায়ের তলার ধূলোর মতো নিরহংকার ক'রে রাখলে, সকল ভয় কুয়াসার মত মিলিয়ে যাবে। তখন পরমা শান্তি লাভ হবে, এবং সত্যনারায়ণকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে।"

গান্ধীজী নির্ভয়-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়-বর্জনের (Non-Possession) তত্ত্বটিও তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। বিষয় যে বর্জন করে, সেই প্রকৃত নির্ভয় হতে পারে। শুধু বিষয়বর্জন নয়, বিষয়-বাসনা বর্জন।

মানুষের দেহও তার একটা বিষয়, এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যেমন, দেহ নামক বিষয়ের প্রতিও তেমনি আসক্তি বর্জন করতে হবে।

অনাসক্তি লাভের একটি প্রধান উপায় হলো, বিষয়কেই বর্জন করা। তাহ'লে কি দেহকেও বর্জন ক'রে অনাসক্ত হ'তে হবে?

অন্যান্য বিষয়ের বর্জনের মত দেহ বর্জন করার কোন অর্থ হয় না। কারণ দেহকে আশ্রয় করেই প্রাণ, এবং সেই সঙ্গে মরজীবন চলছে। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই অমৃতজীবন; এবং দেহজ আসক্তি হতে মুক্ত হলে ও প্রবৃত্তির ক্ষয় হলেই 'দেহ হতে মুক্ত' যথার্থ মুক্তজীবন লাভ করা যায়।

গান্ধীজী পূর্বজন্মে বিশ্বাসী। বিষয়বাসনার ক্ষয় হ'লে জন্ম-মৃত্যুব চক্র হতে মুক্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম গ্রহণ কবতে হয় না। বিষয়বাসনা তথা প্রবৃত্তিজ মোহগুলিই দেহ নামক পিঞ্জব সৃষ্টি ক'রে আত্মাকে বন্দী ক'রে থাকে। প্রবৃত্তিগুলিই বার বার 'দেহী'-রূপে জন্মলাভ করে, এবং 'প্রকৃত আমি' তথা আত্মা মুক্তি পায় না। সুতরাং দেহবর্জন করার অর্থ দাঁড়ায় জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি, এবং সে মুক্তি দেহজ প্রবৃত্তির ও আসক্তিব ক্ষয় সাধন ক'রেই লাভ করতে হবে। আত্মহত্যাকে 'দেহবর্জন' বলা চলে না।

দেহের আসক্তি থেকে মুক্ত হলেও মানুষেব দেহটা তো ইহজীবনে কিছুকাল থেকে গেল, এখন এই দেহ নিয়ে কি কববে মানুষ? গান্ধীজীর কথা হলো:

> "এই পূর্ণ অনাসক্তি লাভের পব দেহ শুধু থাকবে অপরের সেবা ও কল্যাণের কাজ করবার জন্য। একমাত্র সেবার জন্যই, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।"

দেহ ধারণ ক'রে রাখবার জন্য খাদ্য-পানীয়েব অবশ্যই প্রয়োজন হবে। কিন্তু অনাসক্ত মানুষেব কাছে আহার নিদ্রা জাগবণ ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়াগুলির সবই একমাত্র পরসেবার ব্রত ব'লে মনে হবে। কারণ, যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন ঐসব দৈহিক ক্রিয়া অথবা দেহটাকে আর নিজের প্রয়োজনের বিষয় ব'লে মনে হয় না। দেহ এবং ঐহিক জীবন, এই দু'টি বিষয়সম্পদের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী মানুষকে বস্তুতঃ অছি (trustee) হয়ে থাকতে বলেছেন।

কিন্তু এ রকম পূর্ণ অনাসক্তি কি সম্ভব? গান্ধীজী বলেন—সম্ভব নয়। তবে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হবার চেষ্টাই হবে মানুষের চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফলে মানুষের মন যে প্রকৃতি লাভ করবে, তারই সাহায্যে মানুষ [illegible] সুখ

উপলব্ধি করবে ; এবং দেখতে পাবে, প্রকৃত আনন্দের রূপ তার চোখের সম্মুখে এসে গেছে।*

সাধক দার্শনিকেরা যা'কে বলেন সচ্চিদানন্দ, গান্ধীজী তারই পরিচয় সাধারণ ভাষায় সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য বর্ণনা করেছেন, এবং জীবনে 'সত্যনারায়ণ' অথবা 'সচ্চিদানন্দে'র সাক্ষাৎ মুখোমুখি পাওয়ার জন্য যে সাধনপথের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে দুরূহতা আছে, কিন্তু জটিলতা অথবা অস্পষ্টতা নেই। পুরাতন অথবা নূতন কোন আনুষ্ঠানিক পূজন-প্রক্রিয়া, অথবা একটা বিধিবদ্ধ ধর্মানুশীলনের রীতি তিনি উপস্থিত করেন নি। এ বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ সহজিয়া। প্রাত্যহিক আচরণ ও চিন্তাকে অনাসক্তি, সংযম, নির্ভয়, ঈশ্বর-নির্ভরতা, অহংকারশূন্যতা ও সেবকতা তথা প্রেমের দ্বারা মণ্ডিত ক'রে যে অহিংস জীবন লাভ করা যায়, তিনি তারই সন্ধান দিয়েছেন। এ তত্ত্ব নূতন নয়, গান্ধীজীর পূর্বেও জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকেরা এ তত্ত্বের সন্ধান মানুষকে জানিয়ে গেছেন, কিন্তু গান্ধীজী সে তত্ত্বের সন্ধান যেভাবে জানিয়েছেন এবং সেই তত্ত্ব উপলব্ধির যে পন্থা দেখিয়েছেন, তার মধ্যেই নূতনত্ব আছে। নূতন যুগের নূতন পরিবেশে মানুষের বোধগম্য ক'রে সে তত্ত্বকে পরিবেষণের পদ্ধতিতে যে নূতনত্ব থাকা প্রয়োজন, গান্ধীজীর ব্যাখ্যায় তারই পরিচয় পাই। তিনি যেন সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের পক্ষে পালনীয় এবং পালনসাধ্য একটা সহজ গণধর্মের মতন ক'রে ঈশ্বরোপলব্ধির সাধনপন্থার পরিচয় দিয়েছেন। কবি মিলটন তাঁর কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছেন—'মানুষের কাছে ভাগবত পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও সমর্থন করা' ('justifying the way of God to man')। গান্ধীজীও যুগের মানুষের কাছে তাঁর সারা জীবনের কাজে চিন্তায় ইচ্ছায় ও চেষ্টায় ঈশ্বরনির্ভর বিশ্বাসী জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সার্থকতা প্রমাণিত করেছেন। সংশয়াপন্ন যুগকে তিনি সত্য সত্যই অপহৃত স্বর্গের সন্ধান জানিয়েছেন। গ্রীক জ্ঞানী প্লেটো চেয়েছিলেন—জীবনে শুদ্ধ ও সৎ-নীতিসম্মত ভাবের প্রয়োগ ('application of moral ideas to life')। গান্ধীজীরও তাই লক্ষ্য। গান্ধীজীর চিন্তা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এই সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে যে, অহিংসাই প্রকৃত মর‍্যালিটি।

অহিংস জীবনচর্যার কথা গান্ধীজী বলেছেন, যার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক

* 'Such an attitude of mind brings us real happiness, and the beatific vision in the fulness of time.'

স্থাপিত করা সম্ভবপর হয়। সেই বিশ্বাসের জীবন অসুখী জীবন তো নয়ই, বরং বলা যায় প্রকৃত সুখী জীবন। উড়িষ্যা অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণকালে গান্ধীজীর দৈহিক ক্লেশ দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কি না? তিনি বলেছিলেন—না।

আপনি কি সুখী? এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, সুখী। 'আমার সুখ বাইরের কোন বস্তু বা অবস্থার ওপর একেবারেই নির্ভর করে না।' তিনি সাধকোচিত উপলব্ধির সেই তত্ত্বটুকুই জানিয়েছিলেন যে, সুখ হলো মনে, সুখবোধে। দেহের ক্লেশ যখন মনের ক্লেশ সৃষ্টি করতে না পারে, তখনই তো যথার্থ মুক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে এই অবস্থাই হলো পরম 'স্বরাজ'।

> "প্রসন্ন মনে সহ্য করলে দুঃখ আর দুঃখ হয়ে উঠতে পারে না। দুঃখ তৎক্ষণাৎ অনির্বচনীয় আনন্দে পরিণত হয়।"

গান্ধীজীর কাছে সুখ অবস্থা-সাপেক্ষ বা বস্তু-সাপেক্ষ ছিল না। সাধিকা বলেছেন—আরে মোর সরাঙ্গিয়া, মোর দিল বিচ সব সুর বাজে! রে আমার বীণা, আমার হৃদয়ের ভেতরেই যে সব সুর বেজে চলেছে। সুরের নাদমাধুর্য বীণার তারের কম্পন থেকে নয়, সাধিকা তাঁর মনের তারের কম্পন থেকেই উপলব্ধি করেছেন। গান্ধীজীর চিত্তের আনন্দধর্ম কতখানি বস্তু-নিরপেক্ষ হয়েছিল, তার প্রমাণ একটা ছোট ঘটনায় পাওয়া যায়। দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রাত্যহিক প্রার্থনা-সভায় একদিন গান গাইতে হয়েছিল এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি আদৌ গায়ক নন, সুকণ্ঠও নন, অর্থাৎ তিনি গান করতে পারেন, গান গাইতে পারেন না। তিনি হলেন কলকাতার জনৈক সাংবাদিক ফটোশিল্পী, কার্যসূত্রে প্রার্থনা-সভায় তখন উপস্থিত ছিলেন, এবং গান করলেন—'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।' প্রার্থনা-সভার ভাষণে গান্ধীজী বললেন, তিনি এ গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। সঙ্গীতের যে সুরমাধুর্যে মানুষ মুগ্ধ হয়, সে মাধুর্য রয়েছে গান্ধীজীর মনেরই ভেতরে। সুতরাং, অনিপুণ গায়কের কণ্ঠ হ'তে ধ্বনিত সঙ্গীত গান্ধীজীর মুগ্ধ হবার পথে কোন বাধা হয়ে উঠতে পারেনি।

বিশ্বাসই শক্তি

গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই বিশ্বাসে বিধৃত হয়ে রয়েছে। মানুষের প্রতিও তিনি বিশ্বাসী, কারণ তিনি মনে করেন যে মানুষের ভিতরটা সৎ। তিনি বিশ্বাস করেন, সৎ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ কাজে যে কোন মানুষের মন সাড়া দিতে বাধ্য। গান্ধীজীর ছেলেবেলায় দেখা সেই রাজকোটের বীণাবাদকের মত শুধু জানা চাই, বীণাযন্ত্রের কোন্ তারে কিভাবে স্পর্শ করলে ঠিক সুর বেজে ওঠে।

> "প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এইরকম 'তার' আছে। যদি আমরা শুধু বুঝে নিতে পারি, কিভাবে ঠিক আসল তারটির ওপর স্পর্শপাত করতে হয়, তা'হলেই আমরা ঠিক সুরটা তুলতে পারবো।"

বহিঃপ্রকৃতির জড়ের স্বভাবের মধ্যে, এবং প্রাণের স্বভাবের মধ্যেও 'বিশ্বাসে'র লীলা অবিরাম প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বস্তুজগতের সকল কিছুর নিয়ত পরিবর্তন ও ধ্বংসের মধ্যেও এমন একটা জাগ্রত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, যে শক্তির পরিবর্তন নেই, ধ্বংসও নেই। সর্ব বস্তুকে সংযুক্ত ক'রে রয়েছে, সৃষ্টি করছে, ভিন্ন ক'রে সাজিয়ে আবার সৃষ্টি করছে—এক মিলনী ও ধারণী শক্তি, এবং এই শক্তিলীলার মধ্যেই এক 'পরম অপরিবর্তনীয়ে'র পরিচয় পাই। গান্ধীজী বলেন:

> "আমি দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের ধারা রয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং মিথ্যার মধ্যেও সত্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"

বিশ্বাসী গান্ধীজীর এই উক্তিতে যে প্রবল আস্তিক্যবাদ ফুটে উঠেছে, তাকে আমরা অপ্‌টিমিজমের পরাকাষ্ঠা বলতে পারি। শুভ এবং সৎ-ই চিরজয়ী ও অবিনশ্বর। মিথ্যা, মৃত্যু এবং অন্ধকার ইত্যাদি 'নাস্তি'গুলি নয়। উপনিষদের ঋষি অসত্য হতে সৎ-এ, মৃত্যু হতে অমৃতে এবং অন্ধকার হ'তে জ্যোতিতে উপনীত হবার জন্য যে আকুলতা প্রকাশ করেছিলেন, তাকে বলতে পারা যায়, অচির এবং 'নাস্তি'-র জগৎ হ'তে সুচির এবং অস্তির জগতে উপনীত হবার আকুলতা।

কবি শেলি লক্ষ্য করেছিলেন, বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এক মহামিলনী শক্তির লীলা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গিরিশিখর আকাশকে চুম্বন করার জন্য উৎকণ্ঠ, এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গের হাত ধরে চলেছে। নির্ঝর নদীতে এসে মিলিত হয়, এবং নদী গিয়ে মিলিত হয় সাগরে।

"All things by a law divine
In one another's being mingle"—

কবি শেলির বর্ণিত এই 'প্রেমের দর্শন' ঈশ্বরবিশ্বাসী কর্মযোগী গান্ধীর অনুভবের মধ্যে হুবহু ফুটে উঠেছে দেখতে পাই।

> "প্রকৃতির মধ্যে যদিও বস্তুসমূহের পরস্পরের নিকট হ'তে পৃথক্ হয়ে যাবার ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু দেখতে পাই যে, প্রকৃতি 'বেঁচে' রয়েছেন বস্তুসমূহের পরস্পরের আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। বস্তুসমূহের পরস্পরের প্রতি প্রেম তথা মিলনের আগ্রহ রয়েছে ব'লেই প্রকৃতি সক্রিয় রয়েছেন।"

শুধু বহিঃপ্রকৃতির জড় ও প্রাণের মধ্যে নয়, গান্ধীজী মানুষজাতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেয়েছেন যে, মনুষ্য ইতিহাস বস্তুতঃ মানুষে-মানুষে নিকট হবার চেষ্টার ইতিহাস। তিনি মানুষের ইতিহাসে ক্রমোন্নত অহিংসারই (Progressive Ahimsa) ধারা লক্ষ্য করেছেন। আদিম শিকারীজীবন, তারপর যাযাবর-জীবন, এবং তারপর বসতিস্থাপক কৃষকরূপে জীবনযাত্রার 'সভ্য' পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠালাভ—মানুষের সামাজিক ইতিহাসের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষে-মানুষে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হবার এক বিরাট চেষ্টার ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা যায়। মনের দিক দিয়েও মিলনধর্মী প্রকৃতির একটা ক্রমোন্নত প্রসার ও পরিব্যাপ্তি এই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের ধারার সঙ্গেই মিশে রয়েছে।

> "নিজের ওপর যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা অপরের ওপরে প্রসারিত হয়েছে। অপরকে ভালবাসতে শিক্ষা লাভ ক'রে মানুষ প্রথমে যে সমাজ গড়েছিল, সেটা ছিল তার 'পরিবার'। ব্যক্তির প্রীতি যেমন প্রসারিত হয়ে পরিবার গড়েছিল, তেমনি এই পারিবারিক প্রীতির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ক'রে মানুষ 'জাতি' বা নেশন নামে সমাজ-বদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। অপরকে 'আপন' লোক ব'লে মনে করা, অর্থাৎ প্রীতির সম্পর্ক এখন মাত্র জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু এই

প্রীতিকে একদিন আরও প্রসারিত ক'রে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে আপন ব'লে মনে করবার চেষ্টা করতে হবে।"

বাংলার বাউল উপলব্ধি করেছিলেন—হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ যুগ ধরি, তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি!' এবং 'ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফোটার না হয় শেষ। সৃষ্টি-লীলার প্রবাহ অন্তহীন, এবং সেই প্রবাহে হৃদয়ের কমল ফুটেই চলেছে, কিন্তু ফোটার শেষ হচ্ছে না। মানুষের ইতিহাসের ধারাকেও অন্তহীন উন্নতির ধারা ব'লে গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, এবং দেখেছেন যে মানুষের সমাজও বাউলের হৃদয়-কমলের মত ফুটেই চলেছে, অধিক থেকে অধিকতর আত্মিক (spiritual) ভাব রূপ গুণ ও শক্তি লাভ করার দিকে।*

প্রেমই হলো অহিংসা। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছেন, ঈশ্বরই হলেন পূর্ণ প্রেম। বহিঃপ্রকৃতির জড় ও প্রাণের রীতি-নীতি এবং পরিণামের মধ্যে এই প্রেম তথা অহিংসারই শাসন দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের ব্যক্তি-মন এবং সমাজ-মনের ঐতিহাসিক বিবর্তনেও দেখা যায় যে, অহিংসাই উত্তরোত্তর অধিকতর ব্যাপ্তি এবং প্রকাশ লাভ ক'রে, মানুষকে অন্তহীন পরিবর্তনের ধারার ভেতর দিয়ে আত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে চলেছে। এক জড়কণিকাও অপর জড়কণিকাকে অবিশ্বাস করে না। অবিশ্বাসটাই জগতে একটা অস্বভাব মাত্র; স্বভাব হলো বিশ্বাস। প্রেমে বাঁধা জড় ও প্রাণের জগতে সকল বস্তু কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে এক বিরাট বিশ্বাসের নিয়মতন্ত্রের অধীনে। ইতিহাস চলছে বিশ্বাসের জোরে, সংশয়ের জোরে নয়। কবি ব্লেকের আশঙ্কা মিথ্যে নয়: "যদি চন্দ্র ও সূর্য সংশয় করতে পারতো, তবে তারা এক মুহূর্তে নিভে যেত।"

If the Sun and Moon could doubt,
They would instantly go out!

বিশ্বাস নামক এত বড় একটি স্বভাব-শক্তির আধার কোথায়? দার্শনিকের উত্তর হবে—ঈশ্বরে। কিন্তু ঈশ্বরেরই প্রসাদরূপী এই বিশ্বাস নামক বৃহৎ শক্তি ধারণ করার জন্য মানুষকে তিনি যে বস্তুটা দিয়েছেন, সেটি মস্তিষ্ক নয়, সেটি হলো হৃদয়। মস্তিষ্ক তথা যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত যে জ্ঞান, সে জ্ঞানও মানুষের একটা শক্তি। কিন্তু হৃৎ-শক্তিই হলো যথার্থ ডায়নামিক, যা মানুষকে সকল কাজে মাতিয়ে তোলে। এই হিসাবে গান্ধীজীকে

* "Human society is a ceaseless growth, an unfoldment in terms of spirituality."

যদি 'মরমী' সাধক বলা যায় তবে বোধ হয় ভুল হবে না। কারণ, তিনি মানুষের চলার পথে হৃদয়কেই পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা দিয়েছেন।

"আমি এই একটি মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, যদি কোন বৃহৎ কর্তব্য পালন করতে হয়, তবে শুধু যুক্তির সাহায্য পেলেই কাজ হবে না। হৃদয়কেও পরিস্ফূর্ত করতে হবে।"

যুক্তি-বুদ্ধিকেই সর্বজয়ী মনে করা বস্তুতঃ একটা পাথরকে ভগবান মনে ক'রে পূজো করার মত জড়পূজা মাত্র। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মাত্রই যে হৃদয়বান হয়ে থাকেন, এমন নিয়ম দেখা যায় না। অথচ যে মিলন-ধর্ম মানুষের ইতিহাসে স্বভাবজরূপে দেখা যাচ্ছে, সে মিলন-ধর্মের প্রীতিধারা উৎসারিত হয়ে আসছে মানুষের হৃদয় থেকেই, মস্তিষ্ক থেকে নয়। হৃদয়বানের মূর্খতা বস্তুতঃ মূর্খতাই নয়, কারণ সে নিখিলবিরাজিত প্রীতি-বিশ্বাস-ঐক্য-মিলনের নিয়মতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ ব্যতিক্রম বা অবান্তরতা নয়, সে সর্বনিয়ামক অহিংস শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছে। কিন্তু হৃদয়হীন অত্যন্ত যুক্তি-বুদ্ধিশীল হ'লেও সে এই জাগতিক ছন্দের বিরুদ্ধাচারী। তার বুদ্ধি জগতের কোন কাজেই আসবে না, কারণ সে বুদ্ধির প্রয়োগেই ভুল করবে। নিজের 'ভিতরের' সঙ্গেই যার পরিচয় হলো না, সে তো অপূর্ণ। নিজের ভিতরকে যে উপলব্ধি (গান্ধীর কথায়—'inner understanding of man') করতে পারলো না, তার পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা কি সম্ভব ? কারণ সে ঈশ্বরও যে ঐ 'ভিতরের' জিনিস, হৃদয়সংস্থিত।* সহজিয়া বলেন—তোমারে হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। গান্ধীজীর অহিংসা মূলতঃ হৃদয়াচরণীয় ধর্ম। ঈশ্বরের স্বরূপ, এবং ঈশ্বরীয় লীলার সকল রূপ প্রত্যক্ষ করার চক্ষু হলো হৃদয়। বাউল বলেন—এ তরঙ্গ দেখবি যদি, মিলা নয়ন হৃদয় সনে।

বিশ্বাসীর হৃদয় থমকে থাকার হৃদয় নয়। এ হৃদয় হলো সন্ধানী যাত্রীর মত, যেন অতি দূরান্তের এক মন্দির-চূড়া লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এ চলার শেষ নেই, কারণ এ মন্দির-চূড়াও যে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। গান্ধীজী বলেন—আমাদের পূর্ণ অহিংসার জগৎ এই রকমই একটা কল্পনীয় লক্ষ্য হয়ে চিরকাল এগিয়েই যেতে থাকবে।

---

*But He is no God who merely satisfies the intellect, if he ever does. God to be God must rule the heart and transform it.

"এই লক্ষ্য চিরকাল দূরেই সরে যেতে থাকবে। কিন্তু আমাদের আনন্দ হলো, শুধু সেই লক্ষ্য লাভের চেষ্টাটাই; লক্ষ্যে উপনীত হওয়াতে নয়। পূর্ণ চেষ্টাই হলো পূর্ণ জয়।"

অনন্তের সন্ধান কখনো সাস্ত হতে পারে না। সত্যের সন্ধানী হয়ে থাকাই জীবনের শ্রেয়োসাধনা। এ সন্ধানের বিশ্রাম নেই। এ তত্ত্বের আবিষ্কর্তা যদিও গান্ধীজী নন, কিন্তু আধুনিক যুগে তিনি এই তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা।

মানুষের ভাবসাধনার রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তরের সুর এই সন্ধানের সুর। এক পরম প্রাপ্তব্যের জন্য আকুলতা আক্ষেপ, মিলন-প্রয়াস, অন্বেষণ ও অভিসার। একজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মানুষের চিত্ত পথে বের হয়েছে, খুঁজে খুঁজে ফিরছে। বিশ্বসৃষ্টির রূপ যে ছন্দে স্পন্দিত, সেই ছন্দ নিয়েই মানুষের ভাবনা ও কল্পনা 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে। হিব্রু সাধক মুসা যে আকাঙ্ক্ষিত জগতের (Promised Land) জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন, সে আকুলতা হিব্রু সাহিত্যে সন্ধানের সুর এনে দিয়েছে। গ্রীক মহাকবি হোমারের ওডিসির মনও তো এক সুদীর্ঘ যাত্রায় ভ্রমণ ক'রে এবং অন্বেষণ ক'রে ফিরছে। কালিদাসের মেঘদূত যক্ষপ্রিয়াকে অন্বেষণের জন্য ছুটে চলেছে। গ্যেটের ফাউস্ট জীবনের এক পরম কাম্যের জন্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিলিউড এবং এক্সকার্সন কাব্য হলো এক কাম্যের অনুসন্ধান। কীট্সের এনডিমিয়ন এবং ব্রাউনিং-এর প্যারাসেলসাস এক মনোময়ী আদর্শ-সুন্দরীর জন্য অস্থিরতা ও মত্ততার কাব্য। বৈষ্ণবের রাধা তো 'পাগলিনী' হয়ে মুরলীধারী প্রিয়ের অন্বেষণে ছুটেছে কখনো কদম্বকুঞ্জে, কখনো অভিসারিকা হয়ে সঙ্কেতকুঞ্জে। আকুলতার এবং সন্ধানের হৃদয় নিয়েই সাহিত্য।

গান্ধীজী বলেন, এই সন্ধানের সাধনায় অহিংসাকে পাথেয় ক'রে নিয়ে চল। তা'হলেই তোমার সন্ধান সোজা পথ এবং সরল পথ খুঁজে পাবে।

Move upward, working out the beast
And let the Ape and the Tiger die.

কবি টেনিসনের কল্পনায় যে তত্ত্ব ধরা পড়েছে, গান্ধীজী সেই তত্ত্বকেই তাঁর জীবনে প্রমূর্ত করেছেন।

কর্মতত্ত্ব ও সাধুশ্রম

ঈশ্বরবিশ্বাসী গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগৎ একটা নিয়মের অধীনে চলছে। সে নিয়ম হলো ঈশ্বরের নিয়ম, ভাগবত বিধান বা আধ্যাত্মিক বিধান (Spiritual Law)। এই আধ্যাত্মিক বিধান জাগতিক সকল বস্তু কর্ম কাল ও ক্ষেত্রের ওপর ক্রিয়াশীল। অধ্যাত্মক্ষেত্র নামে একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নয়, মানুষের প্রাত্যহিক সকল কর্মের ক্ষেত্রে একই ঈশ্বরের নিয়ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিধান কাজ করছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিয়ম কাজ করছে। মানুষের মন এবং মানুষের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি বা সমাজনীতি নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে নেই। গান্ধীজী দেখেছেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রই প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। এক ক্ষেত্রের অবস্থা অপর ক্ষেত্রের অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

ঈশ্বর এক, দুই নহেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকেও গান্ধীজী 'এক' মনে করেন। ভিন্ন ভিন্ন 'দেহী' হলেও মানুষের আত্মা এক, যেমন সূর্য-রশ্মি নানা আধারে প্রতিফলিত হয়ে নানা রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু সকল বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির মূলাধার হলো এক, সেই সূর্য।

পৃথিবীর সমস্ত মানবজীবনও বিধৃত হয়ে রয়েছে এক পরম 'ঐক্যে'র সূত্রে। মানুষের এই আধ্যাত্মিক পরিচয় তার ঐতিহাসিক পরিচয়েও সত্য। মানুষের এই 'ধর্ম'কে গান্ধীজী চিনতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মানুষের সমগ্র কর্মক্ষেত্রে ধর্মসম্মত নীতির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। যাগযজ্ঞ-হোমতপ-বলি-পূজা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার নয়, এবং মূর্তি-মন্দির-গির্জা-মসজিদে আশ্রিত প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয়তা নয়, গান্ধীজী ধর্ম অর্থে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক বিধানকেই (spiritual law) মনে করেছেন, যা সমগ্র মানবসমাজের সম্পর্কেই সত্য। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি উৎপাদন, বণ্টন, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি ধর্মের সুরক্ষা চেয়েছিলেন। ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হতে পারে না, এর সম্যক্ অর্থ এই যে, সমগ্র মানবসমাজের জীবন যে চিরন্তন সত্যের নিয়মে অন্তরে-অন্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

রয়েছে, সে নিয়মের অন্যথা ক'রে কখনো কাজ করা উচিত নয়। করলে তার ফল হবে মানবের অশুভ। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির মধ্যে হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব বা খৃষ্টানত্ব নামে পৃথক্ পৃথক্ সত্যের অস্তিত্ব গান্ধীজী দেখতে পাননি। তিনি দেখেছিলেন, একটি অখণ্ড মানবিক সত্য।

গান্ধীজী তাঁর রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে এই আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করেছেন। পৃথিবীর সমগ্র মানব-জীবন একটা ঐক্যের সূত্রে সংযুক্ত—এই তত্ত্বের সূত্র ধরেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের সূত্রগুলি রচনা করেছেন।

> "আমি অদ্বৈতে বিশ্বাসী। আমি মানুষের অন্তর্নিহিত অভিন্নতায় (essential unity) বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, সকল প্রাণী-জীবনের অভিন্নতায় তথা ঐক্যে বিশ্বাসী। সুতরাং, আমি মনে করি, একজন মানুষ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাতে লাভবান হয়। তেমনি, যে পরিমাণে এক জন মানুষের অবনতি হয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সেই পরিমাণে অবনত হয়।"

সাম্যতত্ত্বের এত বড় ব্যাখ্যা আর কোন মনীষীর চিন্তা হতে পাওয়া গেছে কি না জানি না। একজন মানুষের ভালমন্দের ওপর সমগ্র মানব-জাতির ভাল-মন্দ নির্ভর করে। মানবীয় পরিণামের মধ্যেও এক সুগভীর ঐক্যের প্রমাণ গান্ধীজী পেয়েছেন। এই সূত্র হতেই তিনি আর এক সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন :

> "সুতরাং, কোন এক ব্যক্তির ভাল হলো কি মন্দ হলো, এটা সেই একজন মানুষেরই চিন্তার বিষয় নয়। এটা বস্তুতঃ সমগ্র সমাজের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর চিন্তার বিষয়।"

একজন মানুষ অন্নবস্ত্রহীন অবস্থায় থাকলে সমগ্র সমাজের কোন মানুষেরই পক্ষে অন্নবস্ত্র লাভের অধিকার নেই—গান্ধীজী এই নীতিকে মূলসূত্র ক'রে তাঁর অর্থনৈতিক আদর্শ নির্ণয় করেছেন। সমাজের উৎপাদন ও বণ্টন, কর্মের অধিকার এবং ভোগের অধিকার—সকল ব্যবস্থায় ও অধিকারে ঐ মূলনীতিরই প্রতিষ্ঠা তিনি চেয়েছেন। ইংরাজ-মনীষী রাস্কিনের লেখা যে পুস্তক * পাঠ করে গান্ধীজী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি অর্থনৈতিক আদর্শের ঐ মূল সূত্রটিই

* Unto the Last—*Ruskin*

পেয়েছিলেন—"একজন মানুষের কল্যাণ সমগ্র মানুষের কল্যাণের মধ্যে নিহিত রয়েছে।" ব্যক্তি ও সমষ্টির এই অবিচ্ছেদ্যতা লক্ষ্য ক'রেই গান্ধীজী সকল কর্ম-ক্ষেত্রে সর্বোদয়ের নীতি প্রবর্তনের কথা বলেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে গান্ধীজী 'সর্বে'র অধিকার চেয়েছেন :

> "মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি উৎপাদনের ব্যবস্থা যদি সর্বসাধারণের অধিকারে থাকে, তবে অন্নবস্ত্রের অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত হবার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে না।"

ঈশ্বরের প্রদত্ত জল আলো বাতাস ইত্যাদি বস্তু সর্বসাধারণের জন্য খোলা পড়ে আছে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় এই বস্তুগুলি গ্রহণের অবাধ অধিকার সবারই আছে। তেমনি অধিকার সর্বসাধারণের থাকবে অন্ন-বস্ত্র-গৃহ ইত্যাদি 'জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির' ওপর। অন্ন-বস্ত্রের উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলিকে অপরকে শোষণ করবার ব্যবস্থায় পরিণত করবার অধিকার কারও নেই। এই ব্যবস্থার ওপর কারও মনোপলি বা আত্যন্তিক অধিকার থাকবে না। কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, এমন কি কোন জাতির পক্ষেও এমন আত্যন্তিক অধিকার থাকতে দেওয়া চলতে পারে না।

উৎপাদনের ব্যবস্থাকে গান্ধীজী ন্যায়সঙ্গত করতে চেয়েছেন। উৎপাদনের ব্যবস্থাও 'মর‍্যাল' হওয়া চাই। তারই প্রথম সূত্র হিসাবে তিনি দিয়েছেন, উৎপাদন-ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের অধিকার। দ্বিতীয় সূত্র, ব্যক্তির কর্মকেই 'মর‍্যাল' করা, অথবা ধর্মসঙ্গত করা।

ভগবান তথাগতের একটি উপদেশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> "পুষ্পের সৌরভ নষ্ট না ক'রে এবং পুষ্পের রূপ অবিকৃত রেখে প্রজাপতি যেভাবে পুষ্প হতে মধু আহরণ করে, তোমরাও সেইভাবে জীবনের প্রয়োজনের তৃপ্তি সাধন করবে।"

গান্ধীজীও মানুষের কর্মরীতির মধ্যে অহিংসার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। নিজের প্রয়োজনেই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। এই প্রসঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে—নিজের প্রয়োজন কা'কে বলে ?

জীবনধারণের জন্য যেটা অবশ্যপ্রয়োজন, সেটা হলো অন্ন। নিজের হাতে কাজ ক'রে নিজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এ কাজ

করার পর, জীবনের আর সব কাজ হবে পরার্থে। সাহিত্য, বিদ্যানুশীলন, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল কলাগত এবং বুদ্ধিগত শ্রম সমাজকল্যাণের প্রয়োজন সাধনের জন্য উৎসর্গ করতে হবে।

টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজী এই 'রুটি-শ্রমের' (Bread Labour) তত্ত্বটি নিয়েছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যেও তিনি এই তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। শ্রম না ক'রে যে অন্নগ্রহণ করে, সে যজ্ঞের বিনাশকারী। বিনা শ্রমে অন্ন ভোগ করা চৌর্য। শ্রম অর্থে কায়িক শ্রমের কথাই গান্ধীজী বলছেন, বৌদ্ধিক শ্রম নয়। বুদ্ধির চর্চায় নিযুক্ত পণ্ডিতকেও কায়িক শ্রমের দ্বারা তার প্রয়োজনীয় অন্নটুকু উৎপাদন করে নিতে হবে। কায়িক শ্রম না করলে অন্নভোগের অধিকারও মঞ্জুর হয় না।

গীতায় বলা হয়েছে :

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ॥

—দেবতাগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করবেন। সুতরাং এই দেবতাপ্রদত্ত বস্তু দেবতাদের নিবেদন না ক'রে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

গান্ধীজী মনে করেন, সমাজে কায়িক শ্রমের মর্যাদা যদি স্বীকৃত না হয়, তবে মানুষে-মানুষে ভেদ কখনো ঘুচবে না। সকলেই কায়িক শ্রম করলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে উচ্চ-নীচ পার্থক্য-বোধ আর থাকে না। কায়িক শ্রমসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শ্রেণী-বিভিন্নতা থাকবে, সেটা শ্রেণী-বৈচিত্র্য মাত্র। সমগ্র সমাজের কল্যাণ করার জন্য বিজ্ঞানী শিল্পী জ্ঞানী গুণী ও কর্মীর বিভিন্ন শ্রেণী। শোষক ও শোষিতের শ্রেণীতে সমাজের বিভক্ত হবার কোন কারণই থাকবে না।

দরিদ্রনারায়ণের সেবার কথা অনেকেই বলেছেন এবং গান্ধীজীও বলেছেন। কিন্তু গান্ধীজী দরিদ্রনারায়ণকে রুটি ও কম্বল দান ক'রে সেবা করতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তবে আমি প্রত্যেক সদাব্রত বন্ধ ক'রে দিতাম, যেখানে মানুষকে বিনামূল্যে ভোজন করানো হয়। একমাত্র পঙ্গু অন্ধ ইত্যাদি অক্ষম ব্যক্তি এবং যিনি 'যথার্থ ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে শুধু পরকে জ্ঞানদানের ব্রত গ্রহণ করেছেন, এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেও বিনা শ্রমে অন্নগ্রহণের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। ক্ষুধার্তকে ও

অন্নহীনকে কাজ দাও যাতে সে অন্ন উপার্জন করতে পারে—এই হলো গান্ধী-নীতি। জগতে প্রত্যেক জড়-কণিকা এবং প্রাণকোষ অবিরাম কাজ করছে। কোন মানুষ যদি শ্রমহীন হয়, তবে সে এই নিখিলব্যাপ্ত কাজের ছন্দ থেকেই নিজেকে বিচ্যুত করে, এবং সে বিচ্যুতি সমগ্র মানবসমাজেরই ক্ষতি। তাই গান্ধীজী সমগ্র মানবসমাজের জীবনকেই সমানশ্রমে সুন্দর ক'রে রাখবার একটা উপায় চিন্তা করেছিলেন। গান্ধীজীর এই চিন্তা থেকেই আবির্ভূত হয়েছে 'চরকা'।

চরকা'কে গান্ধীজী বলেছিলেন প্রকৃত স্বরাজলাভের উপায়। অনেকেই তাঁর এই উক্তির অর্থ বুঝতে পারেননি এবং আজও বুঝতে পারেন না। কারণ, কায়িক শ্রম এবং সমানশ্রম ব্যতিরেকে ব্যক্তি ও সমাজের মন যে মানবিক সাম্য ও ঐক্যের বোধ হারিয়ে ফেলে, এই অতি-বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্যটিকে তাঁরা ধরতে পারেন নি। ভারতের কয়েক কোটি শ্রমহীন ও জীবিকাহীন মানুষের জীবনে চরকা একটা আর্থিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে, অর্থাৎ যারা কিছুই উপার্জন করতে পারছে না, তারা কয়েকটা পয়সা উপার্জন করতে পারে। কিন্তু এটাই চরকার একমাত্র সার্থকতা নয়, তাৎপর্যও নয়। চরকাকে মাত্র একটা ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে গান্ধীজী মনে করেন না। চরকার লক্ষ্য হলো, মানুষে-মানুষে সহযোগিতা, সহকর্মিতা ও ঐক্যের জাগৃতি।

> "চল্লিশ কোটি নরনারীর সকলে যদি চরকা কাটে তবে লক্ষ লক্ষ লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদি নির্মিত হতে পারবে। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে, এটাই চরকা সম্বন্ধে বড় কথা নয়। চরকাকে অবলম্বন করে চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে কর্ম-প্রয়াস জাগ্রত হবে, তারই মূল্য সবচেয়ে বেশী।" প্রার্থনা-সভার ভাষণ—১৩।১২।৪৭)

দেখা যাচ্ছে যে চরকার বাণী হলো, সমাজের মানুষে-মানুষে সহযোগিতা সাম্য এবং ঐক্যবোধ জাগ্রত করার বাণী। গান্ধীজী বলেছেন, শিক্ষিত সমাজের কাছে আমি চরকাকে একটা আর্থিক উপার্জনের যন্ত্ররূপে উপস্থিত করছি না। শিক্ষিত সমাজ চরকার আত্মিক (spiritual) তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করুক্, এই ছিল গান্ধীজীর কথা। দরিদ্রের হাতে চরকা হলো আর্থিক উপার্জনের যন্ত্র, কিন্তু জওহরলালের হাতে চরকা হলো রেভল্যুশন বা বিপ্লব—গান্ধীজীর এই উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারলে চরকার সম্যক্ তাৎপর্য বুঝা যায়।

ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিলাভের পন্থা হিসাবেও চরকাকে গ্রহণ করবার কথা গান্ধীজী বলেছিলেন। গান্ধীজীর এই উক্তির অর্থ অনেকে বুঝতে পারেননি। যাঁরা মনে করেন যে, অহিংস সংগ্রামের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর নয়, তাঁদের পক্ষে চরকার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে, ভারতের অহিংস গণশক্তিকেই জাগ্রত ক'রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে হবে। তাই ভারতের গণ-সাধারণের হাতে তিনি দিয়েছিলেন চরকা। চরকা-শ্রম মধুপতঙ্গের পরিশ্রমের মতই নির্দোষ ও অহিংস, কারও ক্ষতি না ক'রে শুধু সৃষ্টি ক'রে। চরকা ভারতের কোটি কোটি জীবিকাহীনকে একটা অর্থনৈতিক যোগ্যতা দান করে, অর্থাৎ জীবিকাহীন বা কর্মহীন ব্যক্তি চরকার সাহায্যে কিছুটা আর্থিক আত্ম-নির্ভরতা লাভ করে। চরকা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের বোধ জাগ্রত করে। চরকা ভারতীয় শ্রমহীন মানুষকে শ্রমের সুযোগ দিয়ে তার অবনত আত্মমর্যাদা-বোধকে উন্নত করে। শিক্ষিত মানুষ চরকার ভেতর দিয়ে তার দেশের কোটি কোটি গরীবের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের যোগ লাভ করে। সুতরাং এ হেন চরকার সাহায্যে ভারতে যে অহিংস গণশক্তি জাগ্রত করবে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীকে বৈদেশিক শাসক দমন করতে পারবে না।—গান্ধীজী সমস্ত বিষয়টিকে এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। ভারতের অহিংস গণশক্তিকে উদ্বোধিত করবার উপায় হিসাবে চরকাকে তিনি অপরিহার্য মনে করেছিলেন। রাজনৈতিক মুক্তির 'অস্ত্র' হিসাবে চরকার এই হলো তাৎপর্য।

অনেকে ভুল ধারণা করেন যে, গান্ধীজী বুঝি চরকাকেই ব্যক্তির একমাত্র জীবিকা হিসাবে গ্রহণের কথা বলেছেন। এঁরা চরকার অর্থনৈতিক তাৎপর্য-টুকুও বুঝতে পারেননি। অন্য কোন জীবিকাকর্ম ক'রেও চরকা চালাতে হবে। চাষী কামার কুমোর কেরানী দোকানী, সকলের হাতেই চরকা থাকবে। যে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজই পাচ্ছে না এমন ব্যক্তির কাছে চরকা হলো সব চেয়ে বড় অর্থনৈতিক বন্ধু। যে ব্যক্তির সময় কর্মহীন আলস্যে নষ্ট হচ্ছে, সেই ব্যক্তি যদি চরকা ধরে তবে তার জীবনের কর্মহীন মুহূর্তগুলি সৃষ্টিপ্রবণ হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তির কাছে চরকা হলো মনেরও বন্ধু।

গান্ধীজী বলেন—খাদিকে শুধু জীবিকা-অর্জনের একটা উপায় বলে মনে করলে ভুল হবে। খাদিকে যদি একটা শিল্প (Industry) মনে করা হয়, তবে

প্রচলিত ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে প্রচুর খাদি উৎপাদন করাই উচিত। একটা সহরের কাপড়েব কলে হাজাব হাজাব লোক জীবিকা অর্জন কবে, এবং খাদি কোটি কোটি টাকা হাজার হাজার গ্রামেব মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। শিল্প হিসাবে কাপড়েব কলে এবং চবকায় এই হলো একমাত্র পার্থক্য। কিন্তু এটাই খাদির একমাত্র বা প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব নয়। খাদিব আদর্শগত প্রধান লক্ষ্য হলো :

> "ভাবতেব পল্লীজীবনেব অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং তারই ভিত্তব দিয়ে জনসাধাবণেব মধ্যে প্রকৃত শক্তিব উদ্বোধন, যে শক্তি সত্য সত্যই স্ববাজ আনতে পাববে।"*

* " . as a means per excellence, for the resuscitation of villages, and there through the generation of real strength among the masses—the strength that will ipso facto bring swaraj "

শ্রেণীতত্ত্বের বিচার

পশ্চিমের এক শ্রেণীর অর্থনীতিজ্ঞ দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিকের চিন্তা থেকে উদ্ভূত সোস্যালিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌ম্ নামে যে মতবাদ বর্তমান যুগে সারা পৃথিবীতেই প্রচারিত হতে দেখা গেছে, সে মতবাদের মধ্যে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' নামে একটা কথার প্রাধান্য দেখা যায়। সমাজে শোষক এবং শোষিত নামে দু'টি শ্রেণীর অস্তিত্ব এঁরা লক্ষ্য করেছেন। গরীবকে শোষণ করেই ধনিকের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। অন্যভাবে বলা যায়, শ্রমিককে শোষণ ক'রে, অর্থাৎ শ্রমিককে তার শ্রমের যথার্থ মূল্য হতে বঞ্চিত ক'রে, শ্রমের মাত্র আংশিক মূল্য দিয়ে অল্পসংখ্যক লোক সম্পদ-উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলিকে নিজের দখলে রেখে চালাচ্ছে বলেই একটা গরীব শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা সংখ্যায় বৃহত্তম। উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী। শোষকেরা সংখ্যায় অল্প, এবং শোষিতেরাই সংখ্যায় সমধিক। সুতরাং, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই এই বিরোধের সমাধান চাই, নইলে সমাজের অধিকসংখ্যকের স্বার্থ দলিত ও বিনষ্ট হতেই থাকবে।

গান্ধীজীও দেখেছেন, সমাজে এই রকমের শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে, এক শ্রেণী আর শ্রেণীকে শোষণ করছে। শ্রেণীগত শোষণের প্রকোপে সমাজ-জনতার বৃহত্তরের জীবন আর্থিক ক্লেশ ও অভাবে বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থ অপর শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী হয়ে রয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছেন, এই বিরোধের অবসান হোক্।

কিন্তু কোন্ উপায়ে? এই পন্থার ক্ষেত্রেই এসে গান্ধীজীর অভিমত এবং সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের অভিমতে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে পার্থক্য একেবারে মূলগত পার্থক্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারের ব্যাপারে ধনিকে ও শ্রমিকের মধ্যে যে বিরোধ বিদ্যমান, সেই বিরোধকেই বস্তুতঃ সক্রিয় বিরোধ অর্থাৎ শ্রেণীযুদ্ধে (class-war) পরিণত ক'রে শোষক শ্রেণীকেই উচ্ছেদ করতে হবে—সোস্যালিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌মে এই 'বৈপ্লবিক' পন্থাই একমাত্র পন্থা বলে ঘোষিত হয়েছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য।

গান্ধীজীর লক্ষ্য শ্রেণীহীন' সমাজের প্রতিষ্ঠা নয়, শ্রেণীশোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন—

> "সমাজের শ্রেণীবিভাগ থাকবেই, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা অবস্থান পরস্পরের সমান্তরাল হবে, পরস্পরের সম্মুখে প্রলম্বরূপে নয়।"*

যে জ্যামিতিক তত্ত্বের উপমা দিয়ে গান্ধীজী তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন, তাতে বক্তব্যের অর্থ প্রাঞ্জলভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি চান, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকবে যাতে এক শ্রেণীর স্বার্থ, অপর শ্রেণীর স্বার্থের বাধা হয়ে উঠতে না পারে। পরস্পরের সম্মুখে প্রলম্বরূপে অর্থাৎ প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান বাধার রূপ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীগুলির অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের কর্ম, অধিকার, লক্ষ্য ও স্বার্থ হবে পরস্পরের সমান্তরাল, যেখানে কারও সঙ্গে কারও সংঘর্ষের অবকাশ অথবা প্রয়োজনও থাকবে না।

পশ্চিমের সাম্যবাদীরা সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের রূপ যতটা সরল ক'রে বুঝে নিয়েছেন, বাস্তবে শ্রেণীবিন্যাসের রূপ ততটা সরল কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। শোষক ও শোষিত, মানবসমাজ এই রকম সুস্পষ্ট দু'টি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে আছে কি? বরং দেখা যায়, এক ব্যক্তি হয়তো এক ক্ষেত্রে অপরের দ্বারা শোষিত, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে সে-ও অপরের শোষক। শোষক-শ্রেণী নামে এমন কোন সম্পূর্ণ পৃথক্ ও আস্ত একটা শ্রেণীকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, যাকে উচ্ছেদ করলেই সমাজ থেকে শোষকের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হতে পারে। শোষণব্যবস্থাটাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এক স্তর হতে ভিন্নতর স্তরে এবং স্তরক্রমে বিস্তৃত ও বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। গান্ধীজী মনে করেন, এই শোষণব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করতে পারা যায়, অথচ তার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ, শোষক শ্রেণীর শোষণক্ষমতাটুকুর উচ্ছেদ প্রয়োজন। ধনিকের পুঁজি সম্পদ ও ক্যাপিটালকে শোষণযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে না দেওয়া। ক্যাপিটাল থাকবে, অথচ ক্যাপিটালিজ্‌ম্ থাকবে না। ইণ্ডাস্ট্রি চাই, কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ চাই না। ধনিক তাঁর সম্পদের অছি বা ট্রাষ্টিরূপে থাকবেন, এবং সে সম্পদকে একমাত্র সাধারণের কল্যাণের জন্যই নিযুক্ত ও পরিচালিত করবার অধিকার ধনিকের থাকবে, 'লাভ' অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ পুঞ্জীভূত করার জন্য নয়।

* "Class divisions there will be, but this will then be horizontal, not vertical".

সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব (class struggle) আছে, এই বাস্তব সত্যটি গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু তিনি চান না যে, এই দ্বন্দ্বকেই তীব্রতর ক'রে তুলে নিয়ে একটা শ্রেণীযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ক্যাপিটালিজ্‌মের উচ্ছেদ সাধন করা হোক, কারণ সে পন্থায় ক্যাপিটালিজ্‌মের স্থায়ী উচ্ছেদ হবে কি না সন্দেহ। তিনি মনে করেন, শ্রেণীযুদ্ধের পথে না গিয়েও ক্যাপিটালিজ্‌মের উচ্ছেদ সম্ভব। গান্ধীজীর যুক্তি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিম্নোক্ত পরিচয়টুকু জানা থাকলে এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধি করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তিনি কেন পাশ্চাত্ত্যের কম্যুনিজ্‌ম্ এবং সোস্যালিজ্‌ম্‌কে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য দূরীভূত করার একমাত্র পন্থা অথবা শ্রেষ্ঠ পন্থা ব'লে মনে করেন না।

> "পশ্চিমের সোস্যালিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌ম্ এমন কতগুলি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের ধারণা থেকে মূলতঃ পৃথক্। কম্যুনিজ্‌ম্ ও সোস্যালিজ্‌ম্ বিশ্বাস করে যে, মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর; স্বার্থপরতা মানুষের স্বভাবে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। আমি এ ধারণা সমর্থন করি না। আমি জানি যে, পশুতে ও মানুষে স্বভাবের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। মানুষের স্বভাবে এবং পশুর স্বভাবে নিহিত প্রবৃত্তির আবেগে কতগুলি মিল থাকা সত্ত্বেও, মানুষের স্বভাবে আবার এই স্বতন্ত্র একটা শক্তি আছে যে, সে তার প্রবৃত্তির উর্ধ্বে নিজেকে টেনে তুলতে পারে।"

শোষক ধনিক ব্যক্তিরও স্বভাবের ভিতরটা মনুষত্বহীন নয়। সুতরাং তার আচরণের পরিবর্তন অসম্ভব নয়, যদি তার ভিতরের স্বার্থহীন ও হিংসাহীন মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করতে পারা যায়। মানুষের অন্তরগত স্বভাবের মহত্ত্বে গান্ধীজী বিশ্বাসী ব'লেই তিনি সহিংস পন্থার অর্থাৎ জোর ক'রে শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদের সমর্থক হতে পারেননি। তা ছাড়া, জোরের পন্থায় কোন শ্রেণীকে উচ্ছেদ করলে, পরিণামে জোরদারেরাই একটা ক্ষমতাবান শ্রেণীতে পরিণত হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কাও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত।

শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য :

(ক) ভারতের আন্তরিক প্রকৃতির সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব খাপ খায় না।*

* 'Class-war is foreign to the essential genius of India'.

(খ) ভূস্বামী এবং ধনিক পুঁজিওয়ালাদের লুপ্ত ক'রে দেওয়াই প্রয়োজন নয়; প্রয়োজন হলো লোকসাধারণের সঙ্গে বর্তমানে এদের যে সম্পর্করীতি রয়েছে সেই সম্পর্করীতির পরিবর্তন ক'রে একটা সুস্থতর ও শুদ্ধতর সম্পর্করীতি স্থাপন করা।

(গ) শোষণব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য পাশ্চাত্ত্য হতে যে সকল মতবাদ উদ্ভূত হয়েছে তার সবই হিংসাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই কারণে আমার আপত্তি। আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা উচ্চ-নীচ এবং ধনিক-শ্রমিকের পার্থক্য সমীকরণের একটা চেষ্টা নয় কি? সুতরাং আমরা যদি বৈজ্ঞানিক আগ্রহ নিয়ে প্রাচ্যের ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করি, তবে তার ভেতর থেকে এমন কম্যুনিজ্‌ম্ ও সোস্যালিজ্‌মের সন্ধান পাওয়া যাবে যা বর্তমানের প্রচলিত ঐ দুটি মতবাদ থেকে বেশি উন্নত, যথার্থ ও সত্য, এবং যা বর্তমান পৃথিবীর পক্ষে স্বপ্নেও ধারণা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার জন্য পশ্চিমের সোস্যালিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌ম্ যে পন্থার সন্ধান দিচ্ছে তার চেয়ে ভাল পন্থা আর কিছু হতে পারে না—এরূপ মনে করা খুবই ভুল।

ধনিকের ধনগত পুঁজি যেমন তার 'ক্যাপিটাল', তেমনি শ্রমশক্তিও শ্রমিকের ক্যাপিটাল। গান্ধীজীর এই যুক্তিটি স্মরণে রাখলে তাঁর সমগ্র বক্তব্য খুবই সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেন—ধনিকের ক্যাপিটালে (আর্থিক পুঁজি) এবং শ্রমিকের ক্যাপিটালে (শ্রম) সহযোগিতা সম্ভবপর। উভয় শ্রেণীই সম্পদ সৃষ্টির উদ্যোগে সহকর্মী হবে, উভয়ের মধ্যে প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক থাকবে না।

নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিজের উপভোগের জন্য আটক ক'রে রাখাকে গান্ধীজী চৌরকর্ম ব'লে মনে করেন। এবিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে পশ্চিমের কম্যুনিষ্টের সাম্যতত্ত্বের যুক্তিতেও অনেকখানি মিল আছে, যাঁরা বলেন—সম্পত্তি হলো চৌর্য ('Property is theft')। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ শুধু আটক ক'রে রাখা নয়, উপভোগ করাও চৌর্য। এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ বলতে এই বোঝায় যে, সমাজের লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্যক্তি যে-পরিমাণ বৈষয়িক সুখসম্পদ উপভোগ করছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণের সুখসম্পদ। সম্পদ সঞ্চয় করাকেও গান্ধীজী পাপ ব'লে মনে করেন।* তিনি বলেন—ভারতের কোটি কোটি মানুষ দিনে একবেলা মাত্র খেতে পায় এবং সেই ভোজনও হলো, মাত্র একটি চাপাটির

* '.....it is a sin to amass wealth'

সঙ্গে এক ছিঁটা নুন। যতক্ষণ না দেশের এরা ভাল ক'রে খেতে ও পরতে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল খাওয়া-পরার কোন অধিকার আমার ও আপনার নেই।

ভারতের ধর্মগ্রন্থ নামে পরিচিত ভাগবত পুরাণ বিস্ময়কর স্পষ্টতার সঙ্গেই অর্থনৈতিক ভোগসাম্যের এই তত্ত্ব ঘোষণা করেছেন:

যাবদ্ ভ্রিয়েতে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

[৭ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায় ৮ম শ্লোক]

—যে পরিমিত ধনের দ্বারা উদর পোষণ হতে পারে, সেই পরিমিত ধনেই প্রাণীদের অধিকার। যে ব্যক্তি তার অধিক বিত্ত সংগ্রহ করে সে তস্কর, অতএব সে দণ্ডনীয়।

গান্ধীজীরও উক্তির মধ্যে সমাজে সম্পদের বণ্টনব্যবস্থা (Distribution) সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খুবই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সমবণ্টন সাধন করবার পন্থাটিও অহিংস হওয়া চাই। সেই দিক থেকে, তিনি মনে করেন ধনিকের পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত-সম্পদ এবং অতিরিক্ত-সম্পদ উপভোগের রীতি অথবা দাবী বর্জিত হলে অহিংস পন্থায় ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এবং সেই সাম্যই হবে যথার্থ ও স্থায়ী সাম্য। তিনি জাপানের সামুরাই নামে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সামুরাই শ্রেণী স্বেচ্ছায় তাদের ধনিকত্ব বর্জন করেছিল। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় ক'রে ধনিকে পরিণত হন, তিনি মর‍্যাল মানুষ অর্থাৎ নীতির মানুষ হিসাবে অতিরিক্ত কোন শক্তি লাভ করেন না। বরং তাঁর আর্থিক ধনিকতা তাঁর চরিত্রের মর‍্যাল শক্তিকে দীনতর করে, গান্ধীজীর এই ধারণা। প্রাচীন রোম তার প্রচুর বৈষয়িক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও অধঃপতনের দুর্ভাগ্য বরণ করেছিল। অতিরিক্ত বৈষয়িক ঐশ্বর্য রোমকে নৈতিক শক্তিতে উন্নত করেনি। ব্যক্তি সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করে তার নৈতিক শক্তি, বৈষয়িক শক্তি নয়। এবং নৈতিক শক্তি না থাকলে বৈষয়িক শক্তি অর্থাৎ প্রচুর খাদ্য-বস্ত্র-অস্ত্র এবং বিদ্যার বলও কোন 'শক্তি' নয়; প্রাচীন ভারতের যাদব বংশ যখন ধ্বংস লাভ করেছিল, তখন তারা বৈষয়িক ঐশ্বর্যে খুবই উন্নত ছিল। সমাজে কয়েকজন অতিরিক্ত বিত্তশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সমাজের নৈতিক শক্তির পরিচয় প্রকাশ করে না। রকফেলার এবং কার্ণেগী তাঁদের সম্পত্তির অনেক অংশ জনকল্যাণের জন্য দান করেছেন। এ দান ভালই, কিন্তু এই দুই ধনী দাতা হয়েছিলেন বলেই

এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, তাঁদের বিত্তশালিতাই তাঁদের পক্ষে নৈতিক শক্তি লাভের সহায়ক হয়েছিল। দান করার যে মন তাঁরা পেয়েছিলেন, সেটা অন্য কারণে হয়েছিল। প্রচুর সম্পদ তাঁরা সঞ্চিত করতে পেরেছিলেন বলেই যে তাঁরা দান করবার মত জনকল্যাণধর্মী নৈতিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন, একথা সত্য নয়। গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা থেকেই আরও স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় যে, তিনি ধনিক শ্রেণীকে সমাজে কিভাবে রাখতে চান। ধনিকেরা দাতা হবে এবং দয়ালু হবে এই আশাবাদের ওপর তিনি তাঁর ধারণাকে দাঁড় করাননি। ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হওয়াকেই তিনি অন্যায় এবং সমাজধর্মবিরোধী ব'লে মনে করেছেন। ধনিকের মনের সম্ভাব্য দয়ালুতার ওপর নির্ভর ক'রে সমাজে ধনিক শ্রেণীকে অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হবার সুযোগ দিতে তিনি প্রস্তুত নন। তিনি জাপানের সামুরাই শ্রেণীর আচরণকেই যথার্থ ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক বলে মনে করেছেন। দান করার অধিকার নিয়ে নয়, মাত্র অছি হয়ে থাকবার অধিকার নিয়ে ধনিকসমাজ আর্থিক সম্পদের উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালিত কববে। সম্পদগুলির অধিকারী হবে সমাজ, ধনিক হবে মাত্র তার ন্যাসরক্ষক ও পরিচালক। গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়, তিনি 'ধনিক' কথাটিরই এক নূতন সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। ধনিক এবং ধনিকতা, উভয়েরই রূপান্তরের প্রস্তাব। বলা যায়, গান্ধীজী বস্তুতঃ 'ধনিক' নামক অর্থনৈতিক একটি শ্রেণীকেই সমাজোপেত ('Socialised') করতে চেয়েছেন। ধনিক শ্রেণীকে সমাজের ওপরে নয়, সমাজ স্বার্থেব অধীনে রাখবার ব্যবস্থা।

ব্যক্তির পক্ষে 'অপ্রতিগ্রহ' (Non Possession) নীতিকেই সমাজে ধন-সাম্য প্রবর্তনের নীতি ব'লে গান্ধীজী মনে করেন। এবিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত খুবই স্পষ্ট এবং দৃঢ়। অনেকে জীবজগতের রীতিনীতির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই কথা বলে থাকেন যে, সঞ্চয় করা হলো স্বাভাবিক জীববৃত্তি। কীটপতঙ্গ ও পক্ষীর মধ্যেও ভবিষ্যতের জন্য আহার্য সঞ্চয়ের ব্যাপার দেখা যায়। কিন্তু এ তুলনা ভ্রমাত্মক। জীবজগতের অনেকের মধ্যেও ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক উপভোগের জন্যই প্রত্যেকে সমানশ্রমে আহার্য সঞ্চয় করছে, এ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তা ছাড়া, জীবজগতের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা অর্থাৎ মানুষকে সাধারণ জীবের পর্যায়ভুক্ত করা নিশ্চয় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচায়ক নয়। পশু যা পারে না, মানুষ তাই পারে। মানুষের মধ্যে

'অপ্রতিগ্রহ'কে যদি স্বভাবজ প্রবৃত্তি বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকে, তাতেও মূল বক্তব্যের কোন ব্যতিক্রম হয় না। অপ্রতিগ্রহকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটা অসম্ভব নয়; তার শত শত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে।

সুতরাং ধনিকের পক্ষে সমাজে সম্পদের অছি হয়ে থাকা অবাস্তব এবং অসম্ভব নয়। মাত্র নিজের অধিকারে রাখলেই সম্পদকে যথার্থ উপভোগ করা যায়, এটা সত্য নয়। অছিরূপেও সম্পদকে এক প্রকারের 'উপভোগ' করা যায়, এবং তাতে যে আনন্দ আছে সেটা ব্যক্তিগত অধিকারজনিত আনন্দের চেয়ে কম নয়। একটি পরিবারের মধ্যে পিতা নামক প্রধান ব্যক্তি বহু চিন্তা ও পরিশ্রম ক'রে যে সম্পদ উপার্জন করেন, সে সম্পদকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অধিকাররূপে সমর্পণ ক'রে দেন। এটা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে সমাজের সকলের অধিকারেও সম্পদ সমর্পণ ক'রে দেওয়া ব্যক্তির পক্ষেও স্বাভাবিক। পরিবার নামক ক্ষুদ্র সমাজের ওপর ব্যক্তির যে প্রীতি ও মমতা, সেটা জাতি নামক বৃহত্তর সমাজের ওপরেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সমগ্র পরিবারের উপভোগের জন্য পিতা নামক এক ব্যক্তি যে মন ও গুণের দ্বারা সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ ক'রে থাকেন, সেটা তাঁর অতিব্যক্তিকতা, অর্থাৎ নিছক ব্যক্তি স্বার্থবাদের এক ধাপ উপরের বস্তু। এই অতিব্যক্তিকতা সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও কি প্রসারিত করা যায় না? গান্ধীজীর অভিমত হলো—করা যায়।

ধনিক ব্যক্তি অথবা ধনিক শ্রেণী স্বেচ্ছায় সম্পদের অধিকার সমাজকে ছেড়ে দেবেন, নিজের উপভোগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত ক'রে রাখবেন না, এবং সমাজের পক্ষ থেকেই অছিরূপে সম্পদের উৎপাদনকার্য পরিচালনা করবেন তাঁর দক্ষতা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শক্তি দিয়ে। এ হ'লে সমাজে ধনবৈষম্যের অভিশাপ থাকে না। কিন্তু যদি ধনিকেরা 'স্বেচ্ছায়' এই পথ গ্রহণ না করেন, তবে? তবে কি শুধু এই আশা নিয়েই সমাজ বসে থাকবে, কবে কোন্ পুণ্যলগ্নে ধনিকেরা নিজের মনের শুভসঙ্কল্পজাত প্রেরণার বশে সম্পদের ব্যক্তিগত অধিকার বর্জন করবেন? এর জন্য কি শ্রমিক অথবা বিত্তাধিকারবঞ্চিত জনসাধারণের কিছু করণীয় নেই?

অবশ্যই আছে এবং সে কর্তব্যের নৈতিক সূত্রটিও গান্ধীজী দিয়েছেন। সমাজের শ্রেণীগত শোষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য এবং সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্তে সমাজাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শোষিতকে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে, যদি অন্য কোন পন্থায় ধনিকশ্রেণী সম্পদের মাত্র অছি-অধিকার

(trust ownership) গ্রহণে স্বীকৃত না হন। ধনিকের হৃদয়ের পরিবর্তন যদি না হয়, তবে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এবং সে পরিবর্তন ঘটাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো, অহিংস-অসহযোগ ও সবিনয় প্রতিরোধ।* সহিংস পন্থায় ধনিকের যে উচ্ছেদ হতে পারে, তাতে ধনিকের হৃদয়-পরিবর্তন হতে পারে না। তাতে ধনিক-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ না হয়ে শুধু ধনিকতার অধিকার থেকেই তারা বঞ্চিত হবে। এটাকে যথার্থ এবং স্থায়ী পবিবর্তন বলা যায় না। তা ছাড়া, যারা সহিংস পন্থায় ধনিককে উচ্ছেদ করবে, তাদের মানসিক পরিবর্তনও যে শেষ পর্যন্ত অন্য প্রকারের সহিংস রূপ লাভ ক'রে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, এই আশঙ্কাও যথেষ্ট বাস্তবতাসম্মত।

---

* 'In trying to find out the solution of this riddle I have lighted on non-violent non-co-operation and civil disobedience as the right and infallible means.'

আদর্শের সমগ্রতা

মাত্রা আছে কিন্তু গণ্ডী নেই, মানুষের মনের সংস্কারগুলির এরকম রূপ হতে পারে। দুই তটের মধ্যে সীমায়িত অথচ অবাধগতি, প্রবহমাণ নদীর রূপের মতই অহিংস মনের সংস্কারগুলির রূপ। এই মন স্বেচ্ছায় কতগুলি সংযম ও মাত্রা স্বীকার ক'রে নেয়, কিন্তু তার গতি উদার ও অবাধ। জাতি ও জাতীয়তা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ও স্বদেশী ইত্যাদি বিষয়ের গান্ধীজী যেসব সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, তার মধ্যে মাত্রা আছে কিন্তু গণ্ডীবদ্ধতা নেই। গান্ধীজীর কথিত জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার মধ্যে ভেদরেখা নেই, উভয়ই একই প্রবাহের নীর। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেটা তাঁর মনের বন্ধন হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানের ও ভবিষ্যতের অভিনবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর ঐতিহ্যপ্রিয়তা নূতনকে গ্রহণ করার আগ্রহ খণ্ডিত করে না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর জীবনের বিশেষ সংযোগ তাঁর ভিন্নধর্মপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। দেশের সংস্কৃতির ওপর গভীর মমতা সত্ত্বেও তিনি বিদেশীয় সংস্কৃতি হতে সকল শুভ সৎ ও প্রয়োজনীয়কে আহরণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। সমগ্র মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যে এবং সকল প্রাণের অখণ্ডতায় যিনি বিশ্বাসী, তাঁর 'জাতীয়' দৃষ্টি রুচি ও সংস্কারের গতি বস্তুতঃ বিশ্বমুখী হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক।

তিনি তাঁর স্বদেশভূমি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর, বিশ্বের সকল জাতির স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক। যদি ইংলণ্ড ও ইংরাজ জাতিকে ধ্বংস না করা ছাড়া ভারতের পক্ষে স্বাধীন হবার আর কোন উপায় না থাকে, তবে ভারতের স্বাধীনতা চাই না—এই কথাও তিনি বলেছেন। আবার, অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে ভারত ও ভারতীয় জাতি যদি বিশ্ববক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যায়, তাও শ্রেয়। কারণ, ভারত এভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে অহিংসারই প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ক'রে যাবে, যেটা সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। তাঁর মতে পেট্রিয়টিজম্ বা দেশপ্রেমের অর্থ হলো—ব্যক্তি পরিবারের জন্য, পরিবার পল্লীর জন্য, পল্লী

জিলার জন্য, জিলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ দেশের জন্য আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত থাকবে। তেমনি একটি জাতিকেও স্বাধীন হতে হবে এই কারণে যে, সে যেন প্রয়োজন হলে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ব্যক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর প্রত্যেকটি সমাজায়তন তার বৃহত্তরের জন্য আত্মত্যাগ করবে, দেশপ্রেমের এই ক্রমোর্ধ্বমুখী ও গতিশীল রূপ তিনি কল্পনা করেছেন।

> "সুতরাং, আমার ন্যাশালিজ্‌মের আদর্শ হলো—মানুষ জাতিকে বাঁচাবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমার জাতির পক্ষে যেন প্রাণ দেবার সুযোগ ও অধিকার থাকে, এবং সেই জন্যই চাই আমার জাতির স্বাধীনতা। এর মধ্যে পরজাতিবিদ্বেষের কোন স্থান নেই। এই আমার ন্যাশালিজ্‌ম্ বা জাতীয়তা।"

গান্ধীজী জাতীয়তার যে আদর্শ বর্ণনা করেছেন, সে আদর্শ আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত ও প্রচলিত জাতীয়তার সকল আদর্শকে উদারতায় ছাপিয়ে গেছে। জাতীয়তার এই আদর্শ আন্তর্জাতিকতারই চরম আদর্শ।

ডেমোক্রেসির যে আদর্শ পাশ্চাত্ত্য মনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তার মধ্যে যে একটা বড় ত্রুটি আছে, গান্ধীজী সেটা লক্ষ্য করেছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং গণ-তন্ত্রকে সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখা যায়, পশ্চিমের মনে এই ধারণা আছে, এবং এই ধারণা অনুসারে কাজও হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন, অহিংসাই হলো যথার্থ গণতন্ত্রের প্রাণ। অহিংস স্বরাজই হলো প্রকৃত গণতন্ত্র। 'অহিংস পদ্ধতিতে যে স্বরাজ আসবে, সে স্বরাজ সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা প্রাপ্ত স্বরাজ হতে রূপে-গুণে পৃথক্'। গণতন্ত্র উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বস্তু নয়, ভেতর থেকে উদ্ভূত হবার বস্তু। ডেমোক্রেসি যেন বিশ্বজনীন হতে পারে তারই জন্য গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংস পদ্ধতিতে ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজী মনে করেন, ফরাসী-বিপ্লবে এবং রুশ-বিপ্লবে হিংসা থাকায় যথার্থ গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঐ দুই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বের সকল জাতি একটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-ফেডারেশনের শাসনাধীনে চালিত হবে, আন্তর্জাতিকতার এই আদর্শ যাতে সফল হতে পারে এবং ডেমোক্রেসি যাতে যথার্থ ডেমোক্রেসি হতে পারে, তারই জন্য গান্ধীজী অহিংসাকেই ডেমোক্রেসির ভিত্তি রূপে দেখতে চেয়েছেন।

ধর্ম (Religion) সম্বন্ধে গান্ধীজী যে ধারণার অধিকারী হয়েছিলেন, সে ধারণার

মধ্যে কোন খণ্ডতার ও গণ্ডীর প্রশ্রয় ছিল না। তাঁর ধার্মিকতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, উভয়ের মধ্যেই 'হিন্দুত্ব' ছিল, এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর মনে এরকম কোন অভিমান ছিল না যে, হিন্দু-ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি শুধু মনে করতেন যে, তাঁর পক্ষে হিন্দু-ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি হিন্দু পরিবারে অর্থাৎ হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মলাভ করেছেন।

পরধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাবের কথা অনেক ধার্মিক মনীষীই প্রচার করেছেন। পরধর্মসহিষ্ণুতা নামে একটা কথা আছে; অর্থাৎ অপরের ধর্মকে সহ্য করার আদর্শ (Tolerance)। আরও এক ধরণের উদারতা আছে, পরের ধর্মকেও সত্য ব'লে মনে করা। কিন্তু এই দুই উদারতাও যে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সেটা লক্ষ্য করা যায়। এবং এই উদারতার কথা অনেক ধর্মের শাস্ত্রে থাকা সত্ত্বেও ধর্মের নামে মানুষ হানাহানি করছে। পরের ধর্ম সম্বন্ধে এধরণের তথাকথিত ডেমোক্রেটিক মনোভাবের মধ্যে একটা গূঢ় ভেদবাদ লুকিয়ে রয়েছে। পরধর্ম সম্পর্কে অহিংস মনোভাবের যে আদর্শ গান্ধীজী ঘোষণা করেছেন, একমাত্র সেই আদর্শই মানবজাতির ভবিষ্যৎকে ভেদ ও অনৈক্যের অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারে। এবিষয়ে গান্ধীজীর নীতির সঙ্গে একমাত্র ভারত ইতিহাসের আর এক অহিংস মহাপুরুষের নীতির সাদৃশ্য দেখা যায়, প্রিয়দর্শী মহারাজা অশোকের নীতি।

অশোকের একটি শিলাশাসনে (দ্বাদশ শিলাশাসন, সাহবাজগড়্হি) এই অনুজ্ঞা মানবজাতির উদ্দেশ্যে তিনি উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন :

> —পূজেতবিয় ব চু পরপ্রষণ্ড তেন তেন অকরেন। এবং করতং অত-প্রষণ্ড বঢেতি পরপ্রষণ্ডস পি চ উপকরোতি। তদ অঞ্ঞথ করমিনো অতপ্রষণ্ড ক্ষণতি পরপ্রষণ্ড চ অপকরোতি।

এর অর্থ, পর ধর্মসম্প্রদায়কে সর্বপ্রকারে শ্রদ্ধা করবে। এতে তোমার নিজেরই ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি হবে, পর-ধর্মসম্প্রদায়েরও উপকার হবে। এর অন্যথা হলে, তোমার নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের ক্ষতি হবে, পরধর্মসম্প্রদায়ের অপকার তো হবেই।

পরের ধর্ম ও সম্প্রদায়কে শুধু সহ্য করা অথবা সত্য ব'লে মনে করা নয়, পরের ধর্মকে পূজেতবিয়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর সর্বপ্রকারে। এবং পরের ধর্মসম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করলে নিজের ধর্মসম্প্রদায় ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়, এই যে অতি বাস্তব একটি সত্য মানবজাতিকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মানুষের ইতিহাস

হতেই অভ্যুদিত এক অহিংস-তত্ত্বজ্ঞানী শিলাবক্ষে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন, সেই সরল ও সত্য নীতিটিকেই আজও পৃথিবীর মানুষ অবাস্তব ব'লে মনে করে, এবং ভুল করে। ধর্ম সম্বন্ধে গান্ধীজী-র কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মের পক্ষে বৈশিষ্ট্য বর্জন না করেও বিশ্বপ্রীতির (Universal Love) অভিমুখী গতি-প্রবণতা লাভের মূলসূত্রগুলি তিনি দিয়ে গেছেন :

(ক) প্রত্যেক ধর্মই কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র, কিন্তু গন্তব্য একই।

(খ) বস্তুতঃ, পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ আছে তত সংখ্যক 'ধর্ম' আছে।

(গ) যে নিজের ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে পরের ধর্মের অন্তরেও প্রবেশ করতে পেরেছে।

(ঘ) সত্য ও সত্যনিষ্ঠার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই।

(ঙ) প্রত্যেক ধর্মই সত্য।

(চ) প্রত্যেক ধর্মেই কতগুলি ভুল আছে।

(ছ) হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যতখানি শ্রদ্ধা, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই আমার ততখানি শ্রদ্ধা।

(জ) ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কাউকে ধর্মান্তরিত করার (conversion) কোন প্রয়োজন মূল্য ও মর্যাদা আছে ব'লে গান্ধীজী মনে করতেন না। হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হোক্, মুসলমান আরও ভাল মুসলমান হোক্, এবং খৃষ্টান আরও ভাল খৃষ্টান হোক্—বিভিন্নধর্মীয় মানবসমাজকে প্রীতিবদ্ধ করার এই সূত্র তিনি দিয়েছেন। আধুনিক ভারতে ধর্মাচরণে একজন খাঁটি হিন্দুর প্রত্যক্ষ উদাহরণ হলো গান্ধীজী স্বয়ং, ধর্মাচরণে একজন খাঁটি মুসলমানকেও আধুনিক ভারত চেনে—সীমান্তের পাঠান খাঁ আবদুল গফর খাঁ। ঈশ্বর বিশ্বাসী হ'লে, অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের কাছে যে আপনজন হয়ে উঠতে পারে, হিন্দু গান্ধী ও মুসলমান বাদ্‌শাহ মিঞা আধুনিক কালে এ সত্যের দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন নামরূপসংজ্ঞা নিয়ে প্রচলিত ধর্মায়তনের মধ্যে নিহিত থেকেও যে দিব্য তত্ত্ব আয়তনের সীমা ছাপিয়ে (transcending) সর্বময় হয়ে রয়েছে, গান্ধীজী সেই দিব্য তত্ত্বকেই একমাত্র ধর্ম ব'লে মনে করেন।

"ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধির জন্য অন্তরের ক্লান্তিহীন আকুলতা।"

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মানুষের ধর্ম', গান্ধীজীর জীবনে সেই ধর্মেরই সার্থক অনুশীলন রূপ লাভ করেছিল। এ ধর্মের ব্যাপ্তি মাত্র হিন্দু বা খৃষ্টানত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নানাবিধ ঐতিহাসিক পরিচয়ের চিহ্ন ধারণ ক'রে এক একটি ধর্মের রূপ বিশিষ্টতা লাভ করেছে, একই দিব্য তত্ত্বের বিভিন্ন রূপগত প্রকাশ, একই প্রাণের কোটি কোটি বিভিন্ন রূপগত প্রকাশের মত। হিন্দুর রূপ নিয়ে গান্ধীজী এই দিব্যধর্মকেই অনুসরণ করেছেন।

এ সাধনায় শাস্ত্র ঐতিহ্য ও প্রথাকে তিনি ঈশ্বরের নীচেই স্থান দিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা নামক প্রথা ধর্মের নামে শত শত বছর ধরে চলে আসছে, কিন্তু তিনি এ প্রথাকে 'অধর্ম' ব'লে মনে করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি, কারণ ঈশ্বরেরই সৃষ্টির মধ্যে যে 'অহিংসা'র সর্বনিয়ামক বিধান তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অস্পৃশ্যতা সেই অহিংসার অন্যথা এবং অপমান মাত্র। বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য ইত্যাদি হিন্দুসমাজে স্বীকৃত কতগুলি প্রথাকেও তিনি একই অহিংসাতত্ত্বের নিরীক্ষায় নীতিহীন (immoral) ব'লে মনে করতেন। পুরাতন বা আধুনিক—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শাস্ত্র, সংস্কার ও লোকাচাব ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে যে ব্যবস্থাকে অহিংসাবিরোধী ব'লে মনে হয়েছে, সেই ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর-বিরোধী বলে মনে করেছেন। যা অহিংসাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাই হলো নীতিহীন।

গান্ধীজী যে 'স্বদেশী'র আদর্শ ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে দেখা যায় যে তথাকথিত ন্যাশনালিজ্‌মের সংকীর্ণতা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় লাভ করতে পারেনি, যদিও স্বদেশী আত্যন্তিক রকমের দেশপ্রীতির আদর্শ। স্বদেশীর মোটামুটি আদর্শ হলো, বৈদেশিক পণ্য বর্জন ক'রে দেশের কুটীরজাত পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করা। বিদেশজাত যে সামগ্রী ব্যবহার করতে থাকলে দেশের কুটীরশিল্প নষ্ট হবে, অথবা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বৃত্তিচ্যুত হয়ে ভিক্ষুকদশা লাভ করবে, বিদেশজাত সেই সব পণ্য বর্জন করা এবং তার পরিবর্তে দেশজাত সামগ্রী (তা যতই খারাপ হোক্, এবং দামের দিক দিয়েও যতই মাগ্যি হোক্) ব্যবহার করাই স্বদেশী। কিন্তু স্বদেশীও একটা কুসংস্কার হয়ে উঠবে, যদি মনে করা হয় যে, যা কিছু বিদেশজাত তাই ব্যবহার না করাই হলো স্বদেশী। গান্ধীজীর স্বদেশীতে এ সংকীর্ণতা নেই। তিনি বিষয়টি আরও পরিষ্কার ক'রে দিয়ে বলেছেন :

> "যদি কোন শিল্প বৈদেশিক মূলধন ও প্রতিভায় পরিচালিত হয়ে, অথচ ভারতীয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে এমনভাবে পণ্য উৎপাদন করে, যার

ফলে দেশের কোটি কোটি লোকের স্বার্থ বৃদ্ধি হবে, তবে সেই পণ্য 'স্বদেশী' পণ্যই হবে।"

গান্ধীজীর এই উক্তি হতে স্বাভাবিক ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দেশীয় মূলধন প্রতিভা ও লোকের দ্বারা পরিচালিত শিল্পও 'স্বদেশী' হবে না, যদি ঐ শিল্পের দ্বারা দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বার্থোন্নতি না হয়। বৈদেশিকের পণ্য-সামগ্রীর বিরুদ্ধে দ্বেষ ও ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য স্বদেশী নয়, এবং নিছক বৈদেশিক পণ্যের বর্জনও স্বদেশী নয়।

গান্ধীজী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মলাভ করে। শুধু তাই নয়, মানুষ তার পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের চরিত্রগত গুণ অথবা দোষ স্বাভাবিকভাবে পেয়ে থাকে, এ ধারণা গান্ধীজীর ছিল। পরিবেশের প্রভাবে চরিত্র গঠিত হয়, এ সত্য গান্ধীজী অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, শিশু তার পূর্বপুরুষের অনুরূপ চরিত্র নিয়েই জীবন আরম্ভ করে। মানুষের সহজাত চরিত্র অথবা স্বভাবের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষ জাতিকেই চারিটি বর্ণে প্রাচীন হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানীরা ভাগ করেছেন—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 'আমি গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি'। গান্ধীজী এই চারিটি বর্ণবিভাগ তথা বর্ণাশ্রমকে 'জন্ম অনুসারে বৃত্তির চারিটি সুষ্ঠু বিভাগ' ব'লে মনে করেন। এর মধ্যে উচ্চ বর্ণ বা নীচ বর্ণ ব'লে কিছু নেই। গান্ধীজীর মতে বর্ণাশ্রম হলো 'কর্তব্যক্ষেত্রের চারিটি বিশুদ্ধ বিভাগ'। শূদ্র বর্ণের মানুষের পক্ষে বৈশ্যের কার্য পালন করবার অধিকার আছে, কিন্তু বৃত্তি হিসাবে নয়, সমাজসেবা হিসাবে। জীবিকানির্বাহের জন্য শূদ্র কায়িক শ্রম ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে গান্ধীজী দেখতে পেয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষের বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষাকে এর দ্বারা সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বর্ণকে নিতান্ত জন্মগত ব্যাপার ব'লে গান্ধীজী মনে করেননি। শুধু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়, গান্ধীজী এ অভিমত সমর্থন করেননি। তিনি শাস্ত্রোক্ত অভিমত অনুসন্ধান ক'রে বুঝেছিলেন :

"বৃত্তি অনুসরণে অক্ষম হলে ব্যক্তি বর্ণচ্যুত হয়। অন্য বর্ণে বিবাহ করলে এবং অন্য বর্ণের সঙ্গে বসে ভোজন করলে বর্ণচ্যুতি বা বর্ণান্তর হয়

না। যদি কেউ কর্মের দ্বারা তাঁর বর্ণোচিত বৃত্তি পালন না করেন, তবে মাত্র ঐ বর্ণে জন্মেছেন বলেই তাঁর বর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না।”

মানুষের এই চারিটি বর্ণবিভাগকেই গান্ধীজী একমাত্র ‘মৌলিক স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়’ (‘fundamental, natural and essential’) সামাজিক বর্ণবিভাগ ব’লে মনে করেছেন। জাত (caste) প্রথা বর্ণাশ্রম নয়। গান্ধীজী বলেন, বিভিন্ন জাতগুলি মূলতঃ হলো বিভিন্ন প্রকারের জীবিকাকর্মব্যবসায়ীর ‘শ্রেণী’ (Guild)। অর্থনীতির দিক দিয়ে এককালে জাত-প্রথার বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব ছিল। কায়িক শ্রমে চালিত বিভিন্ন বৃত্তিগুলি বংশানুক্রমিক হওয়ায় লোকে বৃত্তিতে সহজ দক্ষতা লাভ করতো। জাত অনুসারে বিভিন্ন শ্রমকর্মবৃত্তি নির্দিষ্ট হওয়ায় নানা জাতের প্রতিযোগিতা থেকে এক একটি জাত সুরক্ষিত ছিল। জাতপ্রথা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের একটি বিরাট পরীক্ষা (experiment)।

কিন্তু গান্ধীজী লক্ষ্য করেছেন শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বর্তমানে হিন্দু সমাজে আর নেই, লুপ্ত হয়ে গেছে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অতীত ভারতেও কোনকালে সত্য সত্যই একটা ব্যাপক সামাজিক ব্যবস্থার মত প্রচলিত ছিল কি? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর গান্ধীজীর উক্তির মধ্যে না পেলেও, এইটুকু জানা যায় যে তিনি বর্তমানের ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্র ইত্যাদি বর্ণগুলিকে এক একটা ছাপ (label) মাত্র মনে করেন। যথার্থ বর্ণত্ব আর নেই, এবং বর্ণের চারটি সুষ্ঠু বিভাগও নেই, সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সুতরাং গান্ধীজী চান:

> “প্রত্যেক হিন্দু এখন স্বেচ্ছায় নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দান করবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নিহিত সত্যের প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ দিতে হলে এবং যথার্থ বর্ণধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, এই হলো একমাত্র পন্থা।”

জাত-বিভাগ বর্তমানে যে রূপ নিয়ে রয়েছে, সেটা সমাজের পক্ষে একটা অকল্যাণ মাত্র, কারণ জাত-বিভাগের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ, ঘৃণা এবং অস্পৃশ্যতা নামক অতি অধম একটা ঘৃণাবাদ প্রবেশ করেছে।

> “জাত-বিভাগের সঙ্গে ধর্মের কোন প্রশ্ন নেই। মানুষের আত্মিক এবং জাতিক উন্নতির পথে এই জাত-বিভাগ একটা ক্ষতিকারক বাধা।”
>
> “জাত-বিভাগ বর্ণাশ্রম আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। যত শীঘ্রই এই জাত-বিভাগের উচ্ছেদ হয় ততই মঙ্গল।”

বর্তমানের জাত-বিভাগের ভেতরে আশ্রিত উচ্চ-নীচ ভেদবোধ ও ঘৃণাবাদের চরম অপপ্রকাশ হলো 'অস্পৃশ্যতা'। অস্পৃশ্যতাকে 'মনুষ্যত্বের উপর আঘাত এবং অপরাধকর্ম' ব'লে গান্ধীজী মনে করেন। হিন্দু-সমাজকে এই কলুষ থেকে মুক্ত করার পন্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"আমাদের প্রত্যেককেই হরিজন হ'তে হবে।"

"আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাই না, কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় তবে যেন 'অতি শূদ্র' (অস্পৃশ্য জাত) হয়ে জন্মগ্রহণ করি।"

গান্ধীজীর উল্লিখিত উক্তিগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি হিন্দুসমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বর্ণ, এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদবোধের প্রাচীরগুলিকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে একটা ব্যাপক সমীকরণ চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি সকল বর্ণকে ব্রাহ্মণ বর্ণ আখ্যা নিতে অথবা সকল জাতকে ব্রাহ্মণ জাত আখ্যা নিতে বলেননি। তিনি সকলকে শূদ্র এবং হরিজন হয়ে যেতে বলেছিলেন। নিজেকে উঁচু করবার জন্য নীচেরা একটা আভিজাতিক অধিকারবোধ নিয়ে ওপরে উঠবে, এ পন্থায় গান্ধীজী ভেদবোধ লোপের আশা দেখেন নি। সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে উঁচুরা নিরহংকার সমত্ববোধ নিয়ে নেমে এসে দাঁড়াবে। উচ্চতাবোধটাই মনের অহিংসাকে ক্ষুণ্ন করে। মহত্ত্ব লাভের, মনুষ্যত্বকে উর্ধ্বমুখী করার অহিংসানুগ পন্থা হলো নিজেকে দীনের হ'তে দীন মনে করা। উচ্চ-নীচ ভেদ এবং ভেদবোধ না থাকলে সমাজের যে-কোন শ্রেণীবিভাগ ক্ষতিকর হতে পারে না। স্বভাবজ সহজাত ও অর্জিত সংস্কার সকল মানুষের সমান নয় বা একই নয়। সকলের প্রতিভা সমান নয়, সমান হতে পারে না। সকলের বৃত্তি এক নয়, এক হতে পারে না। মানুষের গুণকর্মের স্বাভাবিক বিভাগ সমাজে শ্রেণীবিভাগ আনবেই। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ থাকলেই শ্রেণীবিরোধ অথবা শ্রেণীতে-শ্রেণীতে উচ্চ-নীচ ভেদবোধ, কিংবা এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ থাকবে, এই যুক্তি গান্ধীজী স্বীকার করেন নি। শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক-ঐতিহাসিক সত্য। এই বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে না গিয়ে তিনি অস্বাভাবিক অনৈতিহাসিক সেই বস্তুটিকে, উচ্চ-নীচ ভেদবোধ নামক হিংসাটিকেই উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। অহিংসাই স্বাভাবিক, এবং অহিংসাই মানুষকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিতান্ত জীবদশা ও বর্বরদশা থেকে বিবেকবান মানুষে পরিণত করেছে। উচ্চ-নীচ ভেদবোধ ও ভেদবাদ নামক

ইতিহাসবিরুদ্ধ ও অবাস্তব অপসংস্কারগুলিকে দূর ক'রে সমাজের শ্রেণীবিভাগকে অহিংসোচিত শুদ্ধতায় ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাই গান্ধীজী দেখিয়েছেন।

ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী, নেশন ইত্যাদি এক একটি সামাজিক সংহতির রীতি-নীতি মন আচবণ ও কর্তব্যের যে সংজ্ঞা গান্ধীজী নিরূপণ করেছেন, তার মধ্যে দেখতে পাই যে তিনি অহিংস সন্নীতির এমন এক সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, যা অনুসরণ করলে সমাজের কোন সংহতির বা ইউনিটের সঙ্গে অন্য কোন সংহতির বা ইউনিটের বিরোধ বাধতে পারে না। প্রত্যেকের অধিকারে মাত্রা আছে, কিন্তু সেবা ও কর্তব্যে মাত্রা নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধ যেন বিশ্বৈকবোধে পরিণতি লাভ করে, তারই জন্য প্রত্যেক সামাজিক ইউনিট ও সংহতির যে অহিংস গঠনতত্ত্ব প্রয়োজন, গান্ধীজী তারই পরিচয় ব্যাখ্যাত করেছেন। অহিংসার নীতিতে গঠিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী সমাজকে খণ্ডিত করে না, বরং বৃহত্তর সমাজকে বৃহত্তর কল্যাণের অভিমুখী হবার শক্তি দান করে। এখানে 'স্বদেশী' পরদেশবিদ্বেষে পরিণত হয় না। এখানে জাতীয়তা আন্তর্জাতীয়তাবই প্রেরণা হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অহিংস সমাজতত্ত্বের শাসনে ব্যক্তির বা বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনের সংস্কার এবং কর্মের রীতিতে মাত্রা আছে, কিন্তু গণ্ডী নেই। নদীপ্রবাহেব মত দুই তটের মধ্যে সীমায়িত, কিন্তু অবাধগতি। এবং গতিও এক বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে প্রধাবমান।

ব্যক্তি এবং সমষ্টি

কোন বস্তুকে, মানুষেরই হাতে গড়া কোন বস্তুকে; কিংবা মানুষেরই বুদ্ধি দিয়ে রচিত কোন ব্যবস্থাকে (system) মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে দিতে গান্ধীজী চান না। যে-কোন সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার এবং যে-কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তন্ত্র প্রথা ও ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত অহিংস সত্তার বিকাশ রুদ্ধ করার অধিকার দেওয়া যায় না। মানুষ ভগবানের সৃষ্টি, এবং মানুষের তৈরী কোন বস্তুকে মানুষের চেয়ে বড় করার চেষ্টা বস্তুতঃ ঐশ্বরিক বিধানকেই ছোট করার মূঢ় চেষ্টা মাত্র।

মেশিন বা যন্ত্রকে মানুষ তৈরী করেছে। মেশিনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু মেশিনকে মানুষের ওপরে স্থান দিতে গান্ধীজীর আপত্তি আছে। তিনি বলেন—মানুষের দেহের চেয়ে বেশী সুন্দর ও উন্নত যন্ত্র আর কিছুই নেই। যদি যন্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে হয় তবে মানুষকেই তো সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করা উচিত। মানুষের উপকারের জন্য যন্ত্র, যন্ত্রের সুবিধার জন্য মানুষ নয়। এমন যন্ত্র যদি কেউ নির্মাণ করে, যার মধ্যে কাজ করতে গেলে মানুষের জীবনের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়, কিংবা মানুষকেও যন্ত্র হয়ে যেতে হয়, সে যন্ত্র নীতিবিরুদ্ধ (immoral)। মানুষেরই প্রয়োজন এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে মেশিন গড়ে উঠবে ও চলবে। মেশিনের সুবিধার জন্য মানুষ নিজেকে বিকৃত ও অস্বভাবী করতে পারে না।

> "বড় বড় মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের বড় বড় ট্রাস্ট গঠন এবং শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করা আমি পছন্দ করি না।"
>
> "আমি মেশিন বা যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী নই। যন্ত্রের প্রতি বর্তমান যুগে যে আগ্রহের উন্মাদনা দেখা যায়, আমি তারই বিরোধী।"

যে যন্ত্র এবং যে ধরণের যান্ত্রিক উৎপাদনের পদ্ধতি বহুসংখ্যক মানুষকে বৃত্তিচ্যুত ও জীবিকাভ্রষ্ট করে, সে যন্ত্র ও যান্ত্রিক পদ্ধতিকে গান্ধীজী সমর্থন করতে পারেননি। একটা চালের কল যদি হাজার হাজার ঢেঁকিকে

বিনষ্ট করে, একটি কাপড়ের কল যদি হাজার হাজার তাঁতীকে বৃত্তিচ্যুত করে, তবে সে কলকে সমাজের কল্যাণকর মনে করা যায় না। গান্ধীজীর কথা হলো, আগে মানুষ। বহুসংখ্যক মানুষকে জীবিকাচ্যুত না ক'রে যদি কোন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তবেই সেই যন্ত্রের সার্থকতা আছে। যন্ত্র আসবে মানুষের সংসারে মানুষকে জীবিকা-অর্জনের বেশি সুযোগ ও সুবিধা দেবার জন্য, জীবিকাচ্যুত করার জন্য নয়। চরকাও একটা যন্ত্র। শিল্প উৎপাদনে যন্ত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। গান্ধীজী চান, যন্ত্র এমনভাবে নির্মিত হবে এবং যন্ত্রচালিত উৎপাদনের রীতি এমন হবে যে তার ফলে কেউ কর্মচ্যুত হবে না, বরং অধিকসংখ্যক লোক কর্ম লাভ করবে।

> "বৃহত্তর জনসাধারণ যে বস্তু থেকে উপকার লাভ করে না, সে বস্তু আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু (taboo) মাত্র।"

যে যন্ত্র সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থাকে অল্পসংখ্যক কয়েকজনের অধিকারে কেন্দ্রীভূত করে, আপনি কি শুধু সেই যন্ত্রেরই বিরোধী? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন—হ্যাঁ।

সহরে ও গ্রামের মধ্যে তুলনায় গান্ধীজীর ভালবাসা বেশি ছিল গ্রামের ওপর। সহরের মধ্যে তিনি কেন্দ্রিকতা এবং যান্ত্রিকতার রূপ দেখেছিলেন। আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, সহর গ্রামকে শোষণ করে। সহরবাসীর সংখ্যা অল্প, গ্রামবাসীরাই সংখ্যায় বেশি। অখণ্ড ভারতে গ্রামের সংখ্যা সাত লক্ষ। সহর হলো ভোগী (consumer) মানুষের উপনিবেশ। অন্ন উৎপাদন করে গ্রাম। অথচ গ্রামের দুঃখের অন্ত নেই। অন্নের উৎপাদক গ্রামবাসীরাই বেশি সংখ্যায় নিরন্ন হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতে গ্রামের এতটা হীনদশা ছিল না, ব্রিটিশ শাসনকালেই হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার এক একটা দপ্তর এবং ইংলণ্ডের জন্য কাঁচা-মালের এক একটা আড়ত হিসাবে ভারতের সহরগুলি সমৃদ্ধি (?) লাভ করেছে। ভারতের ওপর সাম্রাজ্যিক শোষণের অন্যতম যন্ত্ররূপে সহর কাজ করেছে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর কাছে, গ্রামের মানুষই সত্য, তাহার উপরে নাই।

> "ভারতের সহরবাসীরা ভুলে যায় যে, ভারতের কোটি কোটি গ্রামবাসীর কাছ থেকে সম্পদ শোষণ করার জন্য বৈদেশিক ব্যবসায়িক যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, সেই ব্যবস্থাকেই সাহায্য ক'রে সহরবাসীরা দালালীর পয়সা লাভ করে মাত্র।"

এইজন্যই গান্ধীজীর জীবনে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের উন্নয়নসাধনাই ছিল ভারতের উন্নয়ন সাধনা। গ্রাম-ভারতই ছিল তাঁর ভারত।

ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে গান্ধীজী যে আপত্তি করেছেন, তাঁর মূল আপত্তি এই যে, ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইংরাজী ভাষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতিভাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে ইংরাজীশিক্ষিত নামে একটি নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, যারা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর জীবনের সুখদুঃখ ও আকাঙ্ক্ষার সূত্র থেকে তাদের হৃদয়ের যোগ ছিন্ন করেছে। ইংরাজী ভাষার আধিপত্য রক্ষা ক'রে এবং ভারতীয় মাতৃভাষাগুলিকে অবহেলা ও অবমাননা ক'রে, ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয় শিক্ষিতের মনে অভারতীয়তা ও বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রতি এমন একটা দাস্যভাব সৃষ্টি করেছে যে, তার ফলে জাতির সংস্কৃতিই সঙ্কটাপন্ন হয়েছে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ হয়েছে শিক্ষাহীন এবং অল্পসংখ্যক লোক হয়েছে ইংরাজীনবিশ কুশিক্ষিত। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি এবং রাষ্ট্রভাষার আদর্শ ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়েই উদ্ভাবিত হয়েছে।

নারীজাতির মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী যা বলেছেন, তা'ও মনুষ্যত্বের এক বিরাট অপচয় দূরীভূত করার প্রয়াস। নারীই হলো মানুষের মাতা। সন্তান-প্রসবের বেদনা নারী সহ্য করে, এবং তার বেদনা থেকেই সংসারে নূতন প্রাণ এবং সেই সঙ্গে আনন্দ আবির্ভূত হয়। তারপর, সন্তানপালনের দায়িত্ব। সন্তানকে বড় ক'রে তোলার জন্য নারীর দেহমনের প্রতি কণিকা থেকে যেন সহ্যশক্তি স্ফুরিত হয়। পালন করার আনন্দে নারী তার সকল দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করে। অহিংসার এই রূপ নারীর জৈব চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং নারীর অধিকার ও মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ সমাজে অহিংস মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা।

> "হিংসায় ও সংঘর্ষে বিক্ষত পৃথিবী যে শান্তির অমৃত লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে, সে শান্তি নারীর স্বভাবসুলভ আচরণে নিহিত রয়েছে। সমাজে নারী তার যথাযোগ্য নেতৃত্বের অধিকার পেলে পৃথিবীকে এই শান্তির উপহার সে দিতে পারবে।"

পুরুষের প্রতিভা হতে উদ্ভাবিত সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে একটা পৌরুষ ভাবের আধিক্য স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। নারীর স্বাভাবিক আত্মবিকাশের

পথে সমাজের এই পৌরুষকঠিন ব্যবস্থা ও সংস্কারগুলি অনেক বাধা সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। গান্ধীজী চান এই বাধার অপসারণ। নারীর যে শক্তি রয়েছে, তার খুব সামান্য অংশই মানবীয় সভ্যতার উন্নয়নে কাজে লাগাবার সুযোগ সে পেয়েছে। তাই গান্ধীজী নারী ও পুরুষের সমানাধিকার দাবী করেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। এমন কতগুলি কাজ আছে যা একমাত্র নারীর পক্ষেই পালনীয় এবং সে কাজের স্বাভাবিক যোগ্যতা নারীরই আছে। তেমনি পুরুষেরই প্রতিভায় এবং কর্মশক্তিতে চালিত হবার কতগুলি বিশেষ কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে, যেখানে নারীর পক্ষে দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন নেই, এবং সে কর্তব্যে নারী যথার্থ যোগ্যও নয়। গান্ধীজী নারীকে মাতা ও গৃহিণীর কর্মক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। জাতির শিশুকে পালনী শক্তির দ্বারা যাঁরা বড় করে তুলবেন তাঁদের অন্য কোন কঠোরশ্রমসাধ্য বাহিরের কাজে নিযুক্ত করলে নারীপ্রতিভারই অপচয় হয়, এবং জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়—মানবের সেবা ও সংস্কৃতির বিষয়ে যে এক বিরাট সাধারণ কর্মক্ষেত্র আছে, সেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়োগ করতে সক্ষম, কারণ ঃ

> "মানুষের সাধারণ চারিত্র্য গুণ এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ যা থাকা উচিত তা নারী ও পুরুষ উভয়েরই বস্তুতঃ সমপরিমাণে থাকা উচিত।"

কোটি কোটি ব্যক্তি নিয়েই পৃথিবীর শ্রেণী সমাজ গোষ্ঠী ও জাতিগুলি গঠিত। ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষের ওপরেই সমাজ ও জাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ নির্ভর করে।

> "জাতির স্বরাজ অর্থ সকল ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বরাজের সমষ্টিগত রূপ" *

সুতরাং ব্যক্তির (individual) মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশের বিরুদ্ধে কোন আইন সংস্কার রীতিনীতি ও ব্যবস্থার বাধা সৃষ্টি করার অধিকার নেই। ব্যক্তির মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, প্রতিভা, চিন্তা ও কর্মশক্তি যদি চাপা পড়ে থাকে, তবে সেটা সমগ্রভাবে বিশ্বেরই ক্ষতি। কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির সর্বময় প্রভু হওয়ার অধিকার নেই, কারণ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি নিষ্কলুষ ও সর্বগুণোপেত মানুষ নয়। জমিদার

* 'Swaraj of a people means the sum total of the Swaraj (self-rule) of individuals."

হোক্, রাজা হোক্ বা ধনিক সদাগর হোক্, কোন ব্যক্তির শ্রম ও প্রতিভার ওপর তাঁর যথেচ্ছ অধিকার কখনই স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ব্যক্তি নিজকে একমাত্র নিজের ইচ্ছার জীব ব'লে মনে করলে ভুল করবে। ব্যক্তি-মানুষ আসলে হলো সমাজের মানুষ। ব্যক্তি হলো জাতির অংশ এবং তার সামাজিক আয়তনের অংশ। সুতরাং ব্যক্তির অবাধ অধিকার হলো একমাত্র সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে।

> "আমি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য বুঝি। কিন্তু আপনারা ভুলবেন না যে, ব্যক্তির আসল পরিচয় হলো যে, সে সমাজের মানুষ। সমাজের উন্নতিকে এগিয়ে দেবার জন্য সে নিজের স্বার্থকে পিছনে রাখবার শিক্ষা পেয়েছে বলেই ব্যক্তি-মানুষ নিজেকে আজ মনুষ্যত্বের এই পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতা হলো অরণ্যের পশুদের নিয়ম। ...সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সামাজিক বিধি-নিষেধের শাসন মেনে নিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই পক্ষে কল্যাণকর হয়।"

সবার উপর মানুষ সত্য, এই নীতিকে সমাজতন্ত্রের প্রধান নীতি বলে গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজীর উক্তি থেকে ঐ নীতির তাৎপর্য আরও একটু বিশদভাবে ফুটে উঠেছে—সবার উপর সমষ্টিগত মানুষ সত্য। সমগ্র ও সমষ্টির কল্যাণই হলো মুখ্য। অংশ সমস্তের সেবক হবে, সমষ্টির সেবক হবে ব্যক্তি।

জীবন-মৃত্যুর মহাশিল্প

মানবসমাজ তার উপভোগের জন্য এমন একটি বিশেষ বস্তু উৎপাদন করে, যেটা ঠিক তার দেহধারণের প্রয়োজনে নয়, মনের প্রয়োজনে। সম্ভবতঃ মনের চেয়েও সূক্ষ্মতর ও নিগূঢ়তর কোন শরীরের প্রয়োজনের জন্য। এ বস্তু হলো রম্যকলা বা আর্ট—চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সঙ্গীত কাব্য কারুশিল্প ইত্যাদি। গান্ধীজী আর্টের মধ্যে পেতে চেয়েছেন মানুষের সত্যকে, মানুষের আত্মিক অনুভবকে, যা সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের মনকে প্রেরণা দান করে।

রাস্কিন বলেন—সব আর্টই হলো বন্দনা। ফিক্‌টে বলেছেন—কাব্য হলো ধর্মভাবের প্রকাশ। ক্রোচে বলেন—আর্ট হলো অন্তঃপ্রজ্ঞা।* কবি শেলি অনুভব করেছিলেন এক 'সৌন্দর্যময় সত্তা'কে (spirit of beauty), আভাস পেয়েছিলেন এক 'পরম সত্তার ছায়া'র (shadow of the soul)। ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুজাঁ ঈশ্বরকে সত্য-শিব-সুন্দর ব'লেই বুঝেছিলেন। আর্টের তাৎপর্য সম্বন্ধে এই সব কবি-শিল্পী-দার্শনিকদের যে অভিমত পাওয়া যায়, তার সঙ্গে গান্ধীজীর অভিমতের তুলনা করা যেতে পারে। গান্ধীজী বলেন :

> "প্রত্যেক বস্তুর দু'টি রূপ আছে, একটি ভিতরের ও একটি বাহিরের। বাহিরের রূপের কোন মূল্য নেই যদি সেটা ভিতরের রূপকে প্রকাশ করতে সাহায্য না করে। প্রত্যেক সত্যিকারের আর্ট হলো আত্মার প্রকাশ ('expression of the soul')। মানুষের অন্তরে নিহিত চৈতন্যের রূপ (inner spirit of man) যে আর্ট যতখানি বাইরে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সেই আর্টকে আমি ততখানি মূল্য দেব। এই ধরণের আর্ট আমার মনে সবচেয়ে বেশী আবেদন সৃষ্টি করে।"

গান্ধীজীর কাছে 'সত্য'ই প্রকৃত সুন্দর। তথাকথিত আর্টিষ্টের চক্ষে যে

---

* (1) Art is Intuition—*Croce*
(2) All art is Praise—*Ruskin*
(3) Poetry is an expression of religious ideas—*Fichte*

কৃষ্ণকায় জুলুর চেহারা খুবই কুৎসিত, গান্ধীজীর চোখে তাই খুব সুন্দর মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, যে বস্তু সত্যের পরিচয় বহন করে সেই বস্তুই সুন্দর। * সত্যিকারের আর্টের উদ্দেশ্য বস্তুর শুধু বাহিরের রূপকেই প্রকাশ করা নয়, বস্তুর বাইরের রূপ ও সৌষ্ঠবের পিছনে অথবা গভীরে যে সূক্ষ্ম অন্তরবস্তুটি আছে, তা'কেও রূপায়িত করা। গান্ধীজীর মতে—'*এমন আর্ট আছে যা প্রাণ দান করে, এবং এমন আর্ট আছে যা প্রাণ বিনাশ করে।*' † যা বিনাশ করে সেটা নামে আর্ট হলেও সে জিনিষ আর্টই নয়। যথার্থ আর্টের মধ্যে প্রাণময় একটা প্রসন্নতা থাকবেই, যার স্পর্শে মানুষের ভাবনা ও অনুভাবনা সঞ্জীবিত হয়। যথার্থ আর্ট মানুষের অন্তশ্চৈতন্যেরই জয়িষ্ণু রূপ প্রকাশ করে।

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আর্টের যে তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধীজীর উক্তির তাৎপর্য তুলনা করলে বোঝা যায়, দুই উক্তির মধ্যে কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে।

> 'ন বা অরে শিল্পকামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি।'

আর্টের জন্যই আর্ট নয়। শুধু আর্ট-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আর্ট রচনা করলে সে আর্ট প্রিয় হয় না। আত্মার জন্য আর্ট। আত্মার তুষ্টির জন্য যে আর্ট রচিত হবে সেই আর্ট প্রিয় হয়ে থাকে।

আর্টিষ্ট বা শিল্পী হিসাবে গান্ধীজীর দৃষ্টি যে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার ফলে তিনি আর্টকেও খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ না ক'রে আর্টকে রূপের একটা সমগ্রতার মধ্যে অখণ্ডভাবে পেতে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্র জীবনকেই একটা অখণ্ড আর্ট ব'লে মনে করেছিলেন। তিনি বলেন—'জীবনের শুদ্ধতাই হলো উচ্চতম এবং সবচেয়ে খাঁটি আর্ট।' যিনি আর্টের তাৎপর্য এইভাবে বুঝেছেন, তাঁকেই যথার্থ জীবনশিল্পী বলা যায়।

> "সুরসাধা গলা থেকে সুন্দর সঙ্গীত সৃষ্টি করার আর্ট অনেকের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব। কিন্তু শুদ্ধ জীবনের সকল সুর মিলিয়ে ঐ রকম সুন্দর সঙ্গীত সৃষ্টি করার আর্ট খুব কম মানুষের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব।"

---

* 'All truths, not merely true ideas, but truthful faces, truthful pictures or songs are highly beautiful.'

† 'art that gives life, and the art that kills.'

গান্ধীজী বলতে চান, ব্যক্তির জীবনে হার্মনি অর্থাৎ সকল চিন্তা ইচ্ছা ও কর্মের যদি একটা সুসংযত ও ছন্দোবদ্ধ মিল থাকে, তবে সে ব্যক্তির কণ্ঠ হতে যে সঙ্গীত বেজে উঠবে, তার সুরমাধুর্য কোন গায়কের সুরসাধা কণ্ঠ হতে উৎসারিত সঙ্গীতের সুরমাধুর্য অপেক্ষা কম হবে না। এমন আর্ট আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি শুদ্ধ জীবন লাভ করেছেন, যদিও জীবনে এতটা শুদ্ধতা লাভ করতে খুব কম মানুষকেই দেখা গেছে।

শুধু জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকার মধ্যে নয়, গান্ধীজী মৃত্যুর মধ্যেও আর্ট দেখতে পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে বরণ করাও একটা আনন্দের বিষয় ব'লে তিনি বোধ করতেন। সত্যের জন্য হাসিমুখে নির্ভয়ে এবং হৃদয়ে প্রীতি নিয়েই নিজের প্রাণ দান করবার আর্ট তিনিই উদ্ভাবন ক'রে বর্তমান ও ভবিষ্যতের শতাব্দীকে উপহার দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে—অনশন ব্রত গ্রহণ ক'রে ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করবো, একথা ভাবতে আমার তেমন আনন্দ হয় না। হত্যাকারীর হাত হতে নিক্ষিপ্ত বুলেট আমার হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে দিয়েছে, এইভাবে মৃত্যুবরণ করার কথা মনে হলেই আমার মন আনন্দে নৃত্য করে ওঠে।

গান্ধীজীর কাছে জীবন ও মৃত্যু হলো, একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই নিয়ে যে 'অস্তিত্ব', গান্ধীজী সেই অস্তিত্বকেই সুন্দর ও আনন্দান্বিত করার এক পরা-শিল্প বা সুপার-আর্ট বুঝেছিলেন এবং আয়ত্তও করেছিলেন।

> "মৃত্যুকে যদি বন্ধু ও মুক্তিদাতা হিসাবে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত থাকি, তবে বেঁচে থাকার জন্য উন্মত্ত চেষ্টা থেকে আমরা নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারবো। সমাজের সকলের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রেখে, এবং অপরের জীবনের ক্ষতি ক'রেও মানুষ যেভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, সেভাবে চেষ্টা করার কোন ইচ্ছাই মনে স্থান পাবে না, যদি মৃত্যুকে বন্ধু বলে বুঝতে পারি।"

সংসারে সুখের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করার জীবন বস্তুতঃ সংসারেরই সকল জনের সুখশান্তিকে বিড়ম্বিত করার হীন আর্ট (art that kills)। তাই গান্ধীজী জীবনকে 'নিজের প্রাণ বাঁচাবার' একটা মত্ত চেষ্টার নেশা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করতে চান না, কারণ সে চেষ্টার নেশা ব্যক্তিকে অপরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন, এবং অপরের দুঃখ সম্বন্ধে সংবেদনহীন ক'রে তোলে। সুতরাং, বেঁচে

থাকার জন্য নিরন্তর আকুলতা নয়, বন্ধু মৃত্যুর হাত ধরবার জন্যই প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে থাকা হলো জীবনকে সুন্দর করার আর্ট। নিজের বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলি পরের কল্যাণে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে, নিজের হৃদয় শুধু উৎকর্ণ হয়ে থাকবে প্রিয় মৃত্যুর 'আওন কি আওয়াজ' শুনবার আশায়। পর-সেবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে এই বেঁচে-থাকা জীবনটুকু অকাতরচিত্তে সমাপ্ত ক'রে দেবার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। মৃত্যুর এই সাহচর্যই তো জীবনের পূর্ণতা।

নিখিলহৃদয়ের স্পর্শে যে আর্ট মমতাপ্রবণ, নিখিলপ্রাণের স্পন্দনে যে আর্ট ছন্দিত, জীবন-মৃত্যু ছাপিয়ে নিত্যকালের সুর অনাহত ছন্দে যে আর্ট ধ্বনিত হয়ে চলেছে, তারই উপাসক ও অনুশীলক ছিলেন গান্ধী। কাব্য, চিত্র, মূর্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রচলিত যে রূপ-কলার মধ্যে সেই নিত্যের আভাস ফুটে ওঠে, তাই হলো যথার্থ আর্ট। সাধকের মনের মত শিল্পীর মন এবং তাঁর শিল্পের রূপও হবে অনন্তের ছন্দে ছন্দায়িত ('in tune with the infinite')।

সাধক কবি মৃত্যুকে প্রিয়তমের ঘরে যাবার ব্যাপার ব'লে কল্পনা ক'রে গান রচনা করেছিলেন:

"চতুর অলবেলি করলে সিঙ্গার
সজনকো ঘর যানা হোগা।"

সুন্দর ক'রে সেজে লও বন্ধু, এইবার প্রিয়তমের ঘরে যেতে হবে। এই গানই জীবনশিল্পী গান্ধীর জীবনে সত্য হয়েছে। গান্ধীজী তাঁর জীবনকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। হত্যাকারীর হাত হতে নিক্ষিপ্ত বুলেট এক তিরিশে জানুয়ারীর অপরাহ্ণে তাঁর বক্ষ দীর্ণ ক'রে তাঁকে চলে যাবার সুযোগ এনে দিল।

মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব ব্রহ্মার কাছে বলেছিলেন, আমার রচিত গ্রন্থে বহু বিপুল ও বিভিন্ন ঘটনা, বহু বিভিন্ন নরনারীর কাহিনী এবং বহু নীতি ও বহু তত্ত্বের বর্ণনা থাকবে। কিন্তু বর্ণিত সকল বিভিন্ন বস্তু ব্যাপার ও ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র বস্তু প্রতিপাদিত করবো, যে বস্তু সর্ব বস্তুর মধ্যে রয়েছে—'যত্তু সর্বগতং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্।'

গান্ধীজীর জীবনকাহিনীর মধ্যে বিরাট ও বহু ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। ভারতীয় কৃষক ও কৃষির সাহায্যের জন্য যিনি কম্পোষ্ট সারের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করেছেন, তিনিই আবার সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের

পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষা ও উপলব্ধির কথা মানুষজাতিকে জানিয়েছেন। কি বিপুল কর্মবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক ঘটনাবহুল জীবন! কিন্তু তাঁর জীবনের এই বহু ও বিচিত্র কর্মাবলীর মধ্যে একটি মাত্র বস্তুই প্রতিপাদিত হয়েছে। সে বস্তু হলো অহিংসা।